প্রকাশক : শ্রীমতী বিদিশা মুখোপাধ্যায়
নবার্ক
ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, পোঃ দেশবন্ধুনগর
কলকাতা ৭০০ ০৫৯

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৫৯

মুদ্রক : শ্রী অসীম সাহা
দি প্যারট প্রেস
৭৬/২ বিধান সরণী, ব্লক কে-১
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ : শ্রী অপরূপ উকিল

সূচিপত্র

উৎসর্গ

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী
সুচরিতাসু

হিন্দু-মুসলমান

আমাদের অনেকে নিখুঁত ইংরেজি বলেন, পোশাকও পরেন ইংরেজের মতো। আমাদের কেউ কেউ ইংরেজের মতো ফরসা। এমনকি, আমাদের মধ্যে ইংলণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন বা আশৈশব শিক্ষা পেয়েছেন, এরূপ ব্যক্তিও বিরল নন। তবু কোনো ইংরেজ তাঁকে ইংরেজ বলে গণ্য করবে না। তিনি যদি ইংলণ্ডে বাস করেন নির্দিষ্ট কাল, তবে আইনের চোখে তিনি ইংরেজ হতে পারেন। তবু তিনি ইংরেজের দলে ইংরেজ নন। তিনি যদি ইংরেজ-কন্যা বিবাহ করেন, চার্চ অফ ইংলণ্ডের সভ্য হন, তবু তিনি যে-কে-সেই। আমাদের কথা ছেড়ে দিন, স্বয়ং বার্নার্ড শ প্রায় ষাট বছর ইংলণ্ডে কাটিয়েও লোকচক্ষে এখনো আইরিশ। এবং লেডী অ্যাস্টর ইংলণ্ডের অভিজাত সমাজে বিবাহ করে তাদের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হয়ে তাদের পার্লামেন্টের সদস্য হয়েও লোকচক্ষে এখনো মার্কিন।

তবে ইংরেজের গুণ এই যে, ওরা দু-এক পুরুষ বাদে মনে রাখে না, কে কার বংশধর। ইংলণ্ডের মাটিতে পুরুষানুক্রমে জন্মালে ও মরলে, ওদের সঙ্গে বিয়ে না করেও ইংরেজ হওয়া যায়— ইহুদীরা হয়েছে। কিন্তু এর জন্যে ইহুদীদেরকে অন্যরকম ত্যাগস্বীকার করতে হয়েছে। তাদের নাকি একসেট ঘরোয়া নাম আছে। অথচ বাড়ির বাইরে তারা জন স্মিথ, এডওয়ার্ড ব্রাউন, জর্জ জোন্‌স। তারা বাড়িতে যা খুশি বলুক, বাইরে বলে নির্ভুল ইংরেজি। তারাও মুসলমানদের মতো জবাই-না-করা মাংস খায় না, খায় না শূয়রের মাংস। কিন্তু সে তাদের বাড়িতে। ইংরেজের দলে তারা আহারাদিতে বিল্‌কুল ইংরেজ। বিয়েটা নিজেদের মধ্যে না করলে তাদের ইহুদীত্বের ভিত্‌ নড়ে। রক্তের মিশ্রণ তারা হতে দেয় না। তাই তারা অন্যকে ইহুদীধর্মে দীক্ষা দিয়ে ইহুদী করে নেয় না। রক্তে আলাদা থাকার দরুণ তাদের চেহারা দেখে চেনা যায়, তারা হাজার ইংরেজ সাজলেও তারা ইহুদী।

ইহুদীদের মতো পারসীরাও রক্তের মিশ্রণ এড়াবার জন্যে পরকে তাদের ধর্মে দীক্ষা দেয় না, পারসী করে নেয় না। নিজেরা কিন্তু পোশাকে ভাষায় আচারে ব্যবহারে পরের নকল করতে করতে অন্যরকম হয়ে গেছে। মাণিকজী দাদাভাই— এর কোন কথাটি ফার্সী? আজকাল ইংরেজের অনুকরণে পার্থিব সুবিধা। যে-কারণে দত্ত হয়েছেন ডাট, মিত্র হয়েছেন মিটার, সেই একই কারণে পারসীরা আর-এক পা এগিয়ে গিয়ে কুপার, মরিস, কণ্ট্রাকটর, ক্যাপটেন ইত্যাদি ইংরেজি নামকরণ করেছেন। দুঃখের বিষয়, এর সবগুলি ইংরেজি শব্দ হলেও ইংরেজি নাম নয়।

ওদিকে নিগ্রোরাও নিজেদের ইংরেজি নামকরণে ওস্তাদী দেখাচ্ছে আরো বেশী।

আমার কাছে লণ্ডন 'টাইম্‌সে'র সেই সংখ্যাটি নেই, যাতে এর অনেকগুলি নমুনা ছিল। আমরা তো নিচ্ছি শুধু বিশেষ্য পদ। ওরা নিচ্ছে ক্রিয়া-বিশেষণ। একটা-কিছু হলেই হলো। যেমন, 'জেমস ভেরি গুড প্লিজ অলরাইট ম্যান।'

এবার ইংরেজের কথায় ফিরে আসা যাক।

বহু ফরাসী ওলন্দাজ জার্মান রাশিয়ান রক্তের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ইংরেজ হয়ে গেছে। রক্তের মিশ্রণকে ইংরেজ সমাজ ক্ষতিকারক মনে করেনি। ইংরেজ ধর্মবিশ্বাসের ঐক্য দাবী করে না। অনেক ইংরেজ চার্চের এলাকার বাইরে। কেউ মুসলমান হলে তাঁর জাত যায় না। ইংরেজ ও অনৃইংরেজে প্রভেদ ধর্মগত নয়, রক্তগত। ইংলণ্ডবাসী ইহুদীদের ধরলে, রক্তগতও নয়, ঐতিহ্যগত। ইংলণ্ডের স্বকীয় ট্র্যাডিশনকে আপনার করলে, আপনাকে সেই ট্র্যাডিশনের বাহক করলে, ইংরেজের মতো ভাবলে, ইংলণ্ডের স্বার্থকে প্রথম স্থান দিলে ইহুদী বা পারসী থেকেও ইংরেজ হওয়া যায়।

এর সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করা যাক।

এ-দেশেরও একটা ঐতিহ্য আছে। অতিদীর্ঘ এর ইতিহাস। ঐ ইতিহাসের আদি থেকে কে কে এ-দেশে আছে, কে কে পরে এসেছে, তা হিন্দুসমাজের রূপ দেখে বোঝবার উপায় নেই। এমন মিশাল ঘটেছে যে, যারা পরে এসেছে, তারাও নিজেদের আদি-ভারতীয়দের বংশধর বলে বিশ্বাস করে। রাজপুতরা ভাবে, তারা মহাভারতীয় যুগের ক্ষত্রিয়। মহাভারতীয় যুগের ক্ষত্রিয় রক্ত যে একেবারে তাদের দেহে নেই, তা কে জোর করে বলবে! তবু ক্ষত্রিয় না হয়ে রাজপুত হলো তাদের নাম। আমরা হিন্দুরা ভারতবর্ষের সমগ্র ঐতিহ্যকে দাবী করে থাকি। আমাদের এ-দাবী অন্যায় নয়। কারণ আমরা যাদের বংশধর, তাদের কেউ-না-কেউ আদিতে এদেশে ছিল। তাদের রক্তধারার, তাদের ভাবধারার বাহক আমরা। তারা নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

যারা আদিকাল থেকে জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে, তেমন জাতি পৃথিবীতে বেশী নেই। আমাদের হিন্দুদের প্রধান গর্ব এই-যে আমরা তেমনি একটি জাতি। আমাদের কৌলীন্য অবশ্য ঝুটা। রক্তের বিশুদ্ধি কাল্পনিক। একদিন আমাদের ভ্রান্তি ছিল যে আমরা অমুক অমুক ঋষির গোত্র। আজও বিয়ের সময় সেটা মনে পড়ে যায়। চোখের সামনে কোচেরা রাজবংশী ও রাজবংশীরা ক্ষত্রিয় হয়ে উঠল। এখন তারাও চন্দ্র সূর্যের নিচে কথা কইবে না।

তা হোক, একই দেশে একাধিক ঐতিহ্য সম্ভব নয়। একদিন-না-একদিন সবাইকে মূল স্রোতে ভাসতে হবে। মূল স্রোতটা রাজবংশীদের ধারণায় রক্তকৌলীন্য। যেমন আমাদের শিক্ষিতদের ধারণায় ছিল এবং দরকারের সময় ফিরে আসে। কিন্তু তা যে নয়, এ বিষয়ে শিক্ষিতদের দ্বিমত নেই। তবে কারুর কারুর নতুন ধারণা, হিন্দুর হিন্দুত্ব তার ধর্মবিশ্বাসে। এই বলে এঁরা হিন্দুধর্মের একটা সংজ্ঞা তৈরি করছেন। সেই সংজ্ঞা যদি কোনো জাপানী বা আমেরিকান গ্রহণ করে, তবে সে-ও নাকি হবে হিন্দু! তার মানে হিন্দুত্ব ভারতবর্ষের বাইরে টিকতে পারে। এঁরা ভুলে

যান যে বিদেশীয় 'হিন্দুরা' বা 'আর্যসমাজীরা' তাদের জাতীয় প্রকৃতি বদলাতে পারে না। এবং জাতীয় প্রকৃতি যদি বেঁচে থাকে, তবে একদিন ধর্মের ভেক বদলানো কাপড় ছাড়ার মতোই সোজা। জাভার দৃষ্টান্ত কী শিক্ষা দেয় ?

দেশের মূল স্রোত ঐতিহ্য। প্রত্যেক দেশের স্বকীয় ঐতিহ্য আছে। কোনো-কোনো দেশ তা রাখতে পেরেছে। কোনো-কোনো দেশ তা রাখতে পারেনি। কোনো দেশে একটানা স্রোত, কোনো দেশের স্রোত মাঝখানে শুকিয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমান স্রোতের মাঝখানে বিস্মৃতির বালুচর। অতীত বন্ধ্যা, বর্তমান তার দত্তক পুত্র। এসব দেশের একখানার স্থলে দু'খানা ইতিহাস লিখতে হয়। ফারাওদের মিশর, আরবদের মিশর। মায়া ও আজটেক আমেরিকা, ইউরোপীয় আমেরিকা।

ভারতের ঐতিহ্যের সংজ্ঞা দিতে যাওয়া বৃথা। কোনো জীবন্ত জাতি নিজের সংজ্ঞা দেয় না। মরণের সংজ্ঞা আছে, জীবনের নেই। আমরা বহমান, আমরা বিদ্যমান। আমরা দিন দিন কাপড় ছাড়ছি। নখ কাটছি। চুল ছাঁটছি। আমরা পরিবর্তিত হচ্ছি, বিবর্তিত হচ্ছি। আমাদের ধর্মবিশ্বাসও তলে তলে বদলে যাচ্ছে। আমাদের ধর্মগ্রন্থ চূড়ান্ত নয়, তারও পরিবর্তন ও বিবর্তন আছে। পৌর্বাপর্য রক্ষা করে হিন্দুসমাজ বার বার সংস্কৃত হয়েছে। প্রত্যেক জীবন্ত সমাজের রীতি এই। ইংরেজও চিরকাল বাঁধা ধর্ম মানেনি, বাঁধা আচার মানেনি। ইংরেজ রক্তও কত রক্তের সাংকর্য। ইংরেজী ভাষাও কত ভাষার সাংকর্য। আধুনিক ইংরেজের মধ্যে আদিম ব্রিটনও রয়েছে।

ভারতবর্ষে যেমন মুসলমান আছেন তেমনি খ্রীস্টানও আছেন। সংখ্যা কার বেশী কার কম সেটা আকস্মিক, সত্যই আসল। সংখ্যার বাড়তি-কমতি আছে, একটা বন্যায় বা ভূমিকম্পে মেজরিটি মাইনরিটি হতে পারে। সংখ্যার উপর সত্যের স্থান। খ্রীস্টানের সংখ্যা কম বলে তাঁর অস্তিত্ব কম নয়।

খ্রীস্টান আছেন মালাবার অঞ্চলে প্রায় প্রথম শতাব্দী থেকে। তার মানে ইসলাম যদি এদেশে আটশ' বছর আগে প্রচারিত হয়ে থাকে খ্রীস্টবিশ্বাস প্রচারিত হয়েছে আঠারশ' বছর আগে। খ্রীস্টানদের সঙ্গে এদেশের সম্পর্ক দ্বিগুণকালব্যাপী। তবে পর্তুগীজ আগমনের পূর্বে খ্রীস্টবিশ্বাসে দীক্ষা-দানের ব্যবস্থা ছিল না, মিশনারীতে দেশ ছেয়ে যায়নি।

খ্রীস্টানরা যেমন প্রথম শতাব্দীতে মালাবারে আসেন সীরিয়া থেকে, তেমনি আরবরাও এসেছিলেন ও আসছিলেন ভারতের সমুদ্রতটবর্তী যাবতীয় প্রদেশে। আর্যযুগের পূর্বে যখন দ্রাবিড়যুগ ছিল তখন সামুদ্রিক বাণিজ্যও ছিল। সমুদ্রযাত্রায় আরবরা চিরকাল অভ্যস্ত। আরবদের হাত দিয়েই ভারতের পণ্য ইউরোপে যেত।

তারপর কেবল যে আরবদের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাই নয়, পারসিকরাও কখনো যুদ্ধ করতে, কখনো সৌর উপাসনা প্রচার করতে এদেশে এসেছিলেন খ্রীস্টজন্মের বহু পূর্বে। গ্রীক, গ্রীকবংশী, শক ও হূনদের কথা সবাই

জানেন। আমি শুধু জোর দিতে চাই আরব পারসিকদের উপর। এঁরা ভারতবর্ষে বসবাসও করেছিলেন, করে অবিকল ভারতবর্ষীয় হয়ে গেছেন। আমরা হিন্দুরা এঁদেরও বংশধর।

আরবরা নিরীহ বণিক জাতি ছিলেন, ইসলাম তাঁদের দিগ্বিজয়ী করে। ইসলাম নিয়ে তাঁরা ভারতে এলেন, কিন্তু সিন্ধু প্রদেশের এদিকে অগ্রসর হতে পারলেন না। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ আফগানদের উপর পড়ল। আফগান ও তুর্কিস্থানীরাই ভারতে রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং পরাজিত হয়ে মুঘলকে পথ ছেড়ে দেন। পারসিকদের একেবারেই হাত ছিল না।

অথচ ভারতের আফগান, তুর্কিস্থানী, মুঘলরা পারস্যের ভাষাকে রাজভাষা ও আরবের ভাষাকে ধর্মভাষা করলেন। সেই দুই সূত্রে আরব-পারস্যের সংস্কৃতি মুসলিম সংস্কৃতিরূপে ভারতে উপনীত হলো। আরব ও পারসিক কেউ কেউ ভাগ্যপরীক্ষা করতে এসে রাজসরকারে কাজ পেলেন, জায়গির পেয়ে এদেশে বাস করলেন। এঁদের স্বকীয়তা এঁদের মুসলমানত্বের দ্বারা আচ্ছাদিত হলো। অন্যান্য দেশে যেমন সারাসেন সভ্যতার সৃষ্টি হয় তেমনি এদেশে হলো এক বিমিশ্র সভ্যতা, তাতে রাজপুতদেরও অংশ ছিল। তা ভারতের প্রচলিত ভাষাকে গ্রহণ করে তার ক্রিয়াপদ অক্ষুন্ন রেখে তাতে বিদেশী বিশেষ্য বিশেষণ মিশিয়ে তার নাম দিল উর্দু ওরফে হিন্দুস্থানী। শিল্পে ঘটেছে সারাসেনের সহিত রাজপুতের মিশাল, অনেক স্থলে রাজপুতের উপর সারাসেনের প্রলেপ। মন্দিরের কারুকার্য নিয়ে মসজিদের অঙ্গে গ্রথিত করলে পাঠান রাজাদের কার্যসংক্ষেপ হতো। মুঘলরা কার্যসংক্ষেপ করেননি, কিন্তু, তাঁদের কার্যে ডাক দিয়েছেন রাজপুতদের, শিল্পীদের মধ্যে ভেদবিচার করেননি।

ছয়-সাতশ' বছরের মুসলমান রাজত্বে বিদেশী রক্ত যা এসেছে তাকে তার আগের দুই-তিন হাজার বছর ধরে আসা বিদেশী রক্তের চেয়ে বেশী বলবার কারণ নেই। সংস্কৃতি যা এসেছে তার সম্বন্ধেও সেই কথা। কত আরব পারসিক গ্রীক গ্রীকবংশী শক কুশান হুন তিব্বতী চীনা মগ আর্য দ্রাবিড় আদিম রইল একদিকে। অন্যদিকে দাঁড়াল আফগান তুর্কিস্থানী আরব পারসিক ও তাদের দ্বারা ইসলামে দীক্ষিত পূর্বোক্তবংশীয়। দুই পক্ষের নাম হয়েছে হিন্দু মুসলমান।

হিন্দু-মুসলমান একই দেশের মাটির উপব বাড়ি করেছে, এটা আকস্মিক। এই আকস্মিকের উপর মিলনের প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। মিলন হয় যদি দেশের সনাতন ধারার সঙ্গে এরা আপন আপন সত্তা মিলিয়ে দেয়। প্রত্যেক দেশের একটি সনাতন ধারা আছে। ভারতবর্ষে যখন আর্য আসেনি তখনো এ ধারা ছিল। আমেরিকায় যখন শ্বেতাঙ্গ যায়নি তখনো এ ধারা ছিল। জয়গর্বে আত্মাভিমানে প্রায় প্রত্যেক দেশেই আগন্তুকরা আদিমদের অগ্রাহ্য করেন, সনাতন ধারাকে করেন অস্বীকার। মহাকাল নেন এর প্রতিশোধ। একদিন-না-একদিন আগন্তুকের ঘাড় ধরে একই ঘাটে জল খাওয়ান। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গরা নেটিভদের দ্বারা অতি অলক্ষে প্রভাবিত হচ্ছে। নেটিভরা কেবল মানুষ নয়, ওরা দেশ। দেশের জল বাতাস বন আকাশ

ওদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। ওরা বিজিত হতে পারে, কিন্তু ওদের দেশ একদিন জয়ী হয় আগন্তুকের উপর। কাইজারলিং তাঁর 'ইউরোপ' নামক গ্রন্থে এর আলোচনা করেছেন। দেশের অতীতকে মেনে নিতেই হবে, নিস্তার নেই। ধর্মবিশ্বাস তার সঙ্গে লড়াই করে পারে না, সামঞ্জস্য করতে বাধ্য হয়। আর্য বলে আমরা বড়াই করতে পারি, কিন্তু বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের বিশুদ্ধি আর আছে কি ? সে সমাজ-ব্যবস্থাই বা কোথায় ? দ্রাবিড় জয়লাভ করেছে, আদিম তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আগন্তুক আর্যদের নাম নয়, আদিমদের জননীর নাম আজ আমরা ধারণ করেছি। আমরা হিন্দের সন্তান। আমরা হিন্দু। যে-সব আর্য ভারতের বাইরে থেকে গেছেন— যেমন জার্মান বা ইংরেজ— তাঁদের প্রতি আমাদের মমতা নেই। আমাদের ভারতীয়ত্ব আমাদের প্রকৃত রূপ। আমাদের আর্যামি একটা পৈতামহিক পরিচ্ছদ।

মুসলমানকে ভারতের প্রয়োজন আছে। আমরা লক্ষ করেছি যে মানুষ হিন্দু থাকতে 'দাস্য সুখে হাস্যমুখ বিনীত যোড়কর' ছিল সেই মানুষ মুসলমান হয়ে 'উন্নত মম শির' বলে গান গেয়ে উঠেছে। সে তার আত্মার গান। যথার্থই তার কাছে 'নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির'। হিন্দুসমাজে যে কয়জন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন তাঁরাই কেবল ও কথা বলতে পারেন। জনসাধারণকে ও মন্ত্র উচ্চারণ করতে দিতে সমাজ অন্তরে অন্তরে আপত্তি করে এসেছে। তাই আজ ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত সকলেরই প্রণাম করতে করতে মেরুদণ্ড বেঁকে গেছে।

ধার্মিকের চিরকৌমার্যের প্রতি হিন্দুসমাজের একটা অস্বাস্থ্যকর পক্ষপাত আছে এবং বিধবার পক্ষে এই হলো বিধি। এগুলি হয়তো আমাদের তিব্বতী ও দ্রাবিড় পূর্বপুরুষের কাছে পাওয়া সংস্কার। এমনি একটি সংস্কার আমাদের গোভক্তি। যারা ছাগরক্তে কালীঘাট ধৌত করেছে, বলিদানে মহিষাসুর বধ করতে যারা দ্বিধা বোধ করে না, গোমাতাকে প্রহার করা যাদের নিত্য কাজ তারাই মুসলমানের প্রতি ঘৃণায় কণ্টকিত, ওরা যে গোরু খায় ! এসব সংস্কার যে কত বিসদৃশ ইসলাম গ্রহণ করলে এক মুহূর্তে বোঝা যায়।

আর্যদের আগমনের পূর্বে আদিম ছাড়া অন্য যে-কয়টি জাতি ছিল তারা যে কে কখন ও কোনখান থেকে এসেছিল তা স্থির করা কঠিন। এই পর্যন্ত স্থির যে তারা স্বতন্ত্রভাবে নানাদিক দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এবং আদিমদেরকে রেড ইণ্ডিয়ানদের মতো খেদিয়ে দিয়ে নিজেরা মালিক হয়ে বসেছিল। তারা গোড়া থেকে সভ্য ছিল কি ক্রমে ক্রমে সভ্য হলো, তাও বলা কঠিন। কিন্তু তারা যে আর্য আগন্তুকদের চেয়ে সভ্য ছিল এতে ভুল নেই। আমরাই ভুল করে থাকি আর্যদেরকে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলদের চেয়ে সভ্য মনে করে। এটা আমাদের আগন্তুক মানসিকতা।

মুসলমানরা এদেশে আসার আগে হিন্দু কম সভ্য ছিল না, তবু আমাদের মুসলমানদের ধারণা তাঁদের খানা ও পোশাক বেশী জাঁকালো বলে তাঁরাই সভ্যতর। তেমনি আমাদের আর্যামির মোহ। আসলে কিন্তু আর্যেরা ছিলেন মোটের উপর

আদিমদের মতো একবৃত্তিসম্পন্ন। গোড়ায় মৃগয়ার অতিরিক্ত বিশেষ কিছু তাঁদের করণীয় ছিল না। তবে তাঁদের মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ হয়েছিল, তাঁরা আসবার সময় বেদের কতক অংশ রচনা করে সঙ্গে এনেছিলেন। কেমন করে তাঁরা এদেশে এলেন এ সম্বন্ধে আমার অনুমান এই যে, তাঁরা এলেন ঠিক তেমনি করে যেমন করে পরে এলেন পাঠান ও পাঠানের পরে মুঘল। অর্থাৎ ভারতের গৃহশত্রুর আমন্ত্রণে। কোনো-এক জয়চাঁদ কি লোদি-বংশাবতংস তাঁদের ডাকলেন মিত্ররূপে। তাঁরা মিত্র হয়ে এলেন, রাজা হয়ে থাকলেন। আর্যদের আগমন একবারে ঘটেনি। একই পথেও তাঁদের সকলে আসেননি। আর, এক জাতিও তাঁরা ছিলেন না। তাঁদের নানা শাখা, নানা উপজাতি ছিল। আর্যদের আগমন বহুশতাব্দীব্যাপী।

তাঁরা এসে দেখলেন যে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের বিবেচনায় বর্বর। আপনাকে বড়ো ও অপরকে ছোট মনে করে মানবমাত্রেই, বিশেষ করে বিজেতা মানব। এই অহংকারটুকু অক্ষুন্ন রেখে তাঁরা যা দেখলেন তাই আত্মসাৎ করতে লাগলেন। আর্যপূর্ব ভারতীয়দের সমাজদেহ বহুবৃত্তিসম্পন্ন জটিল ছিল। তাদের কেউ করে চাষ, কেউ করে ভোগোপকরণ নির্মাণ, কেউ করে আমদানি-রপ্তানি, কেউ কেবল যুদ্ধই করে। ইংরেজরা যেমন মুঘলদের শাসনযন্ত্র হাতে নিয়ে তারই চাকাটা স্প্রিংটা কজাটা ইস্ক্রুপটা যখন যেটা দরকার তখন সেটা পাল্‌টিয়ে ও যোগ করে তাকে আজ পৌনে দু'শ' বছর পরে ভিন্ন আকার দিয়েছেন, তেমনি আর্যরাও দ্রাবিড় ইত্যাদির চলন্ত ঘড়িতে দম দিতে দিতে মেরামত করতে করতে উন্নত করতে করতে তাকে আজ হিন্দুসমাজ নামক বিচিত্র জটিল দুর্বোধ্য একটি ঘড়িতে পরিণত করেছেন।

জাতিবিভাগ ভারতের বৈশিষ্ট্য। এর তাৎপর্য এই যে সমাজের এক অঙ্গের কাজ অপর অঙ্গ করবে না, সেই অঙ্গই করতে থাকবে। এই উপায়ে প্রতিযোগিতা ও তার আনুষঙ্গিক অনিশ্চয়তা নিবারিত হবে। ইউরোপের সমাজে সকলের সব ব্যবসায়ে অধিকার আছে। ভারতে ডোমের অধিকার নেই ময়লা সাফ করবার। হাড়ির অধিকার নেই মড়া ছোঁবার। একের কাজ করতে অপর অসম্মত। তাতে উভয়ের অন্ন থাকে। এক পক্ষের অন্ন যায় না।

একান্নবর্তী পরিবার ভারতের বৈশিষ্ট্য না হলেও ভারতে বদ্ধমূল। বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেক সভ্য প্রয়োজনমতো খাদ্যপরিধেয় পায়, সাধ্যমতো উপার্জন করে পারিবারিক ভাণ্ডারে দেয়। বেকার, বৃদ্ধ, বিধবা, বিকলাঙ্গ এদের ভরণপোষণের জন্যে সমাজকে চাঁদা দিতে বা রাষ্ট্রকে সদাব্রত খুলতে হয় না। পরিবারের উপরই এর ভার।

আমার মনে হয় আর্যদের পূর্বেই জাতিবিভাগ ও একান্নবর্তী প্রথার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অবশ্য এমন বিপুল আয়তনে নয়। সামাজিক অনুষ্ঠান ও প্রথা দিনে দিনে, বছরে বছরে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, সহস্রাব্দের পর সহস্রাব্দ ধরে বিরাট বটবৃক্ষের ব্যাপকতা পায়। কোনো-একদিন একদল বুদ্ধিমান মিলে রাতারাতি

সমাজ গঠন করেন না। সমাজ গঠিত হয় বহুদিনের প্রয়োজনে, পরীক্ষায়, ভুল-ভ্রান্তির অভিজ্ঞতায়।

বাংলায় দেখা যাচ্ছে চাষ প্রধানত মুসলমানের হাতে। চাষী মুসলমান একটা জাত না হলেও জাতের যাবতীয় লক্ষণ তাদের ভিতর আছে। তারা ক্বচিৎ অন্যপ্রকার মুসলমানের সঙ্গে বিবাহাদি করে কিংবা খায়। একান্নবর্তী পরিবারও তাদের তেমনি হিন্দুদের যেমন। সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার থাকার বহুবিবাহের প্রলোভন অনেকে এড়াতে পারে না। একাধিক সম্পত্তির লোভে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। তাতে জনসংখ্যা এত বেশী বাড়ে যে সম্পত্তির ভাগ হলে দেখা যায় সম্পত্তির চেয়ে শরিক বেশী। বিধবার ভাগে সম্পত্তি পড়ায় বিধবাকে বিবাহ করতে অনেকের আগ্রহ। মুসলমান সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ চাষী মুসলমানদের বেলায়।

আশ্চর্য এই যে চাষকে বাংলার ইসলাম সম্মানকর মনে করে, অথচ তাঁতকে করে ঘৃণা। কসাইয়ের কাজ গর্হিত নয়, কিন্তু ধীবরের কাজ অবজ্ঞাত। তাঁতী ও জেলে মুসলমানদের মধ্যে অনেক। কিন্তু লোকনিন্দার ভয়ে এরা সেন্‌সাসে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় দিতে নারাজ। এদের সঙ্গে চাষী মুসলমান কুটুম্বিতা করে না, এরা এক হিসাবে অন্ত্যজ। ঢাক বাজায়, গান করে, সাপ খেলায় এমন মুসলমান আছে বিস্তর। কিন্তু ইসলামে এসব কাজ নিষিদ্ধ। সুতরাং এদের সঙ্গে বিবাহাদি করাও সৎ মুসলমানের পক্ষে নিন্দনীয়।

বিজেতাকে বয়কট করার নীতি আজকের নয়। হিন্দু সমাজ আটশ' বছর আগে সংকল্প করে, মুসলমানের সঙ্গে সংস্রব রাখবে না। এই বয়কটের ভাব এখনো লোপ পায়নি। মুসলমানের জল খাব না, তাকে স্পর্শ করলে স্নান করব ইত্যাদি পুরুষানুক্রমে গড়িয়ে আসছে। এই নীতির ভুক্তভোগী মুসলমান আমাকে দুঃখের সহিত জানিয়েছেন যে এতকাল একত্র থেকেও তাঁরা হিন্দুর কাছে পল্লী অঞ্চলে উদার ব্যবহার পাননি, এমনকি যে-ক্ষেত্রে হিন্দুরা তাঁদের প্রতিবেশী ও বন্ধুসদৃশ। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে তাঁরা হয় বিজেতারূপে এসেছেন, নয় বিজেতার দলে যোগ দিয়ে পর হয়ে গেছেন। হৃদয় জয় করবার দায়িত্ব তাঁদেরই। যারা হারে তারা কখনো ভোলে না, ক্ষমাও করে না তারা মহত্ত্বের পরিচয় না পেলে। মুসলমান-সমাজের মধ্যে অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করে হিন্দুদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। মুসলমান পীর হিন্দুরও গুরু। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে মুসলমান— মুসলমানসমাজ— হিন্দুসমাজের প্রতি কী ব্যবহার করেছেন? হৃদয়জয়ের কোনো চেষ্টা হয়েছে কি? আকবরের সময় যা হয়েছিল সেটা তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টা, তাঁর জনকয়েক বন্ধুর চেষ্টা। কিন্তু প্রায় দু'শ' বছর হলো বিজিত হয়েও মুসলমানসমাজ আজও সেই বিজেতা ও বিদেশী মানসিকতা নিয়ে হিন্দুদের পাশাপাশি বাস করছে। আর্যকে দ্রাবিড় ক্ষমা করেছে, কিন্তু মুসলমানকে হিন্দু ক্ষমা করেনি। এর কারণ সমষ্টিগত ভাবে মুসলমান হিন্দুকে প্রসন্ন করেনি। এখনো মুসলমানের সামাজিক মন থেকে যাচ্ছে

না যে, সে নিজে গরীব হলে কী হয় তার তুর্কী মামা, তার আরবী চাচা, তার আফগান দাদা বড়লোক। বিজিত হিন্দুদের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক! এরা তো ছোটলোক। আর এই যে ভারতবর্ষ, এও তার মাতৃভূমি নয়—এ তার হারানো জমিদারি। এর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ মেলানো অবান্তর। তার ইসলাম তো তাকে এ কাজে উৎসাহ দিচ্ছে না।

কেমন করে সম্ভব হলো তার ইতিহাস নেই, কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের মুসলমানদের অধিকাংশ কৃষিজীবী ও তাদের বসতি বাংলায় পাঞ্জাবে। কেন যে মাঝখানে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার বাদ গেল, কেমন করে যে লাফ দিয়ে মুসলমান মেজরিটি পাঞ্জাব থেকে বাংলায় এলো, এর গবেষণা চাই। আবার এই দুটি মেজরিটি কেন যে কৃষিজীবী হলো তাও গবেষণার বিষয়। পাঞ্জাব ও বাংলা ছাড়া অন্য যেসব প্রদেশে মুসলমান বিদ্যমান সেসব প্রদেশে তারা চাষ করে না, গ্রামে থাকে না। অবশ্য এ উক্তির ব্যতিক্রম আছে। সচরাচর সেসব প্রদেশের মুসলমান ভূম্যধিকারী, বাণিজ্যজীবী ও রাজকর্মে নিযুক্ত।

বস্তুত একটা দেশে দুটো সামাজিক কাঠামো থাকতে পারে না। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সঙ্গে বেচাকেনা করে, হিন্দু মেথর না হলে মুসলমানের চলে না, নাপিতও হিন্দু, ধোপাও। আবার মুসলমানদের এযাবৎ এমন কতকগুলো কাজ একচেটে ছিল যা হিন্দুরা করতে জানত না কিংবা করতে চাইত না। যেমন দর্জি দপ্তরী গাড়োয়ান চামড়ার ব্যাপারী ইত্যাদির কাজ। লস্করের কাজ এখনো মুসলমানদের একচেটে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই জাতীয় একটা সামঞ্জস্য শ্বেত মনুষ্যদের অনভিপ্রেত। সেদেশে তিনটে সমাজ আছে, কিন্তু ব্যবসায়িক আদানপ্রদানের ক্ষেত্র দিন দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। আমাদের দেশে তিনটের বেশী সমাজ আছে—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, পারসী, ইহুদী, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন। কিন্তু আহারবিহার ব্যতীত অন্য কিছু নিষিদ্ধ নয়। যদি ব্যবসায়িক অসহযোগ থাকত তবে হিন্দু মেথর এদের সকলের মল পরিষ্কার করতে চাইত না। তার ফলে মুসলিম মেথর, খ্রীস্টান মেথর, পারসী মেথর ইত্যাদির উদ্ভব হতো।

(১৯৩৪)

ডিক্‌টেটরশিপ

ডিক্‌টেটরশিপ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে তা ব্যক্তিবিশেষের সর্বময় কর্তৃত্ব নয়। ডিক্‌টেটর নন সীজর। মুসোলিনিকে নেপোলিয়ন-বর্গীয় বলে মনে করলে ভুল করব। ডেমক্রেসির সঙ্গে ডিক্‌টেটরশিপের পার্থক্য হচ্ছে দ্বৈতের সঙ্গে অদ্বৈতের।' ডেমক্রেসির দুই পক্ষ। এক পক্ষের নাম পার্টি ইন পাওয়ার। অপর পক্ষের নাম পার্টি ইন অপোজিশন। ডিক্‌টেটরশিপ অপোজিশন সইতে পারে না, তাই অপর পক্ষ ছেদ করে নিরঙ্কুশ হয়। ডিক্‌টেটরশিপ হচ্ছে ডানা-কাটা ডেমক্রেসি। তার যিনি কর্ণধার তিনি পার্টির তেজে তেজীয়ান, পার্টির থেকে বিচ্ছিন্ন নয় তাঁর সত্তা। তিনি রাষ্ট্রের ডিক্‌টেটর হলেও পার্টির ডিক্‌টেটর নন। ব্যক্তিত্ব যদি তাঁর থাকে তবে তা নিতান্ত আকস্মিক, না থাকলেও অচল হতো না। যেমন কন্‌স্টিটিউশনাল রাজার।

আদত কথা দুই হাতে যে তালি বাজে তার নাম ডেমক্রেসি আর এক হাতে যে কাঁসি বাজে তার নাম ডিক্‌টেটরশিপ। হাত এস্থলে পার্টি। উভয়েরই প্রাণ পার্টিগত। পার্টিকে নির্মূল করে দাও, দেখবে ডেমক্রেসিও নেই, ডিক্‌টেটরশিপও নেই। পক্ষান্তরে পার্টিকে ডালপালা মেলতে দাও, একদিন পাবে, হয় ডেমক্রেসি নয় ডিক্‌টেটরশিপ। একই বীজ থেকে কী করে দুই জাতের চারা হতে পারে তা আমাদের সকলের জেনে রাখা ভালো। নইলে বুনব ডেমক্রেসি আর ফলবে ডিক্‌টেটরশিপ।

২

ইংলণ্ডে যখন রাজার হাত থেকে প্রজার হাতে ক্ষমতা আসে তখন প্রজাদের দুই দল দাঁড়িয়ে যায়। তাদের এক পক্ষ নেয় রাজার অংশ, করে শাসন। অপর পক্ষ নেয় প্রজার অংশ, করে সমালোচনা। চক্রের আবর্তনে সমালোচকরাও শাসক হয়, শাসকরাও হয় সমালোচক। তারা পালা করে ক্রিকেট খেলে, কখনো এর হাতে ব্যাট ওর হাতে বল, কখনো ওর হাতে ব্যাট এর হাতে বল। হুইগ ও টোরি এই দুই দল ওস্তাদ খেলোয়াড় ইংলণ্ড সরগরম করে তুলল, অন্যান্য দেশেও সাড়া পড়ে গেল। সবাই বলল আমাদেরও অমন দুটি টিম চাই। উঠল ডেমক্রেসির জয়ধ্বনি।

ইংরাজের মতো সবাই তো ক্রিকেট বোঝে না। অন্যান্য দেশে টিম তৈরি হলো বটে, কিন্তু দুটি নয়, তার বেশী। জোড়াতালি দেওয়া দলের খেলা ঠিক ইংরাজি খেলা নয়। তা হলেও তা খেলা। তা পার্লামেন্টারী গবর্নমেন্ট।

গত শতাব্দীর মধ্যভাগে সমগ্র জগৎ যখন ডেমক্রেসির নাম জপছে তখন এক বেসুরো গলায় উচ্চারিত হলো, ডিক্‌টেটরশিপ। রসভঙ্গকারীর নাম কার্ল মার্ক্‌স্‌। কার ডিক্‌টেটরশিপ? কোনো ব্যক্তিবিশেষের? না। প্রোলিটারিয়াটের। শ্রমিক-গোষ্ঠীর।

মার্ক্‌সের মতে রাজার ক্ষমতা প্রজার হাতে এসেছে বটে, কিন্তু প্রজা এক্ষেত্রে কেবল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। পার্লামেণ্ট হয়েছে তাদের পাঁঠা। সেটাকে তারা যেমন ইচ্ছা কাটছে। তাতে শ্রমিক শ্রেণীর প্রবেশ নেই, প্রবেশ থাকলেও স্বার্থসিদ্ধির ভরসা নেই। শ্রমিক কী চায়? কোন্ পক্ষ কত দৌড় করল? কয়টা ছোট খাটো উপকার করল? না। শ্রমিক চায় সে তার শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্য পাক। যারা তাকে তার ষোলো আনা পাওনার জায়গায় পাঁচ আনা দিয়ে বলে খুব পেয়েছে, যারা তার বকেয়া এগারো আনা পকেটে পুরে বড়োলোক, তাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টে দাঁড়িয়ে তর্ক করা বৃথা। তাদের সঙ্গে বাদানুবাদ না করে তাদের সোজা বিদায় কর। কেড়ে নাও তাদের হাত থেকে ক্ষমতা। নির্বাচনে জয়লাভ করে নয়। সরাসরি গায়ের জোরে। রাষ্ট্র-পরিচালনা ছেলেখেলা নয়, ক্রিকেট নয়। যারা শ্রম করবে না তারা বাঁচবে না। তাদের বাঁচা বারণ। আর যারা শ্রম করবে তাদের কী নিয়ে দলাদলি হতে পারে? তাদের নিয়ে যে সমাজ তাতে একাধিক দলের স্থান নেই।

মার্ক্‌সের সময় থেকে ডিক্‌টেটরশিপের আইডিয়া ডেমক্রেসির আইডিয়ার সপত্নী হলো, কিন্তু তার প্রতি বিশেষ কেউ ভ্রূক্ষেপ করেননি। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের শ্রমিকরা পার্লামেণ্টে প্রবেশ করতে টোরি হুইগের মতো পার্টি খাড়া করল, নির্বাচনের আসরে নামল। ধীরে ধীরে তারা দলে ভারী হয়ে একদিন অপোজিশনের আসন নিল। তারপরে ব্যাট ধরল। হুইগ বনাম টোরির খেলায় হুইগ দলে ফাটল দেখা দেয়, য়্যাস্কুইথ ও লয়েড জর্জ পৃথক হয়ে যান। ফলে উভয় উপদল নগণ্য হয়। লেবার লিবারলের বদলে খেলার আসর জমায়।

ইংলণ্ডের লেবার পার্টির অনুরূপ জার্মানীর সোশ্যাল ডেমক্র্যাট পার্টি। অন্যান্য দেশে বিশুদ্ধ সোশ্যালিস্ট পার্টি। এদের সকলেরই পলিসি পার্লামেণ্টে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে টোরি বা হুইগের মতো রাষ্ট্র শাসন করা। অর্থাৎ বিপক্ষকে খেলায় আউট করে তার ব্যাট ধরা। এরা বিপক্ষকে খেলার মাঠ থেকে খেদিয়ে দিতে চায় না, এরা চায় ওরা বল ছুঁড়ুক। সমালোচনায় এদের আপত্তি নেই, এরা অপোজিশনের রসগ্রাহী।

মাঝখানে একটা মহাযুদ্ধ না ঘটে গেলে ডেমক্রেসির উপর জনগণের আস্থা অচলা হয়ে রইত। কোনো দেশেই ডিক্‌টেটরশিপের প্রশ্ন কাফিখানা বা লেখকের দপ্তর ছাপিয়ে উঠত না। কিন্তু মহাযুদ্ধের দিন ইংলণ্ডের মতো খেলোয়াড়ধর্মী দেশেও ডেমক্রেসির খেলার ভোল বদলায়। য়্যাস্কুইথকে গুরুদক্ষিণা দিয়ে লয়েড জর্জ কোয়ালিশন গবর্নমেণ্ট গড়লেন। সমালোচনা করবার জন্যে কেউ রইল না। সকলের এক তনু এক মন এক ধ্যান। অপোজিশনের অভাব যদি হয় ডিক্‌টেটর-

শিপের সংজ্ঞা তবে ইংলণ্ডে এই সময় ডিক্‌টেটরশিপই স্থাপিত হয়েছিল। ডিক্‌টেটরশিপের লক্ষণ এই যে তার অধীনে ব্যক্তির অধিকার সঙ্কুচিত হয়, ব্যক্তিকে স্বাধীন বলে গ্রাহ্য করা হয় না। মহাযুদ্ধের আমলে ইংলণ্ডের মানুষ যা-খুশি করতে পারত না যা-খুশি বলতে পারত না। খবরের উপর সেন্সরশিপ, খাবারের উপর ভাগ-বাঁটোয়ারা, আলোর উপর নির্বাণের আদেশ, সব জিনিসের উপর খাজনা। গবর্নমেণ্ট নিজেই গোলা-বারুদের কারখানা চালান, অন্য অনেক ব্যবসার উপর গবর্নমেণ্টের হস্তক্ষেপ চলে। যার ইচ্ছা নেই তাকেও পাকড়িয়ে সেপাই করে যুদ্ধে পাঠানো হয়, তার বিবেকের বাধা থাকলে কয়েদ করা হয়।

ইংলণ্ডের মতো বনেদী ডেমক্রেসিও যুদ্ধের দিনে ফেল মারল। শুধু যুদ্ধের দিনে নয়। ডিপ্রেশন যখন ঘনিয়ে এল তখন ম্যাক্‌ডোনালডের নেতৃত্বে সমস্ত কনসার-বেটিব, সমস্ত লিবারল ও বহুসংখ্যক সোশ্যালিস্ট মিলে ন্যাশনাল গবর্নমেণ্ট পত্তন করলেন। নামমাত্র একটি বিপক্ষ দল রইল, তাদের মৃদু স্বরের সমালোচনা দুর্বলের প্রতি অনুগ্রহ করে শুনলেন কর্তারা, কিন্তু কর্মের ইতরবিশেষ লক্ষিত হলো না। সুখের বিষয় ইংলণ্ডকে এই ডিপ্রেশন জখম করতে পারেনি, যেমন করেছে আমেরিকাকে। যদি করত তবে ব্যবসার উপর দস্তুরমতো হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক হতো।

৩

মহাযুদ্ধে যখন ক্রিকেটের জন্মভূমির এই দশা তখন অন্যে পরে কা কথা। মার্ক্‌সের মানসকন্যা রুশকে মাল্যদান করলেন। নির্জলা ডিক্‌টেটরশিপ Tsar-এর মসনদ দখল করল।

বোলশেবিক রুশ একালের প্রথম নিরাবরণ ডিক্‌টেটরশিপ। ইংলণ্ডে যা অল্পের উপর দিয়ে গেল, রুশে তা ষোলো কলায় পূর্ণ হলো। অন্নের ভাণ্ড রাষ্ট্রের হাতে। বস্ত্রের ভাণ্ডার রাষ্ট্রের জিম্মায়। গহনার বাক্‌স রাষ্ট্রের সিন্দুকে। একটি পয়সাও কারুর পকেটে নেই। বাঁচান বাঁচি মারেন মরি, বল ভাই ধন্য রাষ্ট্র। নিজেকে ব্যক্তি বলে ভাবাটাও রাষ্ট্রদ্রোহ, সমষ্টির অকল্যাণ।

সবচেয়ে বড় কথা, কোনো সমালোচক রইল না। দেশে কেবল একটি বাণী, একটি সুর, একটি সত্য। তার প্রতিবাদ নেই। তার সংশোধন নেই। বিপক্ষের সংবাদপত্র বাহির হয় না, বই ছাপা হয় না, বক্তৃতা উচ্চারিত হয় না। বিপক্ষীয়রা হলো নির্বাসিত, কারারুদ্ধ, নিহত। সব জমিই খাস মহল, সব ব্যবসাই খাস ব্যবসা, সব কারখানা খাস কারখানা। এর সামান্য ব্যতিক্রম স্থলে স্থলে অনুমোদিত হলেও আইনে স্বীকৃত হলো না। ভোগোপকরণের উৎপাদনে ও বিতরণে রাষ্ট্রের কেউ প্রতিযোগী নয়, কোনো প্রতিযোগী নেই। ঘরে-বাইরে নিরঙ্কুশ হয়ে রাষ্ট্র স্থির করল প্ল্যান করে সেই বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের অশন-বসনের অভাব পূরণ করবে। সমস্ত ব্যক্তির সংহত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নির্দেশে ধন সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্র জোগাবে

মূলধন, ব্যক্তি জোগাবে শ্রম, রাষ্ট্র জোগাবে দিশা, ব্যক্তি জোগাবে মনীষা। ব্যক্তির পারিশ্রমিক বিভিন্ন হবে, কিন্তু সেই পারিশ্রমিককে মূলধনে পরিণত করা নিষিদ্ধ। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে খাটাতে পারবে না। অপরের জন্যে খাটতে পারবে না। পক্ষান্তরে রাষ্ট্র প্রত্যেককে কাজ দেবে, খোরাক দেবে।

এখন এই ব্যবস্থা একদা ডেমক্রেসির সাহায্যেও সাধিত হতে পারত। সেই সুদিনের অপেক্ষায় বসে থাকতে মার্ক্‌সপন্থীরা রাজি নয়, তাই তারা দিনটাকে সরাসরি উপায়ে এগিয়ে নিল। তাদের কৈফিয়ৎ এই যে মধ্যবিত্তরা ভোটে হেরে রাষ্ট্রের পায়ে সম্পত্তিসমর্পণ করবার পাত্রই নয়, ভোটে হারজিত্‌ তাদের ঘরোয়া তামাশা তার সুযোগ নিয়ে অন্য শ্রেণীর লোক যে তাদের ঘর সংসার বেদখল করবে এর সম্ভাবনা দেখলে তারা তামাশার টিকিট বেচবে না, জুয়াখেলায় বাজি রাখতে দেবে না। তার মানে ডেমক্রেসির আটঘাট বেঁধে তাকে নিজেদের পক্ষে নিরাপদ করে তুলবে। আধুনিক পরিভাষায় তাদের ডেমক্রেসি সেফগার্ডে সমাচ্ছন্ন পর্দানশীন সাজবে।

৪

মার্ক্‌স্‌পন্থীদের আশঙ্কা অমূলক নয়। তার প্রমাণ ধীরে ধীরে পাওয়া যাচ্ছে। অথচ তাদের আশঙ্কার প্রতিষেধকরূপে তারা যা উদ্‌ভাবন করেছে তা এমন সদ্য-ফলপ্রদ যে দেশে দেশে তার জাল হতে লেগেছে। রুশবিপ্লবের অনতিকাল পরে ইটালীতে ফাসিস্ট ডিকটেটরশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফাসিস্টরা পার্লামেণ্ট উঠিয়ে দেবার দরকার দেখল না, রাজারও মাথা কাটল না। চার্চের সঙ্গে একটু ঝগড়া বাধলো বটে, কিন্তু চার্চ তাদের স্বার্থে বাদ সাধল না, সুতরাং চার্চের স্বার্থকেও তারা মেনে নিল।

ফাসিস্ট পার্টির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য ইটালীকে প্রথম শ্রেণীর শক্তির পর্যায়ে উন্নীত করা। ইংলণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়া যখন পৃথিবী ভাগ করে নিচ্ছে ইটালী ও জার্মানী তখন বহুধাবিভক্ত। উপরন্তু ইটালী তখন পরাধীন। অন্যেরা অনেক দূর যাবার পর এই দুই জাতি জাগে। জেগে দেখে তাদের ভাগে বেশী কিছু অবশিষ্ট নেই, আফ্রিকার মাংস নিঃশেষ, খানকয়েক হাড় পড়ে রয়েছে। এশিয়াও পরের গ্রাসে। অবশ্য ঘরে যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হলে চলত। কিন্তু তা হলে প্রথম শ্রেণীতে নাম ওঠে না। প্রথম শ্রেণীই স্বর্গ, প্রথম শ্রেণীই ধর্ম, প্রথম শ্রেণীই পরম তপ। নবজাগ্রত ইটালীর নবপ্রতিষ্ঠিত ডেমক্রেসি আফ্রিকার দিকে হাঁ করল। কিন্তু হাঁ ভরল না। আদোয়াতে আবিসিনিয়ার দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে ইটালী আর ও-মুখো হলো না। বলকান যুদ্ধের মরসুমে তুর্কীর কাছ থেকে ত্রিপোলী কেড়ে নিয়ে সে কোনোমতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেল বলা চলে। মহাযুদ্ধে তার মহদ্‌ভোজ্য সমুপস্থিত হয়, তার বিভীষিকার হেতু অস্ট্রিয় সাম্রাজ্য চূর্ণ হয়ে যায়। আড্রিয়াটিক সাগরের বন্দর তো সে আহার করলই, অধিকন্তু দক্ষিণ টিরোল দক্ষিণা পেল।

বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া রাশিয়া ও তুর্কীর যে প্রতিপত্তি ছিল একা ইটালী তার সবটা করায়ত্ত করল। অস্ট্রিয়ার জাহাজগুলি বগলদাবা করে ভূমধ্যসাগরে ইটালীর ভার বাড়ল। ওদিকে জার্মানীর বাণিজ্যের একাংশ তার ভাগ্যে জুটেছে। এককথায় ইটালীর সামনে সীমাহীন আশা, প্রাণে সদ্যলব্ধ সাহস। অন্ধ যেন দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, খঞ্জ ফিরে পেয়েছ চলৎ-শক্তি।

বাছুরের নতুন শিং উঠেছে, সে যত্রতত্র ঢ়ুঁ মারবার জন্যে অধৈর্য। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হবার জন্যে ইটালী ফাসিস্ট দলের তর সইল না। রাশিয়ার বোলশেবিকদের দৃষ্টান্ত ছিল চোখের সুমুখে। রোমান ক্যাথলিক চার্চের আদর্শও নিত্য পরিচিত। এবং এমন আশঙ্কাও ছিল যে কমিউনিস্ট দল বাহুবলে রাষ্ট্র অধিকার করবে। ডিক্‌টেটরশিপ যদি ইটালীর কপালে লেখা থাকে তবে কমিউনিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন? ফাসিস্ট ডিক্‌টেটরশিপ কেন নয়? ফাসিস্টরা কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করল। অবিকল কমিউনিস্ট পদ্ধতি দিয়ে কমিউনিস্টকে পরাস্ত করল। যেন জিউজুৎসু দিয়ে জাপানীকে। মাঝখান থেকে মারা পড়ল বেচারা উলুখাগড়া লিবার্‌লরা। সোশ্যালিস্টরা বেকুব বনল। ডেমক্রেসির সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও ঘটল প্রাণান্ত। ফাসিস্টরা বিরুদ্ধবাদীমাত্রকেই টিপে টিপে মারল, সরাল, তাড়াল, বাঁধল। অপোজিশনের নামগন্ধ রাখল না।

আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে, ফাসিস্টদের উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য স্বদেশের শক্তি বৃদ্ধি। এর জন্যে রাষ্ট্রকে দিয়ে যা-কিছু করানো সম্ভব তাই করণীয়। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে বাঘকে হরিণকে এক ঘাটে জল খাওয়াতে পারে। রাষ্ট্রের চাপে ধনিক ও শ্রমিক আপোস করল। রাষ্ট্র সাহায্য করল উভয়কেই। কারুর সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে খাস করতে হলো না, সকলের সম্পত্তির উপর ক্ষমতা জাহির করাই যথেষ্ট বোধ হলো। একটা উদাহরণ দিই। ইটালীতে বেড়াবার সময় লক্ষ করেছি হোটেলের প্রত্যেক ঘরে ফাসিস্ট পার্টি একখানি কাগজ এঁটে দিয়েছে, তাতে লেখা আছে ঘর ভাড়া এত, বিদ্যুতের ভাড়া এত, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এত ইত্যাদি। মনোযোগের বিষয় এই যে রাষ্ট্র নয় ফাসিস্ট পার্টির স্থানীয় কর্তৃপক্ষই এইসব হোটেলের মা বাপ। পার্টি রাষ্ট্র দখল করেছে বলে নিজের দুর্গ ছাড়েনি। ওটুকু রানীর স্ত্রীধন।

যুদ্ধকালীন ইংলণ্ডের সঙ্গে ফাসিস্ট ইটালীর তুলনা সর্বাধিক সংগত। ফাসিস্টরাও বলে তাদের ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা, যুদ্ধ জগতের সনাতন ধর্ম, তা শান্তির দিনেও অন্য আকারে রয়েছে। প্রাণে মারার চেয়ে ভাতে মারা কম মারাত্মক নয়। বিদেশী মালের উপর শুল্ক চড়িয়ে শান্তির দিনেও এক দেশ অন্য দেশের অন্ন মারছে। আবার দেশী মালের ব্যবসাদারকে অর্থসাহায্য করে সেইসব মাল সস্তায় বিদেশী হাটে চালান দিয়েও বিদেশীর অন্ন কাড়ছে। এই অন্নযুদ্ধ কি কম হিংস্র? এ কি কোনো অংশে যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু?

ইংলণ্ডে যা ছিল আপদ্ধর্ম ইটালীতে তাই সনাতন ধর্ম, যেহেতু আপদ হচ্ছে সনাতন। যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, শান্তির সময় অন্নযুদ্ধ, সব সময় একপ্রকার না একপ্রকার

যুদ্ধ। সুতরাং ফাসিজম্ ইটালীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। সেদেশের অন্য বাণী হতে পারে না, অন্য সুর হতে পারে না, অন্য সত্য হতে পারে না। ইংলণ্ডের লোক যা দু' বছরের বেশী বরদাস্ত করতে পারে না ইটালীর লোক তা তেরো বছর পছন্দ করে এসেছে।

ইটালীতে পার্লামেণ্ট আছে, কিন্তু তাতে মেজরিটি মাইনরিটি নামক দুই দল নেই। তাতে আছে বিভিন্ন ও বিচিত্র স্বার্থের নির্দিষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি। তারা সমালোচনা করে না, তাদের কেউ মন্ত্রীপদ পাবার অধিকারী নয়। মন্ত্রীপদ ফাসিস্ট পার্টির লোককে পার্টির দান। রাশিয়াতে পার্টির কর্তারা রাষ্ট্রের কর্তাদের নিযুক্ত করেন, লোকপ্রতিনিধিদের ইচ্ছা খাটে না।

৫

ইটালীর অনুকরণে যেসব দেশে ডিক্‌টেটরশিপ প্রতিষ্ঠা হয় তাদের মধ্যে জার্মানীই উল্লেখযোগ্য। পোলাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে পিলসুড্‌স্কি প্রিমো প্রভৃতি ব্যক্তি সৈন্যদলকে হাত করে রাষ্ট্রের গাড়োয়ান হয়েছিলেন, তেমন তো অহরহ দক্ষিণ আমেরিকায় ঘটছে। তুর্কী ও ইরানের নায়কদের সম্বন্ধে আর-একটু বেশী বলা যায়, তাঁরা নেপোলিয়ন-বর্গীয়।

বোলশেভিক ও ফাসিস্ট পার্টির মতো জার্মানীর ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টি। ওরফে নাৎসী পার্টি। এই পার্টির পত্তন যুদ্ধের অল্প পরে। অথচ ক্ষমতা আয়ত্ত করতে এদের দীর্ঘকাল লাগল। ফাসিস্টদের যেমন ভয়ের কারণ ছিল যে ওরা না হলে কমিউনিস্টরা ডিক্‌টেটর হবে নাৎসীদের তেমন অজুহাতও ছিল না। এদের পথ পরিষ্কার করে দিল সোশ্যাল ডেমক্র্যাট ও কমিউনিস্টদের গজকচ্ছপ কলহ। এরা গরুড়ের মতো দুটোকেই ভক্ষণ করে অপসত্ত্ব হলো। বোলশেভিক ও ফাসিস্টকেও এরা বিপক্ষদলনে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু এরা সহজে নিষ্কণ্টক হতে পারছে না। প্রথমত কমিউনিস্ট পার্টিকে নিঃসত্ত্ব করলেও কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন ব্যক্তি নিশ্চিহ্ন হয় না জার্মানীর মতো কমিউনিস্ট তীর্থে। নিকটে রাশিয়া। তার ছোঁয়াচ্‌কে অতিমাত্রা ভয়। দ্বিতীয়ত ইহুদীর সংখ্যা কেবল যে ছয় লাখ তাই নয়, তারা সর্বঘটে বিদ্যমান ও সর্বত্র তারা জাতজার্মানের চেয়ে অবস্থাপন্ন ও উন্নতিপরায়ণ। তাদের সঙ্গে মিশ্রণ সম্ভব নয় বলে তারা চিরকালই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র হিসাবে দ্রোহিতা করবে। বিশেষত তাদের মিত্র ইউরোপের সব দেশে। জার্মানীর শত্রুরাজ্যের যদি তারা চর হয়, যদি গোপনে তাদের আত্মীয়দের কাছে স্বর্ণ রপ্তানী কিংবা তাদের কাছ থেকে নিষিদ্ধ পণ্য আমদানি করে, যদি যুদ্ধের দিনে পরের পক্ষে চক্রান্ত করে, তবে দেশ বিপন্ন হবে। ইহুদীদের অনেকে কমিউনিস্ট, একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। নাৎসীরা ইহুদীকে আমেরিকার নিগ্রোর মতো দীনহীন দশায় উত্তীর্ণ না করে ছাড়বে না। ওদের দেশে দেশে আপনার লোক রয়েছে, আন্দোলন করে জার্মান পণ্যের বাজার খারাপ করে দিচ্ছে। তৃতীয়ত জার্মানীর ক্যাথলিকরা পার্লামেণ্টেও প্রতিনিধি

পাঠায়. তাদের একটা স্বতন্ত্র পার্টি আছে। ধর্মের নামে পলিটিক্যাল পার্টি কেবল ভারতে নয় জার্মানীতেও রয়েছে, তা নইলে ওদেশের এমন দুর্দশা হবে কেন? এখন ইহুদীর মতো ক্যাথলিকও অন্যান্য দেশে আছে, তাদের সঙ্গে জার্মানীর ক্যাথলিকদের ভাব থাকা ভালো নয়। জার্মানীর মহাশত্রু ফ্রান্স আবার ক্যাথলিক কিনা! তদ্ব্যতীত রোমের পোপ জার্মানীর ক্যাথলিকদের ব্যাপারে কথা কন। এক্ষেত্রেও সেই রাষ্ট্রের ভিতরে রাষ্ট্র। এজন্যে নাৎসীরা ক্যাথলিকদের প্রতি বিরূপ। এরাই কতকটা অপোজিশনের কাজ করছে। এমনি কপাল যে প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গেও নাৎসীদের বনছে না। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট উভয়কে এক সূত্রে গেঁথে একটা 'দীন এলাহী' প্রবর্তন করতে এ যুগের আকবর বাদশাহের সখ। গ্যয়রিং আবার প্রাক্‌খ্রিশ্চান পেগান যুগকে ফিরিয়ে আনতে চান।

নাৎসীদের মর্মগত উদ্দেশ্য কী? ইতিহাসের মঞ্চে তারা কোন ভূমিকায় অভিনয় করতে অবতীর্ণ? এর উত্তর তারা জার্মানীকে পুনরায় মহাশক্তির আসনে বসাতে কৃতসঙ্কল্প। যুদ্ধে জার্মানী পরাভূত হয়েছে, এই তথ্যটাকে তারা ইতিহাসের পাতা থেকে রবার দিয়ে মুছে ফেলতে পণ করেছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য গবর্নমেণ্টের মতো তারা বেকারসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছে। ভাবী যুদ্ধের আয়োজনে জার্মানী যা খরচ করেছে তাতে বেকার সংখ্যা হ্রাস হয়েছে। দেশরক্ষার্থে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রের কর্তব্য বলে সর্বস্বীকৃত। তাদৃশ কারণে সংবাদের, অভিমতের ও আর্টের নিয়ন্ত্রণও মাথা পেতে নিতে হয়। নাৎসী জার্মানীতে ব্যক্তির স্বাধীনতা ফাসিস্ট ইটালী ও বোলশেবিক রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রের স্বার্থে বিলীন হয়েছে, জীবাত্মা যেমন পরমাত্মায়।

ব্যক্তির তো এই জীবন্মুক্ত দশা। নাৎসী পার্টি কিন্তু স্বতন্ত্র সত্তা রক্ষা করছে, রাষ্ট্রভার গ্রহণ করে আত্মদেহ ত্যাগ করেনি।

রাশিয়া, ইটালী ও জার্মানী এই তিন দেশেই রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিজের জারক রসে জীর্ণ করেছে, কিন্তু পার্টিকে উদরস্থ করতে পারেনি, বরং পার্টিই রাষ্ট্রের পিঠে সওয়ার হয়েছে। এইখানেই ডিক্‌টেটরশিপের ভণ্ডামি। তিন দেশেই ডিক্‌টেটরশিপ রাষ্ট্রের মহিমা গান করছে, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় নেই, না ভগবান না ধর্ম। নমো রাষ্ট্র নমো রাষ্ট্র বলে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করতে হবে, রাষ্ট্র নামক অব্যয় অক্ষয় পরব্রহ্মের চরণে আপনার ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব নিবেদন করে চরণামৃত সেবন করতে হবে। তা হলে যে অপূর্ব আনন্দে চিত্ত পরিপূর্ণ হবে তাই হচ্ছে ইহজীবনের সার্থকতা। এই যাদের মতবাদ, যাদের ফিলসফি, তারা কিন্তু পার্টিকে শিকায় তুলে রেখে দিয়েছে ঠাকুরের ঠিক মাথার উপরে। অন্যান্য দেশে এই ফলার চুরি নেই। এর থেকে অনুমান হয় যে পার্টি বাইরে থেকে রাষ্ট্রের লাগাম কেড়ে নিয়েছে, ভিতর থেকে তার মন কাড়তে পারেনি। নাৎসী, ফাসিস্ট ও বোলশেবিক নিজ নিজ দেশের সমস্ত মানুষকে পার্টির সদস্য করতে সাহসী নয়, কারণ সেক্ষেত্রে ভোটের মর্যাদা আছে, ব্যক্তির মতামতের মূল্য আছে, যদি অধিকাংশের আনুকূল্য না পাওয়া যায় তবে পার্টির পলিসি পণ্ড হবে ও নেতৃত্ব পাত্রান্তরিত হবে।

৬

শেষপর্যন্ত দাঁড়াল এই-যে মঙ্গলের জন্যে গৌরবের জন্যে পরাভবগ্লানি ধৌতকরণের জন্যে মুষ্টিমেয়ের নেতৃত্বে মহাজনতাকে চালিত হতে হবে। সঙ্কল্প অল্পের, সমর্পণ অধিকাংশের। রাষ্ট্র হচ্ছে জগন্নাথের রথ, জনসাধারণ তাকে টানবে, পার্টি হবে তার পাণ্ডা। এ যদি দুর্দিনের ব্যবস্থা হতো তবে ডেমক্রেসির পক্ষে ভয়াবহ হতো না, কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় উক্ত তিনটি দেশে এই ব্যবস্থা সুদিনেও অটুট থাকবে, যাতে অটুট থাকে তার জন্যে পার্টি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। অপিচ ঐ তিন দেশে এর সাফল্য একে অন্যত্র সংক্রামক করতেও পারে। অতএব ডিক্‌টেটরশিপ ডেমক্রেসির স্থায়ী প্রতিযোগী হতে উদ্যত হয়েছে। হয় ডিক্‌টেটরশিপ জিতবে, নয় ডেমক্রেসি। দুটোর প্রভেদ যাঁরা বোঝেন না তাঁদের যত্ব-ণত্ব জ্ঞান নেই। ডেমক্রেসি হচ্ছে সংখ্যাভূয়িষ্ঠের শাসন, ডিক্‌টেটরশিপ সংখ্যালঘিষ্ঠের।

সম্প্রতি ইংলণ্ডেও ডিক্‌টেটরশিপের আইডিয়া বহু মনীষীর মনঃপূত হয়েছে। আমি অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ মস্‌লের কথা ভাবছিনে। ভাবছি ক্রিপ্‌স্‌, কোল লাস্কির কথা। এঁরা ডেমক্রেসির ঠাট বজায় রেখে ডিক্‌টেটরশিপের প্রাণবস্তু চান। এঁদের প্রস্তাব এই-যে লেবার পার্টি সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হয়ে পার্লামেণ্টে আসুক, এসে ভোটের জোরে বিনা সময়ক্ষেপে রাতারাতি ব্যাংক, খনি, রেল, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবসায় রাষ্ট্রের খাসদখলে আনুক।

এই প্রস্তাব শুনে প্রতিপক্ষ হেসে বললেন, ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ক্রিকেট নয়। সমালোচনার সময় দিতে হবে। পদে পদে জবাবদিহি করতে হবে। দেশের লোককে ফলাফল অনুধাবন করবার অবসর দিতে হবে। রাতারাতি একটা সুপ্রতিষ্ঠিত দেশের একতরফা ওলটপালট ঘটানোর জন্যে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা পার্লামেণ্ট ধ্বংস করার সামিল। তোমরা যদি ভোটের জোরে অন্যায় করতে উদ্যত হও আমরাও গায়ের জোরে অন্যায়কে ঠেকাতে জানি।

এঁরা প্রত্যুত্তর করলেন, দেশের লোক যদি আমাদের সংখ্যাভূয়িষ্ঠরূপে পাঠায় তবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি ভালো করে বুঝেসুঝেই আমাদের পাঠিয়েছে। আমরা ম্যাণ্ডেট পালন করছি মাত্র।

এই যুক্তির দ্বারা আদালতে মামলা জেতা যায়, কলেজ ছেলে ভোলানো যায়। কিন্তু এ ক্রিকেট নয়। কোনোমতে একবার সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হলেই যে-ডালে বসেছি সে-ডাল কাটবার অধিকার জন্মায় না। গোড়া ঘেঁসে কোপ মারার প্রস্তাব সর্ব-সাধারণের বুদ্ধিগ্রাহ্য হওয়া দরকার। সংখ্যাভূয়িষ্ঠ তো চিরদিন সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নয়। পাঁচ বছর পরে তারাই হতে পারে সংখ্যালঘিষ্ঠ। সমাজব্যবস্থা কি প্রতি পাঁচ বছরে বিপরীত হবে? কাটা ডাল গজাবে কি?

মোট কথা ডেমক্রেসি বিপ্লবের বাহন নয়। কামারের দোকানে দইয়ের ফরমাস বৃথা। মার্ক্‌স্‌ এ সত্য জানতেন বলে তাঁর শিষ্যদের সোজাসুজি বিপ্লবের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। লেবার পার্টি কনফারেন্সে মনীষীদের এই প্রস্তাব সহজবুদ্ধির দ্বারা

প্রত্যাখ্যাত হলো। এতে আছে ডিক্‌টেটরশিপের সারবস্তু। লেবার ডিক্‌টেটরশিপের থেকে শত হস্ত দূরে থাকতে ব্যগ্র। কারণ লেবার ডিক্‌টেটর হবার উপক্রম করছে টের পেলেই তার আগে প্রতিপক্ষ ডিক্‌টেটর সেজে বসবে। গায়ের জোর প্রতিপক্ষের বেশী। প্রেস প্রতিপক্ষের হাতে। সাফাই সৃষ্টি করা একান্ত সোজা। ব্যাংক প্রতিপক্ষের হাতে। আতঙ্ক সৃষ্টি করা কয়েক মিনিটের কর্ম। লেবার জানে যে তার প্রতিপক্ষের সঙ্গে ক্রিকেট খেলাই নিরাপদ, তাতে মাঝে মাঝে ব্যাট ধরবার সুযোগ মেলে।

৭

ডিক্‌টেটরশিপের লক্ষ্য সুস্পষ্ট, সুভেদ্য, নির্দিষ্টকালে নিবদ্ধ। ডেমক্রেসির কোনো লক্ষ্য নেই। যদি থাকে তবে তা মৃদু মন্থর প্রগতি। ডিক্‌টেটরশিপ বলে, সাত বছর সময় দাও। জার্মানীকে পরাক্রান্ত ও নিরভাব করে দিচ্ছি। পাঁচ বছর সময় দাও রাশিয়া শিল্পপ্রধান দেশ হবে। যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে বহুগুণ ফসল ফলবে। দশ বছর সময় দাও। ইটালী উপনিবেশ জয় করে নেবে। ডেমক্রেসি তেমন কোনো অঙ্গীকার করে না। প্রত্যেক নির্বাচনে প্রত্যেক দল কার্যতালিকা দাখিল করে বটে, কিন্তু সেসব খুচরা ঘরমেরামতি, তাতেও তারা ঢিলে দেয়। তাদের দোষ নেই। গৃহস্থ যে ট্যাক্স দেয় সেই খরচে তার বেশী হয় না। ট্যাক্স বাড়াবার নাম করলে নির্বাচনে মাত্‌ হতে হবে, বাড়ালেও পরবর্তী নির্বাচনে ইটপাটকেল ভাঙা বোতল পচা ডিম দিয়ে সংবর্ধনা করবে দেশের লোক।

বলা যায় না ডিক্‌টেটরশিপ যদি লক্ষ্যভেদে অক্ষম হয় তবে তার সংবর্ধনা কীরূপ হবে। যারা চড়া পণে জুয়া খেলতে যায় তারা জুয়াড়ির পরিণাম জেনেশুনেই যায়, বিনাশ তাদের অপ্রত্যাশিত নয়। যাঁরা রাশিয়ায় ডিক্‌টেটরশিপের দীর্ঘজীবন অথচ জার্মানী ও ইটালীতে তার অকালমৃত্যু কামনা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তত্রত্য ক্যাপিটালিজ্‌মের পতনকামী। তাঁদের সে অভিলাষ ডেমক্রেসি কর্তৃক পূরণ হবে না. তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্যে ডিক্‌টেটরশিপের মরণ নয় তার লক্ষ্যের পরিবর্তন আবশ্যক। ডেমক্রেসি ক্যাপিটালিজ্‌মের মিত্র। তার কাছে সোশ্যালিজ্‌মের প্রত্যাশা আকাশকুসুম। তবু এই প্রত্যাশাই অধুনাতন বামমার্গীয় আদর্শবাদীকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়। সামঞ্জস্যের ভরসায় সে ধৈর্যের সহিত দিন গুনছে। তার বিশ্বাস রাশিয়াতেও একদিন ডেমক্রেসির সূচনা হবে। সোশ্যালিস্ট ডেমক্রেসি।

ওদিকে দক্ষিণমার্গের আদর্শবাদীর মানসে ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে ডেমক্রেসির সমাহার নব নব বর্ণে উদ্‌ভাসিত হচ্ছে। ডিক্‌টেটরশিপ তার প্রার্থনীয় নয়, কিন্তু সোশ্যালিজ্‌মের চেয়ে ডিক্‌টেটরশিপ স্পৃহণীয়। সে প্রথমে ক্যাপিটালিস্ট, পরে ডেমক্রাট। ইটালী জার্মানী যেদিন ক্যাপিটালিজ্‌মের পক্ষে নিরাপদ হবে সেদিন ডিক্‌টেটরশিপের পরিবর্তে ডেমক্রেসি সংস্থাপিত হলেই সে প্রীত হবে। সে

খেলোয়াড় মানুষ, জুয়াড়ি নয়। ডিক্‌টেটর সম্বন্ধে তার মোহ নেই, আছে বিপৎকালে নির্ভর।

বিশ্লেষণ করলে দ্বন্দ্বটা মূলত ক্যাপিটালিজ্‌মের সঙ্গে সোশ্যালিজ্‌মের। ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ তার নিজের সংকট দেখলে আত্মরক্ষার জন্যে ডিক্‌টেটরশিপের বায়না দেয়। তা থেকে যদি কেউ সিদ্ধান্ত করেন যে ডিক্‌টেটর তার বরকন্দাজ তবে ভুল করবেন। ডিক্‌টেটরকে যে নিয়োগ করে সে তার। রাশিয়ায় সে প্রোলিটারিয়াটের, ইটালী জার্মানীতে সে ক্যাপিটালিস্টের। সে প্রভুভক্ত গুর্খা ভৃত্য। মালিকের বিচার করে না, যদি খোরাকী পায়। ডেমক্রেসি ভদ্রলোক। ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ তাকেই খাতির করে বেশী। কিন্তু সম্পত্তির গায়ে হাত পড়লে লোকে ভালোমানুষ বন্ধুর চেয়ে বিশ্বস্ত লাঠিয়ালের দিকে বেশী ঝোঁকে। সোশ্যালিজ্‌ম্‌ যখন নূতন দখল নিচ্ছে তখন লাঠিয়ালই তো তার একমাত্র অবলম্বন। সম্পত্তি রাখতে গেলেও যেমন কাড়তে গেলেও তেমনি, সম্পত্তির বেলায় ভদ্রতা করতে গেলে সর্বনাশ। যে মানুষ দুবেলা মালা গলায় তত্ত্বকথা আওড়ায় নিরামিষ খায় সেও সম্পত্তির জন্যে জাল করে, মিথ্যা জবানবন্দী দেয়, ভাইয়ের গলায় ছুরি চালায়।

অতএব দ্বন্দ্বটা মুখ্যত সম্পত্তিঘটিত।

(১৯৩৫)

যুগজিজ্ঞাসা

খুকুকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "খুকু, তুমি কাকে বেশী ভালোবাসো ? মাকে, না বাবাকে ?"

খুকু কী উত্তর দিল জানেন ? "মাকেও, বাবাকেও।"

তেমনি আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, "কাকে বেশী ভালোবাসো ? দেশকে, না যুগকে ?" আমি উত্তর দেব, "যুগকেও। দেশকেও।"

দেশ এত দিন পরাধীন ছিল বলে আমরা দিন রাত দেশের কথাই ভেবেছি, যুগের প্রতি মনোযোগ দিইনি, যখনি কেউ মনে করিয়ে দিয়েছে তখনি আধুনিককে পাশ্চাত্ত্য বলে এক খোঁচায় নস্যাৎ করে দিয়েছি। এখন তো দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন যুগের সঙ্গে মোকাবিলা করা দরকার। ঐ কাজটি বকেয়া পড়ে রয়েছে।

গত শতাব্দীর নায়কদের মধ্যে যুগজিজ্ঞাসা প্রবল ছিল। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কেউ দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে যুগকে অনাদর করেননি। কিন্তু ঐ শতাব্দীরই শেষ ভাগে উল্টো হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। দেশানুরাগ হয়ে দাঁড়াল দেশের অতীতানুরাগ, যে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের কোনো সম্বন্ধ নেই। প্রাচীন ভারত ও আধুনিক বিশ্ব এর একটাকে বরণ করতে গেলে অপরটাকে উপেক্ষা করতে হবেই, মাঝখানে সেতুবন্ধনের আশা দুরাশা। অথচ এমনি আমাদের পরাধীনতার জ্বালা যে আমরা ইংরেজ মনে করে ইউরোপকে বর্জন করব, ইউরোপ মনে করে আধুনিক যুগটাকে অগ্রাহ্য করব, থাকব কাকে নিয়ে ? না, ভারতের অতীতকে।

ভূতকে নিয়ে ঘর করা যায় না। তার থেকে এল সেতুবন্ধনের কথা। প্রাচীন ভারতও থাকুক, আধুনিক বিশ্বও থাকুক, মাঝখানে একটা সেতু নির্মাণ করা হোক। সমন্বয়। তার মানে গোঁজামিল। অতীত সম্বন্ধে কারই বা সম্যক ধারণা আছে যে দৃঢ় ভূমির উপর পা রেখে বলতে পারবে এই হলো সেতুর এক প্রান্ত ! প্রাচীন ভারতে যেমন দেবতা ছিল তেমনি দানব ছিল, যেমন মানুষ ছিল তেমনি রাক্ষস ছিল, যেমন পাণ্ডব ছিল তেমনি কৌরব ছিল, যেমন অহিংসা ছিল তেমনি অতি ভয়ংকর ভয়ংকর মারণাস্ত্র ছিল, যেমন আস্তিক দর্শন ছিল তেমনি নাস্তিক দর্শন ছিল। প্রাচীন ভারতের স্বরূপ অনেকটা আধুনিক ইউরোপের মতো। সেখানে বহু বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি ক্রিয়া করছে। তাকে এক কথায় আধিভৌতিক বলে পাতালে নামিয়ে দেওয়া যায় না, প্রাচীন ভারতকেও এক কথায় আধ্যাত্মিক বলে আকাশে তুলে দেওয়া যায় না, আকাশের সঙ্গে পাতালকে একসূত্রে গাঁথা যায় না।

এই পণ্ডশ্রমের পশ্চাতে ছিল পরাধীনতাবোধ। এখন তো সে বোধ নেই।

এখন পণ্ডিতদের বলা উচিত, আর পণ্ড শ্রম করতে হবে না, পুরোপুরি আধুনিক যুগের সঙ্গে অভিন্ন হও। অতীত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা অপরের মধ্যে যতটা দেখছ তোমাদের মধ্যেও ততটা থাকবে। প্রাচীন ভারত তার আয়ু নিঃশেষে ভোগ করেছে, তোমাদেরটাও যেন গ্রাস না করে।

আর এই যে আধুনিক যুগ, ইউরোপ বা আমেরিকা এর একমাত্র শরিক নয়। তোমরাও শরিকান। তোমরা এক হাতে নেবে, আর-এক হাতে দেবে, তোমাদেরও একটা ভূমিকা আছে, তোমরা তাতে অভিনয় করবে, কিন্তু খবরদার, সেটা হ্যামলেটের ভূতের পার্ট নয়। তোমরা প্রাচীন ভারতের ভূত নও। তোমরা আধুনিক ভারতের জীবন্ত মানুষ। তোমাদের ভূমিকা পূর্বনির্দিষ্ট নয়, তা সৃষ্টিশীল, তা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে চলবে। থাকবে তার মধ্যে তোমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য, কেউ সাধছে না তোমাদের মার্কিন বা রুশ হতে। কিন্তু আধুনিক যুগের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও থাকা চাই।

এ যুগ যে বিজ্ঞানের যুগ এ কথা সকলে জানে। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, মানবিকতার যুগ। যাকে বলে হিউমানিজম তার লক্ষণ হলো সমাজের চেয়ে মানুষ বড়ো, সম্প্রদায়ের চেয়ে মানুষ বড়ো, শ্রেণীর চেয়ে মানুষ বড়ো, সংঘের চেয়ে মানুষ বড়ো। আগেকার দিনে মানুষের চেয়ে মানুষের সমাজ ইত্যাদিকে বড়ো করে দেখা হয়েছে। নারীকে, শূদ্রকে, ক্রীতদাসকে নির্মম ভাবে ছোট করে রাখা হয়েছে, যেন সেটা তাদের দৈবলিখন। দৈবলিখন বলে চালানো হয়েছে যা প্রতিকারযোগ্য, যা প্রতিকার করা সম্ভব, তাকে। সনাতন বলে চালানো হয়েছে যা তৎকালীন তাকে। প্রাকৃতিক বলে চালানো হয়েছে যা কৃত্রিম তাকে। নৈতিক বলে চালানো হয়েছে যা বদ্ধমূল সংস্কার তাকে। সত্য বলে চালানো হয়েছে যা স্বার্থদুষ্ট তাকে।

বিদ্রোহ শুরু হয় ইউরোপের রেনেসাঁসের সময় থেকে। তা বলে বিদ্রোহটা শুধুমাত্র ইউরোপীয়দের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। ওটা সর্বমানবের। যেমন ভারতীয়দের অহিংস সত্যাগ্রহ সর্বমানবের। বিদ্রোহের ঢেউ এক বন্দর থেকে আর-এক বন্দরে পৌঁছলেও সেটা বন্দরের ঢেউ নয়, সমুদ্রের ঢেউ। বিদ্রোহের হাওয়া এক দেশ থেকে আর-এক দেশে পৌঁছলেও সেটা মাটির হাওয়া নয়, আকাশের হাওয়া। বিদ্রোহ ক্রমে ক্রমে আধুনিকতম রূপ নিয়েছে। কেউ পড়ে থাকতে চায় না, জাতের দরুন না, রঙের দরুন না, লিঙ্গের দরুন না। অনেক যুগের জমে থাকা পাপ এই যুগেই সাফ করতে হবে। তা সে যুদ্ধ করেই হোক বা বিপ্লব করেই হোক বা আপোসেই হোক বা বন্ধুভাবেই হোক। শ্রেষ্ঠ উপায় অবশ্য বন্ধুভাব বা অহিংসা। নিকৃষ্ট উপায় যুদ্ধ। একটা উপায় ব্যর্থ হলে মানুষ আর একটা উপায় পরীক্ষা করবেই। উদ্দেশ্য হলো স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা।

অবশ্য কেবল এই নিয়ে আয়ু শেষ করা সকলের কর্তব্য নয়। সৃষ্টির কাজ করে যেতে হবে আমাদের অনেককে। গায়ক গাইবে, বাদক বাজাবে, নর্তক নাচবে, ছবিকার ছবি আঁকবে, কবি কবিতা লিখবে। এসব কাজ এক দিনও

ফেলে রাখা যায় না। ফেলে রাখলে পরম্পরা কেটে যাবে। সাধনার ধারা শুকিয়ে যাবে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো এসব প্রক্রিয়া নিত্য বহমান। কেউ যদি বলে, এসব কিছু কালের জন্যে বন্ধ রাখলে ক্ষতি কী, তা হলে বুঝতে হবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মূল্য সম্বন্ধে তার কোনো ধারণা নেই। মানুষের দুর্ভাগ্য বর্তমান শতাব্দীতে এ ধরনের লোক সব দেশেই দলপতি হয়ে বসেছে। কোথাও কম কোথাও বেশী।

বন্ধ রাখলে সাধারণের দিক থেকেই আপত্তি ওঠে। তখন এরা বলে এদের ফরমাস মতো লিখতে, আঁকতে, গাইতে, বাজাতে, নাচতে। আর-এক আপদ। এর চেয়ে বন্ধ করা কম খারাপ। শিল্পীদের পক্ষে আধুনিক যুগে বেঁচে থাকা শক্ত। বাঁচা অবশ্য কায়িক অর্থে নয়। সৃষ্টি করতে করতে বাঁচা। এর একটা নিষ্পত্তি চাই, নইলে আর সব হবে, রস হবে না, রূপ হবে না, সৌন্দর্য হবে না। এ যুগ যখন অতীত হয়ে যাবে তখন এর কোনো শিল্পসম্পদ রেখে যাবে না। পরবর্তী যুগের ওরা বলবে এ যুগ নিষ্ফলা বন্ধ্যা।

সুতরাং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যা করতে চাও, করো। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রেখ শিল্পীদের বেঁচে থাকা দরকার। শুধু কায়িক অর্থে নয়, আত্মিক অর্থে। তারা যদি মনের মতো করে লিখতে না পারল, আঁকতে না পারল, গাইতে না পারল, নাচতে না পারল তা হলে তেমন বাঁচার কী তাৎপর্য! তারা যদি তোমাদের ফরমাসই খাটবে তা হলে তারা শিল্পী হতে যাবে কোন দুঃখে! তারা যুগের ভিতর দিয়ে কাজ করছে বটে, কিন্তু তারা নিত্য কালের রাখাল। অমৃতের সন্তান। যুগ যদি তাদের বিকৃতি ঘটায় সেটা যুগেরই মুখবিকৃতি। ভাবীকাল তা দেখে হাসবে।

এ যুগের ভিতর দিয়ে যেতে হবে সকলকেই। শিল্পীকেও। কিন্তু শিল্পীর পরমায়ু যুগের চেয়েও দীর্ঘ। সেইজন্যে তার সাধনাও যুগকে অতিক্রম করবার মতো দুরূহ। এই দুরূহ নিয়ে যারা আছে তাদের সহজ দিয়ে ভোলানো যায় না। যারা নগদ বিদায় চায় তাদের ধারা আলাদা। তারা আজ আছে, কাল নেই। কিন্তু যারা আজ আছে, কাল আছে, চিরকাল আছে তাদের কাজে হস্তক্ষেপ না করে চুপ করে দেখ তারা কী লিখছে, কী আঁকছে, কী দিচ্ছে। তারা যদি বাঁচে তাদের মধ্যে, তাদের সৃষ্টির মধ্যে, তোমরাও বাঁচবে।

শিল্পীর দুর্দিন সব দেশেই লক্ষ করছি। সেইজন্যে যুগকেই তার জন্যে দায়ী করি। এ যুগ যদি শিল্পীদের সহ্য না হয় তা হলে আফসোসের সীমা থাকবে না, কারণ এমন বিষয়বস্তু, এত ঘাত প্রতিঘাত, এত রকম চরিত্র, এ পরিমাণ সংস্কারমুক্তি আর কোনো যুগে সম্ভব হয়নি।

(১৯৫৪)

জীবনশিল্পী রবীন্দ্রনাথ

এমন অনেক শিল্পীর কথা আমরা জানি যাঁদের হাতের ছোঁয়া লেগে পাষাণ হয়েছে অহল্যার মতো শাপমুক্তা সুন্দরী. কিন্তু যাঁদের নিজেদের জীবনের বেলায় তাঁদের শিল্পিত্ব খাটেনি। সেক্ষেত্রে তাঁরা অবস্থার দাস এবং তাঁদের জীবনের আদর্শও দুর্বল। অথচ শিল্পী নন এমন কোনো কোনো মানুষের জীবন এক-একখানি শিল্প-সৃষ্টির মতো সযত্নরচিত সুসংগত, অবান্তরতাবিহীন।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি তাঁর অপরাপর কাব্যের মতো করে তাঁর জীবনকালকেও ছন্দে মিলে উপমায় ব্যঞ্জনায় কল্পনার প্রসারে ও অনুভূতির গভীরতায় একখানি গীতিকাব্যের ঐক্য দিয়েছেন। সেটি বেশ একটি গোটা জিনিস হয়েছে, ভাঙা ভাঙা বা অসম্বন্ধ হয়নি, অন্তর্বিরোধসম্পন্ন বা অসংগতি-বহুল হয়নি। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর জীবন। তাঁর অন্যান্য কীর্তি বিস্মৃত হয়ে যাবার পরও তাঁর এই কীর্তিটি জীবিত মানুষের আন্তরিকতম যে-জিজ্ঞাসা—"কেমন ভাবে বাঁচব?"—সেই জিজ্ঞাসার একটি সত্য ও নিঃশব্দ উত্তর হয়ে চিরস্মরণীয় হবে।

দেশের অতি বড়ো দুর্গতির দিনে যখন পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শকে লোকে যুগপৎ উপহাস ভয় ও সন্দেহ করছে তখন রামমোহন রায়ের জন্ম। এই মহাপুরুষ শাশ্বত ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করে তাকে একটি বৃহত্তর পরিধির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন দেশকালের অতীত হয়ে বাঁচবার দৃষ্টান্ত। আধুনিক ভারতবর্ষের জনক-ঋষি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের জনক। তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথ পেলেন ঋষি-দৃষ্টি ও মহত্ত্বের প্রতি নিয়ত আকাঙ্ক্ষা। ঠাকুর পরিবারে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও আধুনিক পৃথিবীর সমন্বয় ঘটেছিল। যৌবনারম্ভে মহর্ষি উপনিষদের পৃষ্ঠা কুড়িয়ে পান ও মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে তাঁকে Geology-র গ্রন্থ পড়তে দেখা গেছল। এই দুটি ঘটনা থেকে ঠাকুর পরিবারের আবহাওয়া অনুমান করা যায়। ধর্মে ও কর্মে, ত্যাগে ও ভোগে, কলায় ও বিদ্যায়, স্বাজাত্যে ও বিশ্ব-মানসিকতায় ঠাকুর পরিবারের শিক্ষা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ছিল। স্কুল-কলেজের অপেক্ষা রাখেনি। এই পরিবারের কাছে ও মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পেলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোরের শিক্ষা।

স্কুল-যন্ত্রের কবল থেকে অক্ষত দেহ মন নিয়ে বেরোতে পারা রবীন্দ্রনাথের মতো শক্তিধর ব্যক্তির পক্ষেও অসম্ভব হতো। ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন, রুটিন ও এগ্‌জামিনের যুগল হস্তের ঘন ঘন চপেটাঘাতে কল্পনাবৃত্তি অসাড় হয়ে যায় ও পাঠ্যপুস্তকে নিবদ্ধ

হয়ে পর্যবেক্ষণশক্তি হয় আড়ষ্ট। পাছে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে ও তার ফলে বিক্ষেপ জাত হয় তার দরুন স্কুল-ঘরের চারদিকে চার দেওয়াল প্রহরীর মতো খাড়া। যঃ পলায়তি সঃ জীবতি। রবীন্দ্রনাথ স্কুল পালিয়ে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজের হাতে নিলেন। আজও সে-দায়িত্বে ঢিলে দেননি। তাঁর মতো বহুবিদ্য ব্যক্তি যে-কোনো দেশে বিরল। কিন্তু অধীত বিদ্যা প্রচার করার চেয়ে বিদ্যার সৌরভ বিকিরণ করাই যথার্থ পাণ্ডিত্য। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাকে রসায়িত করে কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে পরিবেশন করেছেন, তা নিয়ে থীসিস লেখেননি। তাঁর লঘুতম রচনাতেও মার্জিত বুদ্ধির যে-দীপ্তি দেখতে পাই সে-দীপ্তি অশিক্ষিতপটুত্বের নিদর্শন নয়। প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে আমাদের একটা ভ্রান্তি আছে— তাঁরা বিনা সাধনায় সাফল্য লাভ করেন, যেহেতু তাঁরা দৈবশক্তিসম্পন্ন। রবীন্দ্রনাথ ডায়েরী রাখেননি, কিন্তু তাঁর 'ছিন্নপত্র" থেকে জানি তিনি যেমন সব্যসাচী লেখক তেমনি সর্বভুক পাঠক এবং তাঁর পর্যবেক্ষণশীলতা ও কল্পনাকুশলতা কি প্রকৃতির সংসার, কি মানবের সংসার, উভয়ের অন্তরবাহির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করেছে।

স্কুল-কলেজে না গেলে ভদ্র সমাজে এক-ঘরে হতে হয় এবং জীবিকা সম্বন্ধে অতি বড়ো ধনী সন্তানেরও ভয় থাকে। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে স্কুল ত্যাগ করে তাঁর নিজের দিক থেকে ঠিক করলেও অন্য সকলে নিশ্চয়ই তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন ও তিনি ভুল করলেন বলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। জীবনশিল্পী এমনি করেই নিজের পরিচয় দেন। পশুপক্ষীর ইনস্টিংক্টের মতো শিল্পীপ্রকৃতি মানুষের মধ্যেও ইনটুইশনের ক্রিয়া অমোঘ। কোন্ পথে মহতী বিনষ্টি তা ওঁরা লাভ-লোকসান তৌল না করে যুক্তিতর্কের মধ্যে না নেমে আপনার অপ্রবৃত্তি থেকেই উপলব্ধি করেন এবং আত্মহত্যার পথকে সমগ্র শক্তির সহিত পরিহার করেন।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনোদ্‌গমে বিলাত-যাত্রা তাঁর স্কুল-পরিত্যাগেরই মতো একটি অর্থপূর্ণ ব্যাপার। তখনো আমাদের সমাজে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ও অপ্রচলিত ছিল। অথচ বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় কেবলমাত্র বিদেশী গ্রন্থপাঠের দ্বারা হবার নয়। পৃথিবীতে এসে পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হলো না, এর মতো দুঃখের কথা অল্পই আছে। বিশেষত যে-মানুষকে একদিন মানবমাত্রের বন্ধু হতে হবে, প্রতিভূ হতে হবে, মানব সম্বন্ধে তুলনামূলক জ্ঞান তার সাধনার অত্যাবশ্যক অঙ্গ। গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করবার পূর্বে স্বদেশের সঙ্গে বিদেশকে ও নিকটের সঙ্গে দূরকে মিলিয়ে দেখা, পূর্ব ও পশ্চিম উভয় মহাদেশের বহুকালীন আদর্শ। তার ফলে মাত্রাজ্ঞান জন্মায়, অহংকার ও মোহ কিছু কমে এবং নিজের ও পরের মাঝখানকার সত্যকার সীমা-রেখাটি আবিষ্কৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শোনা গেছে যে, তিনি জমিদার হিসাবেও বিচক্ষণ ছিলেন। কিন্তু বিচক্ষণ জমিদার হবার দরুন তাঁর বাণী তিক্ত, উদ্ধত বা বিষয়ীসুলভ হয়নি। পরন্তু বিচক্ষণ জমিদার হবার দরুন তাঁর রচনা রুগ্ন আদর্শবাদ ও গলদশ্রু ভাবালুতা থেকে মুক্ত। পরোপকার করতে চাইলেও করা উচিত নয়, যদি তার ফলে পরের

আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা হয় বিড়ম্বিত। আমাদের দরিদ্রনারায়ণ-সেবা, কাঙালী-ভোজন ইত্যাদি আদর্শ এমন অস্বাস্থ্যকর যে, যথার্থ করুণা ও লোকপ্রীতির পৌরুষ তাতে নেই।

প্রাচীন ভারতবর্ষের গার্হস্থ্যের আদর্শই হচ্ছে সর্ব দেশের সর্ব কালের পূর্ণবয়স্ক মানুষের আদর্শ। তার মধ্যে ভোগ ও ত্যাগ, আনন্দ ও সংযম পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। কেবল বিপন্নকে অভয়দান ও আতুরের সেবা নয়, অন্যায়কারীকে আঘাত ও অশিষ্টকে শাসনও তার অন্তর্গত। বিষয়সম্পত্তিকে উক্ত আদর্শ বিষের মতো পরিহার করতে বলেনি, বৃদ্ধি করতে রক্ষা করতে ও বিত্তের মতো ব্যবহার করতে বলেছে। এই সম্পূর্ণতার আদর্শ সেকালে তথা একালে বহু মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাই সেকালে লোকে সন্ন্যাসী হয়ে যেত, একালে সোশ্যাল সার্ভিস নিয়ে মাতে। বিচিত্র সংসারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কর্তব্যগুলোর প্রত্যেকটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাতে চরিত্রের প্রতি অঙ্গের চালনা হয়। এই চালনাই স্বাস্থ্যকর। দুনিয়ার দুঃখদৈন্য দূর হলো কি-না সেটা ভাবতে যাওয়া অস্বাস্থ্যকর।

রবীন্দ্রনাথের গৃহস্থাশ্রমের দৃশ্য আমরা তাঁর সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের পত্রবিনিময়ের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাই। ক্রমে ক্রমে যখন অন্যান্য চিঠিপত্রের বাতায়ন-দ্বার মুক্ত হবে তখন পূর্ণ দৃশ্যটি উদ্‌ঘাটিত হবে। সেটির এটা-ওটা করে অনেক রেখা ও রঙ আমাদের অপছন্দ হলেও আমাদের কাছে সমগ্র চিত্রখানির মূল্য কমবে না। রবীন্দ্রনাথ কাঁচা বা পাকা যা-কিছু লিখেছেন, হাতের লেখার দিক থেকে প্রত্যেকটি সুন্দর এবং সাহিত্যের দিক থেকে প্রত্যেকটি স্বকীয়। এর থেকে অনুমান হয় যে, তুচ্ছ বা মহৎ কোনো কাজই তাঁর পক্ষে হেলাফেলার যোগ্য নয় এবং তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি সর্বমুহূর্তে সতর্ক থাকে পাছে তাঁর বহিঃপ্রকৃতিতে কিছুমাত্র কুশ্রীলতা বা মামুলিয়ানা প্রকটিত হয়ে পড়ে।

একালের মানুষ দিন দিন পল্লীকে ছেড়ে নগরে জুটছে। নগরের প্রধান আকর্ষণ তার নিত্য নতুন চমক, নিত্য নতুন খবর, নিত্য নতুন শিক্ষা, নিত্য নতুন সঙ্গ। এ আকর্ষণকে উপেক্ষা করা যায় না। কত অঞ্চলের কত দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিজের অভ্যস্ত আচার ও মনগড়া বিচারকে আমরা আর-একটু উদার করি। কিন্তু হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র চরিতার্থতার জন্যে পল্লীই ছিল ভালো এবং পল্লীতে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে পশুপক্ষী-বৃক্ষলতা-নদী-পর্বতের বৃহত্তর সমাজে ছিলুম। নগর যেমন নিত্য নতুন, পল্লী তেমনি চিরন্তন। দুটোই সত্য এবং দুটোকে জড়িয়েই সত্য। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর প্রতি পক্ষপাত করলেও নগরকে বর্জন করলেন না। প্রকৃতির সুধা ও জনসংঘাত-মদিরা পান করে তিনি উভয় সত্যের স্বাদ গ্রহণ করলেন। পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসের দিনগুলি আধুনিক যুগের নাগরিক মানুষের কাছে কেমন রোমান্সের মতো লাগে। অতটা নির্জনতা আমাদের সয় না। তাতে আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্নিমান্দ্যের সূচনা করছে। পল্লী ও নগর উভয়কে উপভোগ করতে পারা চাই। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে গিয়ে উচ্ছ্বসিত

হওয়া উপভোগ করা নয়। একান্তভাবে সভ্য ও আধুনিক হতে গিয়ে যা সৃষ্টি করব তা আধুনিকতার মতো অচিরস্থায়ী ও সভ্যতার মতো অগভীর হবে। অবিমিশ্র নাগরিক অভিজ্ঞতার উপদ্রব আমরা সাহিত্যে পোহাচ্ছি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে জীবচরিত্র অধ্যয়ন করার মতো নগর থেকে কি মানবচরিত্র, কি বিশ্বব্যাপার, কোনোটার ঠিকমতো নিরিখ হয় না। বাস্তব বলে যাকে চালাই সেটা একটা বিশেষ অবস্থার বাস্তব। বদ্ধ ঘরে প্রতিধ্বনির মতো জীবনের হাহাকারকে নগর অতিরঞ্জিত করে। জীবনের দুঃখদৈন্যগুলোকে অপরিমিত কালের পটভূমিকায় প্রসারিত করলে তাদের সত্যিকারের পরিমাণ উপলব্ধি করি এবং মানুষের সংসারকে অপরিমিত প্রাণলোকের অধিকারভুক্ত বলে জানলে যা নিয়ে উত্তেজিত পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছি তার দিকে সুদূরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আনন্দ পাই।

রবীন্দ্রনাথের যৌবনের দিনগুলি অল্প পরিসরের মধ্যে সত্য ছিল, সম্পূর্ণ ছিল। সাংসারিক উচ্চাভিলাষ তাঁর ছিল না এবং সাহিত্য তাঁকে দেশের সর্বত্র পরিচিত করালেও দেশের কর্মপ্রবাহ থেকে তিনি দূরেই ছিলেন। হঠাৎ একদিন দেশে নব-যুগের প্রাণস্পন্দন এল, সে যে কী অপূর্ব জন্মলক্ষণ 'ঘরে-বাইরে'তে তার বর্ণনা আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিভৃত সাধনা ছেড়ে সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন। বৃহৎ সংসারের প্রতি কর্তব্য একদিন-না-একদিন করতেই হবে— দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি, পৃথিবীর প্রতি। কিন্তু সেই কর্তব্য যার প্রতি, সে যে পরিমাণে বৃহৎ, কর্তব্যের পূর্বাহ্নের সাধনাও যেন সেই পরিমাণে বিপুল হয়। দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা কেবলমাত্র পণ্যনিবদ্ধ ছিল না, দেশের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত ইত্যাদি ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের মতো তাঁরও অনুরাগের সামগ্রী ছিল। দেশের শিল্পদ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকতা এঁরা স্বদেশী আন্দোলনের চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই করে আসছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি জনকয়েক মিলে একটি স্বদেশী বস্ত্রের দোকানও খুলেছিলেন। দেশে জন্মেছি বলে দেশ আমার নয়, দেশকে নিজের তনুমন দিয়ে সৃষ্টি করেছি বলে দেশ আমার, পেট্রিয়টিজ্‌মের এই সূত্রটি দেশকে রবীন্দ্রনাথ ধরিয়ে দিলেন। দেশ এর মর্যাদা তখন বুঝল না, এতদিন পরে আজ বুঝছে!

দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে আধুনিক কালের উপযুক্ত করে দেশকে একদিক থেকে সৃষ্টি করার ব্রত নিলেন তিনি নিজে। এই উদ্দেশ্যে শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা। আধুনিক কালে 'আশ্রম' কথাটির অর্থ বদলে গেছে। এখন আমরা 'আশ্রম' বলতে সাধনাপীঠ বুঝে থাকি। যথা শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম প্রাচীন অর্থের আশ্রম অর্থাৎ অবস্থা। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্যাশ্রম ও তাঁর শিষ্যগণের ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরস্পরের পরিপূরকতা করল। এর আরম্ভ অতি সামান্য আকারে। এর দ্বারা রাতারাতি দেশের দুঃখমোচনের আশা ছিল না। নিরক্ষরতা দমন নয়, অর্থকরী বিদ্যাবিস্তার নয়, জনসেবা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়। জীবনের সর্বাঙ্গীণতার প্রতি দৃষ্টি রেখে জীবনের প্রথম অঙ্গের অনুশীলন, পরিপূর্ণরূপে

বালক হওয়া। আজ যারা পরিপূর্ণরূপে ফুল হতে পেরেছে তারাই কাল পরিপূর্ণ-রূপে ফল হতে পারে, অপরে নয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমী বালকের দেহ-মনকে নানাদিকে স্ফূর্তি দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ খেলা, অভিনয়, গান ও উপাসনা এগুলিকে বিদ্যা-শিক্ষার মতোই প্রয়োজনীয় বলে গোড়া থেকেই জেনেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বা নীতিশিক্ষাকে স্ফীত হতে দেননি এবং অপরগুলিকে ওর কোনোটার বাহন করেননি। বিদ্যার্জনই বালকের একমাত্র বা প্রধান করণীয়, সভ্যসমাজ থেকে এই বদ্ধমূল কুসংস্কার যদি কোনো দিন ঘোচে তবে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর দেশ ও জগৎ আর-একটু ভালো করে বুঝবে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে একাধিক প্রিয়জনের মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের দারুণ দুর্ভাগ্য। কিন্তু এই করুণ অভিজ্ঞতাকে রবীন্দ্রনাথ অপচিত হতে দেননি। তাঁর 'খেয়া' ও 'গীতাঞ্জলি' এই বেদনার রূপান্তর। তাঁর জীবন ও তাঁর কাব্য যেন এমন একটা পরিণতির প্রতীক্ষা করছিল। ফলের পক্বতার পক্ষে প্রখর রৌদ্রের প্রয়োজন ছিল। তাঁর মধ্যে কারুণ্যের সঞ্চার না হলে তিনি সকলের সব কালের কবি ও প্রতিভূ হতে পারতেন না। প্রিয়-বিয়োগের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের প্রৌঢ়ত্বকে একান্ত mystic-ভাবাপন্ন করলে। তিনি ভগবানের মধ্যে হারানো প্রিয়দের সঙ্গ পেলেন, তাই ভগবান হলেন তাঁর প্রিয়তম। যিনি এতদিন পিতা ছিলেন, তিনি হলেন সখা ও প্রেমিক। 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি' রচিত হলো।

অকস্মাৎ রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীব্যাপী খ্যাতির অধিকারী হন। ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ নেই। রোগশয্যাবিনোদনের জন্যে কয়েকটি বাংলা রচনার ইংরেজী তর্জমা করেছিলেন, সেগুলি কী মনে করে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইরিশ কবি ইয়েট্‌সকে পড়তে দেন। একদা যেমন দুর্ঘটনার ভিড় জমেছিল একদিন তেমনি যশ, অর্থ ও সম্মান বন্যার মতো দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত করে এল। দুঃখের সময় যিনি অভিভূত হননি সুখের দিনেও তিনি অভিভূত হলেন না। বঙ্গের কবি বিশ্বের অর্ঘ্য সহজভাবে নিলেন। ছিন্নভিন্ন পরাধীন দীনদরিদ্র দেশের মানুষ সাধনা করেছিলেন দিগ্বিজয়ীর মতো, আরম্ভ করেছিলেন রাজকীয় ধরনে। হাতে রেখে দান করেননি, হাতে-হাতে ফল চাননি। যাঁর অধিক মূলধনের কারবার, তাঁর বিরাট ক্ষতি, বিরাট লাভ, তাঁর লাভের জন্যে ত্বরা নেই। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় ও ব্যাপক যোগাযোগ, মানুষের গভীরতম চরিত্রে আস্থা, ভগবানের কল্যাণবিধানে সংশয়হীন বিশ্বাস, সৌন্দর্যের রসায়নে ব্যবহারিক জীবনকেও রসায়িত করা— এতগুলো বড়ো বড়ো জিনিস কি ছোট একটি দেশে আবদ্ধ থাকতে পারত? দু দিন আগে না হলে দু দিন পরে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ত। তারপর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন up-to-date. বিশ্ব-সাহিত্য তাঁর ভালো করে জানা, বিশ্বের আধুনিকতম ভাবনাগুলো তাঁরও ভাবনা। বাংলা দেশের পদ্মা নদীতে নৌকাবাস করবার সময় তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থলেই বাস করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত হবার পর থেকে তাঁর দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। বৃহত্তর মানব-

সংসারের ব্যাপারে তাঁর ডাক পড়ল। গত মহাযুদ্ধের বিনষ্টির ক্ষণে Nationalism সম্বন্ধে তাঁর নির্ভীক উক্তি তাঁকে তখনকার মতো অপ্রিয় করলেও আজ সভ্যজগতের বহু মনীষী ব্যক্তি তাঁরই মতে মত মিলিয়েছেন। মানুষের নতুন ভবিষ্যতের তিনি অন্যতম স্রষ্টা, সেই ভবিষ্যতের প্রতি বাৎসল্য তাঁর স্বদেশবাৎসল্যকেও ছাড়িয়ে যায়, তাই তাঁকে আমরা ভারতবর্ষের নেশন্ হওয়ার দিনে পাচ্ছিনে। কিন্তু যখনি ধর্ম আমাদের পক্ষে, তখনি তিনি আমাদের পক্ষে। জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিবাদ করতে তিনি মুহূর্তমাত্র দ্বিধা বোধ করেননি।

মহাযুদ্ধের পর ইউরোপখণ্ডে লীগ্ অফ্ নেশন্স্-এর প্রতিষ্ঠায় Nationalism-এর জড় মরল না। যা যেমন ছিল তা প্রায় তেমনি থাকল। মানুষের চরিত্রে যা শ্রেষ্ঠ, তা নিয়ে নেশনও নয়, লীগ্ অফ্ নেশন্স্ও নয়। স্বার্থের ঊর্ধ্বে না উঠতে পারলে মিলন সত্যকার হতে পারে না। হাট-বাজারকে আমরা মিলনস্থলী বলিনে। মানুষ যেখানে জ্ঞানবিনিময়, প্রীতিবিনিময় করে, সেইখানে তার মিলন-তীর্থ। রবীন্দ্রনাথ একপ্রকার বে-সরকারী লীগ স্থাপন করলেন, অফ্ নেশন্স্ নয়—অফ্ কাল্চারস্। তাঁর বিশ্বভারতী বিশ্বের সকলের ভারতী। মহাযুদ্ধের মহাপ্রলয়ের পর এই একটি সৃষ্টির মতো সৃষ্টি! আজ যথেষ্ট মর্যাদা পাচ্ছে না এ। বটবৃক্ষের বীজের মতো এর আকার ক্ষুদ্র, আয়োজন অল্প। কিন্তু বিপুল সম্ভাবনা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের থাকে তবে এরই আছে। আমাদের গৌরব এই যে "এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে" এমন একটি পুণ্যতীর্থের প্রতিষ্ঠা হলো।

রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী হয়ে, শতায়ু হয়ে, তাঁর জীবন-শতদলের অপরাপর দলগুলি উন্মোচন করতে থাকুন। সেই তো তাঁর মুক্তি। একটি মুক্তপুরুষের দৃষ্টান্ত লক্ষ মুক্ত-পুরুষের আবাহন করে। কাল নিরবধি, পৃথিবীও বিপুলা। রবীন্দ্রনাথের উত্তর-পুরুষরা এই বলে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন যে, মানুষের যা চরম উত্তরাধিকার তাই তিনি দিয়ে গেলেন। সেটি হচ্ছে, "কী ভাবে বাঁচব" এই জিজ্ঞাসার নিঃশব্দ উত্তর।

(১৯৩১)

বার্নার্ড শ

বছর চারেক ব্যাঙ্কের চাকুরি করে বিশ বছর বয়সে বার্নার্ড শ ডাবলিন ছাড়লেন। ব্যাঙ্কের কাজে তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, সে মার্গে সাফল্য ছিল তাঁর করায়ত্ত। কিন্তু তাঁর প্রতিভার মার্গ অন্যতর, ক্ষেত্রও অন্যত্র। এরূপ অস্পষ্ট বোধ নিয়ে তিনি লণ্ডনে গেলেন। সেখানে তাঁর মা ছিলেন সঙ্গীতের শিক্ষয়িত্রী। বড়ো ঘরের মেয়ে, স্বামী মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিয়েছেন বলে নিজেকে উপার্জনের উপায় দেখতে হয়।

হিতৈষীরা পরামর্শ দিলেন চাকুরি করো, মায়ের সাহায্যে লাগো। কেউ কেউ চাকুরিও যোগাড় করে দিলেন। শ কিন্তু দরিদ্রা মায়ের গলগ্রহ হয়ে বছরের পর বছর কাটালেন। এটা ওটা খুচরো কাজ করেন, কোনো গানের আসরে পিয়ানো বাজান, কোনো সঙ্গীত সমালোচকের সহকারী হয়ে সমালোচনা লিখে দেন। টেলিফোন কোম্পানীতে যোগ দিয়ে বেশী দিন মন লাগে না, তবু সেই উপলক্ষে লণ্ডনের সর্বত্র ঘুরে দেখা হয়। মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারী যেদিন বিনা মাশুলে খোলা থাকে সেদিন মূর্তি বা ছবি দেখে বেড়ান।

প্রতি রাত্রে পাঁচ পৃষ্ঠা করে লিখতে লিখতে পাঁচ বছরে পাঁচখানা নভেল লিখে ফেললেন। কোনো প্রকাশক সেসব নভেল ছাপল না। তখন তিনি লিখলেন খবরের কাগজে রঙ্গ সমালোচনা। থিয়েটারের, কনসার্টের, প্রদর্শনীর। পাঁচ বছরের নীরব সাধনায় ভাষা শিখেছিলেন। সঙ্গীত তাঁর মায়ের কাছে শেখা, অভ্যাস করে আসছিলেন। আর তাঁর হাস্যরস তাঁর স্বভাবগত। লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ বিদূষক বলে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। অমনি তাঁর উপর হলো অর্থবৃষ্টি।

ইতিমধ্যে তিনি কার্ল মার্ক্স্ পড়েছিলেন। সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। ব্যক্তিগত সাফল্যের মোহ তাঁর ছিল না। নতুন সমাজের আইডিয়া তাঁকে সম্পূর্ণ অধিকার করেছিল। তিনি সুযোগ পেলেই বক্তৃতা দিতেন। সেই বক্তৃতাই হাস্যরসের সহিত ওতপ্রোত হয়ে অভিনয়-সমালোচনা আকারে পত্রিকার পাতে পরিবেশিত হতো। যে মানুষের নিজের কোনো বাঁধন নেই লোভ নেই সংস্কার নেই তাকে ঠেকায় কিসে? তার উপর রাগ করলে সে ভয় পায় না, তাকে গালাগালি দিলে সে তামাশা করে, তার সঙ্গে তর্কে নামলে সে নাকাল করে ছাড়ে।

একটি ছোট থিয়েটারে ইবসেনের নাটক অভিনীত হয়। ইংলণ্ডে কেন অমন নাটক লেখা হয় না? শ বললেন, আচ্ছা, আমি লিখছি। তাঁর প্রথম নাটক *Widowers' Houses* চারিদিকে নিন্দার ঝড় তুলল। তিনি আবিষ্কার করলেন

যে তিনি নাটক লিখতে পারেন এবং যা আজ নিন্দার ঝড় তাই কাল স্তুতির ঝড় হবে। তিনি আবিষ্কার করলেন যে থিয়েটারই তাঁর চার্চ, নাটকই তাঁর সার্মন। একদিন চার্চ খালি করে লোক থিয়েটারে আসবে ধর্মের ব্যাখ্যান শুনতে।

তাঁর ধর্ম তিনি ইতিমধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন। সে-ধর্মের তত্ত্ব হচ্ছে ক্রিয়েটিভ ইভলিউশন, আর কর্মকাণ্ড হচ্ছে সোশ্যালিজম্। বিবর্তনবাদ প্রচলিত হয়ে অবধি পরমপিতা পরমেশ্বর যে ক্ষুদ্র কীট থেকে বৃহৎ তিমি পর্যন্ত সকলের এককালীন স্রষ্টা এ ধারণা সুধীজনের পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু বিবর্তন সম্বন্ধে সেকালের লোক ডারউইনকে একমাত্র প্রামাণিক বলে গ্রহণ করায় ব্যক্তিসম্পত্তিবাদীদের বিবেক দরিদ্রের দুঃখ দেখে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করছিল না। অস্তিত্বের জন্যে সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন। ধনিকরাই যোগ্যতম, তারাই থাকবে। শ্রমিকরা মরবে। প্রকৃতির নিয়ম যন্ত্রের মতো অমোঘ ও নির্মম। সেই যন্ত্রের দ্বারা প্রতি-নিয়ত বাছাইয়ের কাজ চলেছে। যারা প্রকৃতির আপন হাতে নির্বাচিত হলো তারা পৃথিবীর প্রভু ও ভোক্তা। যারা বাতিল হলো তারা ভারবাহী, তারা ভোগ করবে না, তারা ভুগবে।

ডারউইন কথিত বা ডারউইনের প্রতি আরোপিত এই হৃদয়হীন সমাচার কখনো মানুষের নব ধর্ম হতে পারে না পুরাতন ধর্মের স্থান পূরণ করতে পারে না। এটা ধর্ম নয়, এটা ধনিকতন্ত্রের সাফাই। এ যদি ধর্ম হয় তবে চুরি ডাকাতিও ধর্ম। বার্নার্ড শ তাই ডারউইনকে উপহাস করলেন। তিনি গেলেন ডারউইনের পূর্বগামী লামার্কের কাছে। প্রাণী আপনাকে ইচ্ছানুযায়ী বিবর্তিত করতে পারে, এত কাল তাই করে এসেছে। চিরকাল তাই করবে। প্রকৃতি একটা যন্ত্র নয়, প্রকৃতি পরীক্ষা করছে, ভুল করছে, ভুল করতে করতে ঠিক করছে, যা ঠিক করছে তাকে বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত করছে। ইচ্ছা করলেই আমরা আমাদের সমাজের গঠন পরিবর্তন করতে পারি, তার দ্বারা বংশের বিবর্তন ঘটাতে পারি, অতিমানব হয়ে উঠতে পারি। আর তা যদি না করি, যদি যন্ত্রের হাতে আত্মসমর্পণ করি, তবে পরিবর্তনশীল পরীক্ষাপরায়ণা প্রকৃতি একদিন আমাদের উপর আস্থাহীন হয়ে অন্য কোনো প্রাণীকে শ্রেষ্ঠতায় উন্নীত করবে। আমাদের প্রতি তার পক্ষপাতের হেতু নেই।

সমাজের গঠন কীরূপ হবে পুরাতন ধর্মপ্রবর্তকগণ তার সূচনা দিয়ে গেছেন। আমরা তার কালোপযোগী সংস্কার সাধন করলে তাই হয়ে দাঁড়ায় সোশ্যালিজম্। সঞ্চয় ও সম্পত্তি প্রায় প্রত্যেক প্রবর্তকের দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। যীশু বলেছেন উটের পক্ষে বরং সূচের ছিদ্র দিয়ে যাওয়া সহজ, কিন্তু বড়ো লোকের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ দুষ্কর।

অথচ সম্পত্তি না হলে মানুষের চলে না। চাষ করব, তার জন্যে হাল লাঙল চাই। বাস করব, তার জন্যে এক কাঠা জমি চাই। সম্পত্তি দোষের নয়, দোষের হচ্ছে ব্যক্তির স্বত্ব। সেইজন্যে সোশ্যালিস্টদের প্রস্তাব সম্পত্তি রাষ্ট্রের অধিকারে যাক, ব্যক্তির যা দরকার তা ব্যক্তি নিক রাষ্ট্রের ভাণ্ডার থেকে। তা নইলে ধনী

দরিদ্রের উপর প্রভুত্ব করতে থাকবে, দরিদ্রের সম্পত্তি কিনে নিয়ে তার স্বাধীনতা কিনে নিতে থাকবে। রাষ্ট্র সকলের সম্পত্তি গ্রহণ করে তার পরিচালনা করবে ও লাভ হতে সকলকে সমান ভাগ দেবে। ব্যক্তির নিজের সঞ্চয় বলে কিছু থাকবে না. কারণ সঞ্চয়ই তো মূলধন, মূলধন থেকেই তো পরকে খাটিয়ে স্বয়ং লাভবান হওয়া। উৎপাদনের উপায় ব্যক্তির হাতে দেওয়া যাবে না, ব্যক্তিকে দেওয়া যাবে কেবল সম্পত্তির ব্যবহার।

রাষ্ট্রের ওপর সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করার আনুষঙ্গিক বিপদ এই যে রাষ্ট্রের চালক যারা হবে তারা চালনকার্যে অনিপুণ হতে পারে। নাবিক অনভিজ্ঞ হলে জাহাজের ভরাডুবি। সাধারণত যারা ভোটের জোরে পার্লামেন্টে যায় ও পার্টির জোরে গবর্নমেণ্ট দখল করে তাদের মূঢ়তা, অদূরদর্শিতা ও হৃদয়হীনতা এত বেশী যে তাদের স্কন্ধে সকল সম্পত্তি ন্যস্ত করলে সর্বনাশ অনিবার্য। অতএব এক দল অতিমানব চাই। এদের প্রজনন করতে হবে যেমন করে উৎকৃষ্ট বৃষ বা উৎকৃষ্ট অশ্ব প্রজনন করা হয়। সমাজের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের দ্বারা হবে আধান, শ্রেষ্ঠ নারীদের দ্বারা ধারণ। পরস্পরের সহিত দাম্পত্য জীবন-যাপনে এদের অরুচি থাকতে পারে, কিন্তু সমাজহিতায় জগদ্ধিতায় চ এরা সাময়িকভাবে সংগত হবে। ফলে যেসব সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে তারাই হবে সকলের ভাগ্যবিধাতা।

বার্নার্ড শ-র মতবাদের থেকে অতিমানবের আবশ্যকতা এমন অবিচ্ছেদ্য বলে সে মতবাদ সোশ্যালিস্ট মহলেও উপেক্ষিত। ইংলণ্ডের সোশ্যালিস্টরা অতিমানব চায় না, তারা চায় পক্ষপাতী ভোটার। বেশীর ভাগ ভোট যেদিন তাদের হস্তগত হবে সেদিন তারা অর্থাৎ তাদের নায়করা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে ভোটারের নির্দেশ অনুসারে। ইংলণ্ডের সোশ্যালিস্টরা ডেমক্রেসির ওপর আস্থা রাখে। তার মানে বেশীর ভাগ লোকের মত যে একদিন তাদের মতবাদের অনুকূল হবে এ তাদের ধ্রুব বিশ্বাস। তা যদি হয় তবে একে একে রেলপথ, খনি, ব্যাঙ্ক, কলকারখানা, জমি ইত্যাদি রাষ্ট্রের হাতে আসবে, যেমন ইতিমধ্যে ডাকঘর, বেতার ইত্যাদি এসেছে।

রাশিয়ার ওরাও অতিমানবের জন্যে অপেক্ষা করেনি। লেনিনকে যদিও শ্রদ্ধা করে তবু লেনিনকে ওরা অতিক্রম করেছে। অতিমানব আর যাই হোন, তিনি ব্যক্তিবিশেষ। ব্যক্তিবিশেষের জন্যে কমিউনিস্ট দর্শনে স্থান নেই। ব্যক্তিকে হতে হবে সমষ্টির সহিত একাত্ম। সমষ্টির চিত্তে যে-চেতনা, সমষ্টির মানসে যে-কল্পনা, সমষ্টির হৃদয়ে যে-আবেগ, সমষ্টির জীবনে যে-উদ্দেশ্য, তোমার আমার ব্যক্তিত্বের শিশিরবিন্দু তাই প্রতিফলিত করবে। তুমি আমি সমষ্টির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তুমি আমি ইউনিট নই, ইউনিট হচ্ছে সমষ্টি। কাউকে যেমন মুখ দেখেই চেনা যায়, কাউকে গলা শুনে, তেমনি সমষ্টিকে চেনা যায় তোমাকে আমাকে দেখে। আমাদের আপন আপন পরিচয় নেই, আমরা সমষ্টির পরিচায়ক।

সমষ্টির উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে প্রতিমূর্ত হয়েছে, যারা সমষ্টির অন্তঃকরণস্বরূপ, তারা সমষ্টির পক্ষ থেকে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে, নাই-বা হলো তারা মেজরিটির

প্রতিনিধি। তাদের নিজের বলতে কিছু নেই, না ধন, না মন। কমিউনিস্ট রাশিয়া, ফাসিস্ট ইটালী ও নাৎসী জার্মানী এক্ষেত্রে একমার্গী। তবে এদের প্রত্যেকে রাষ্ট্রসম্পত্তিবাদী নয়। দ্বিতীয় দুই দেশ কণ্টকের দ্বারা কণ্টকের উচ্ছেদ চায় বলে কণ্টকের অনুকরণ করেছে।

কাজেই প্লেটো যে আশা করেছিলেন দার্শনিকরা শাসক হবে, পোপরা যে মনে করেছিলেন যাজকরা হবে শাসক, বার্নার্ড শ যে প্রস্তাব করেছেন অতিমানবরা শাসন করবে এর কোনোটার ললাটে সিদ্ধি লেখা নেই।

তারপর অতিমানবের জন্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও আশঙ্কার কারণ রয়েছে। উৎকৃষ্ট ব্যাঘ্র প্রজনন করা যায় না। চিড়িয়াখানায় যে বাঘ জন্মায় সে যতই খাক যতই বাড়ুক যতই শিক্ষা পাক তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিলে সে খাস জংলী বাঘের এক আঁচড়ে মারা পড়বে। তোমার অতিমানব উকীলের সঙ্গে বুদ্ধির দ্বন্দ্বে জিতবে না, বেনের সঙ্গে দরাদরির খেলায় হার মানবে, সৈনিকের উচ্চাভিলাষের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, পলিটিসিয়ানের চালবাজিতে মাৎ হবে।

শ আক্ষেপ করেছেন, তাঁর পুরোনো কথা আজও পুরোনো হয়নি, সমাজ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আগে চলছে না, মিথ্যা বড়াই করছে প্রগতির নামে।

এ কথা সত্য যে পৃথিবীতে দারিদ্র্য রয়েছে, এবং দারিদ্র্য একটা নিবার্য ব্যাধি। এদিক থেকে দারিদ্র্যের শত্রু ও মানবের মিত্র বার্নার্ড শ-র শেষ বয়সের আক্ষেপ তাঁর প্রথম বয়সের আপত্তির মতোই সহেতুক।

(১৯৩৫)

বীরবল

'সবুজ পত্র' যেদিন বিনুর মতো অবুঝের হাতে প্রথম পড়ল সেদিন সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালক আর সব বাদ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করল 'চার ইয়ারী কথা'। তখন বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' চলছিল, কিন্তু বিনুর সেদিকে দৃষ্টি ছিল না। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ যে কে ও কত বড়ো সে জ্ঞান ছিল না তার। গুরুত্বনির্ণয়ের, মূল্যনির্ণয়ের বয়স সেটা নয়। ভালো লাগা চিরদিনই নিরঙ্কুশ, বাল্য বয়সে সব চেয়ে বেশী। 'চার ইয়ারী কথা' বিনুর ভালো লেগেছিল। ভালো লেগেছিল প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের আরো অনেক রচনা।

বীরবলেরও। বিনু তখন জানত না যে বীরবল আর কেউ নন, সেই প্রমথ চৌধুরী। সে আশ্চর্য হয়ে ভাবত, ইতিহাসে নজির থাকলেও এমন নাম কি মানুষের হয়, আধুনিক মানুষের! বুঝত না যে ওটা একজনের ছদ্মনাম। পরে জানতে পেরেছিল উনি কে, কী ও নামের তাৎপর্য।

কেন এত ভালো লাগত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখা, বীরবলের লেখা, বিনু পরে তা বিশ্লেষণ করেছিল। সে লেখায় ছিল স্বাদ। ছিল নিপুণ রাঁধুনীপনা। যত দিন বিনুর রুচি গঠিত হয়নি তত দিন সে অন্যের লেখা পড়ে তারিফ করেছে, কিন্তু একবার রুচি গঠিত হলে কেবল পাকা রাঁধুনীর রান্নাই পছন্দ হয়, অন্যেরটা যদি হয় তবে বিষয়গুণে। বিনুর রুচি গড়ে উঠল বীরবলের রচনার আস্বাদনে, চৌধুরী মহাশয়ের লেখার স্বাদ পেয়ে।

এই বহুরূপী লেখকের যে বিষয়গুণ ছিল না তা নয়। কিন্তু বিষয়গুণকে গৌণ করেছিল তাঁর পদবিন্যাস যা দিয়ে তিনি মন হরণ করেছিলেন। এই যদি শিল্প হয় তবে এক দিন আমিও শিল্প সৃষ্টি করব, মনে মনে বলত সেই বারো বছরের বালক। বলত আর মনে মনে অনুকরণ করত বীরবলের পদবিন্যাস।

কিন্তু রচনাশিল্পের চেয়েও মুগ্ধ করত রসিক চিত্ত। জীবনের ছোট বড়ো কত বিষয়ে আলাপ, কিন্তু সব আলাপই রসালাপ। যুদ্ধ হোক, প্রত্নতত্ত্ব হোক, কোনো বিষয়ই গুরু গম্ভীর নয়, ছায়াচ্ছন্ন নয়। স্বচ্ছ দৃষ্টির সন্ধানী আলো কোথাও অন্ধকার রাখছে না, বিদগ্ধ মনের সকৌতুক রসনা মজলিশী ঢঙে আসর জমিয়ে তুলছে। পাঠকরা যেন এক-একজন দরবারী ওমরাহ। দরবারে বসে কত জ্ঞানের কথাই শুনছেন, কিন্তু রসের অনুপান বিদ্যাকে করছে বিলাস।

চৌধুরী মহাশয় বিদ্যানগরের নাগরিক। বিদ্বান হয়েও চতুর। সে হিসাবে তিনি আধুনিক নন, তিনি ক্লাসিক। এ কালের লেখকরা হয় শিক্ষা দেন, নয়

মনোরঞ্জন করেন, বিষয়গুণে মনোরঞ্জন। কিন্তু এই উভয় বৃত্তির উপর বীরবলের বিরাগ। 'সাহিত্যে খেলা' নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ আছে। সেটির থেকে তুলে দিচ্ছি তাঁর মতবাদ।

"সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া— কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে, সেটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলা দেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙা লাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক,— এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। ······তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া ? অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল বন্ধ না হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য রচনা যে আত্মার লীলা এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন।"

সাহিত্য যে আত্মার লীলা এটি ক্লাসিক ধারণা। লেখা হচ্ছে খেলা আর লেখক হচ্ছেন খেলক। কিন্তু এ দুঃসাহসিক উক্তি যে দিন দিন আরো দুঃসাহসিক হয়ে উঠছে। সমাজ আমাদের চিত্তকে এমন করে আচ্ছন্ন করেছে যে যাতে সমাজের কল্যাণ হাতে হাতে না হয়, সমাজ ভাঙাগড়ার প্রসঙ্গ না থাকে, তা সাহিত্য নামে বুর্জোয়া ইনটেলেকচুয়ালদের ঘুমপাড়ানী বলে নিন্দিত। চৌধুরী মহাশয় কিন্তু দেশের ঘুম ভাঙাতেই চেয়েছিলেন। তাঁর 'সবুজ পত্রের মুখপত্র' থেকে তুলে দেখাই।

"কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্মও নয়, সে হচ্ছে কার্যক্ষেত্রের কথা। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সংকীর্ণতা এসে পড়ে সাহিত্যের স্ফূর্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়। ······যার সমাজের সঙ্গে ষোল আনা মনের মিল আছে তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এ কথা শুনে অনেকে হয়তো বলবেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব সে দেশে যে লেখা তার একটিও অভাব পূরণ করতে না পারে সে লেখা সাহিত্য নয়, শখ। ······এ কথা সত্য যে মানবজীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্ ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়।···সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয়ে নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।"

সাহিত্যের খেলা তা হলে ঘুমপাড়ানী মাসীপিসীর নয়, সেই রাতজাগানী রাজকন্যার যার উপহাসে কালিদাসকে যেতে হয়েছিল বিদ্যানগরে। বীরবল তাঁর

দেশবাসীকে করতে চেয়েছিলেন জাগরূক ও রসজ্ঞ। এ সম্বন্ধে তাঁর কথা বিশদভাবে বলছেন তাঁর 'রূপের কথা'য়।

"শিবজ্ঞান আসে সব চাইতে আগে— কেননা মোটামুটি ও জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দূরের কথা।...তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্ম জ্ঞান, এবং এ জ্ঞান আংশিক ভাবে বৈষয়িক অতএব জীবনের সহায়— এবং আংশিক ভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ। সব শেষে আসে রূপজ্ঞান, কেননা এ জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসাবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্য সমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।······আমার ধারণা, আমরা সব জন্মত কামলোকের অধিবাসী, সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।"

বীরবল তাঁর দেশবাসীকে রূপলোকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেই জন্যেই 'সবুজ পত্রে'র আবির্ভাব। রূপলোকের লক্ষণ হচ্ছে নিত্য যৌবন। প্রমথ চৌধুরী যৌবনের পূজারী। যৌবন তাঁর মতে মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি। তাই তিনি প্রাণ-উপাসক। তাঁর মন্ত্র "ওঁ প্রাণায় স্বাহা।" এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের জবানী উদ্ধৃত করছি। 'যৌবনে দাও রাজটীকা'য় আছে—

"প্রাণ প্রতি মুহূর্তে রূপান্তরিত হয়।······প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভুক্ত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি ও জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে, প্রাণের স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে বাধা দিলেই জড়তা প্রাপ্ত হয়।·· ···যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নতুন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই।····· এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এবং কী উপায়ে তা সাধিত হতে পারে তাই হচ্ছে আলোচ্য।······সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নতুন প্রাণ, নতুন মন নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নতুন সুখদুঃখ, নতুন আশা, নতুন ভালোবাসা, নতুন কর্তব্য ও নতুন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারেন।"

এতবার নতুনের উল্লেখ থাকলেও নতুনের প্রতি নয়, নিত্যের প্রতি তাঁর টান। সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে, এ কথা বলতে পারেন এক তিনি যাঁর মনের ছাঁদ ক্লাসিক। তাঁকে আধুনিকদের দলে ধরলেও আসলে তিনি চিরন্তনদের

দলে। তাঁকে নবীন বলাও যা চির নবীন বলাও তাই। এই ছাঁদের মন কোনোরূপ আতিশয্যের আমল দেয় না। সংযমের দিকে, স্বচ্ছতার দিকে এর গতি। এক জায়গায় তিনি বলেছেন,

> "ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ না করতে পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করতে পারি তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। ......সাহিত্য গড়তে কোনো বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া।"

ক্লাসিক মনোবৃত্তির প্রধান লক্ষণ প্রসাদগুণ। আয়াসের চিহ্ন কোথাও নেই। কিছু বাগ্‌বাহুল্য আছে, সেটা তাঁর বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে না। বরং অতিরিক্ত স্পষ্ট করে। তা যদি দোষের হয় তবে বীরবলের একমাত্র দোষ হাতে কিছু না রেখে হাত খালি করে ছড়ানো, অর্থাৎ তিনি যা বলেন তার বেশী ব্যঞ্জিত করেন না, বলার আনন্দে বল নিঃশেষ করেন। কিন্তু এই বাহুল্যও প্রসাদগুণান্বিত। তাঁর রচনার প্রসাদগুণ তাঁর মনেরই প্রতিফলন আর তাঁর মনের পশ্চাতে রয়েছে বহু দিনের মনন ও রোমন্থন। চৌধুরী মহাশয় তাঁর মনটিকে তৈরি করেছেন সক্লেশে, তাই তাঁর বাগ্‌বিস্তার এত অক্লেশ। এবং তাঁর ভাষিতগুলির মধ্যে এতগুলি সুভাষিত। যে মনের এত পরিচ্ছন্নতা তার গঠনের ইতিহাস আমাদের সম্মুখে অনাবৃত নয়, কেননা বীরবল তাঁর প্রথম বয়সের রচনা অল্প প্রকাশ করেছেন। হয়তো অল্পই লিখেছেন, অধিক বকেছেন। আমার অনুমান তিনি তাঁর মনের অনুশীলন করেছেন কথোপকথনে। সে সব কথোপকথনের প্রতিলিপি নেই, থাকলে দেখা যেত কী করে তাঁর মন তার বোঝা নামাতে নামাতে লঘুভার হলো, তাঁর রসনা ক্রমে শাণিত হতে হতে অসিধার হলো, তাঁর কল্পনার থেকে কামনার খাদ গিয়ে বাকী রইল রূপের স্বর্ণাভা। কী করে তিনি যৌবনের অন্তে দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করলেন, একটুখানি আভাস আছে 'কৈফিয়ৎ' নামক একটি কবিতায়।

রসনার প্রসাধন যে বীরবলের সাহিত্য সাধনার অন্তরালে, আমার এই অনুমান যদি সত্য হয় তবে এক ঢিলে দুই পাখি মরে। প্রথমত তিনি যে কথ্যভাষার ভগীরথ এতে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। কথক হতে হতে যারা লেখক হয় তারা লেখার কৃত্রিমতা মানতে নারাজ, তাই লেখ্য ভাষাকে মঞ্চচ্যুত করে। কথ্য ভাষার বিপক্ষ দল যদি তর্ক না করে গল্প করতে জানতেন, সোরগোল না করে আলাপ করতে জানতেন তা হলে একা বীরবল ও তাঁর জনকয়েক শিষ্য মিলে এত কম সময়ে কথ্যভাষাকে আমাদের আসরের ভাষায় পরিণত করতে পারতেন না। লেখ্য ভাষা অবশ্য সরকারী ভাষা, সেটুকু সান্ত্বনা তার থাক।

দ্বিতীয়ত তিনি ছোট গল্পের মুক্তিদাতা। তাঁর হাতে প্রবন্ধ ও ছোট গল্প, বিবরণ বা সমাচারও তাই। জীবনের যে কোনো ঘটনা বা ঘটলে-ঘটতে-পারত এমন যে কোনো অঘটনা তাঁর কাহিনীর কথ্যবস্তু। প্লটের জন্যে তাঁর আটকায় না, প্লট না জুটলেও গল্পের উপাদান জোটে। মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হলেই মুখে মুখে গল্প পল্লবিত হয়, সত্য মিথ্যা খেয়াল কল্পনা একাকার হয়ে যায়। গল্প তো আমাদের চারদিকে হাওয়ার মতো ঘুরছে, তাকে বন্দী করার ফন্দী জানলে একাধিক সহস্র রজনী ভোর হয়। বীরবলের গল্পগুলি শ্রুতিসুখকর, তাদের আবেদন শ্রুতির কাছে। সে হিসাবে সেগুলি খাঁটি গল্প, যাকে ইংরেজীতে বলে yarn. তিনি সুতো কাটতে ওস্তাদ। যেমন মিহি তাঁর সুতো, তেমনি মোলায়েম। যেন মসলিনের সুতো।

'চার ইয়ারী'র উল্লেখ করে শুরু করেছি, সমাপনও করি। 'চার ইয়ারী' থাকবে। শুধু রচনার স্বাদের জন্যে নয়, সৃষ্টির আর্টের জন্যে নয়, চিত্তের রসের জন্যে নয়, যদিও এর প্রত্যেকটি আপনাতে আপনি মূল্যবান। মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে অনুভব করা যায় একটি বিদগ্ধ জীবন রয়েছে ওর পশ্চাতে। ওর অনেকখানি হয়তো কাল্পনিক বা পড়ে পাওয়া। কিন্তু ওর যেটুকু শাঁস সেটুকু একটি রক্তিম হৃদয়ের পদ্মরাগ মণি, যেমন উজ্জ্বল তেমনি করুণ। ইচ্ছা করলেই আর-একখানা 'চার-ইয়ারী' লেখা যায় না, কেননা ইচ্ছা করলেই আর একবার তরুণ হওয়া যায় না, আর একবার তরুণের চোখে তরুণীকে দেখা যায় না, আর একবার fool হওয়া যায় না। দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে প্রথম যৌবনের swan song গাওয়া হয়েছে ওতে।

(১৯৪৯)

রম্যা রলাঁ

রম্যা রলাঁ দেশকে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন, এইখানে তাঁর জিত। কালকে অতিক্রম করতে পারেননি, এইখানে তাঁর হার।

এ হার তাঁর একার নয়, একজন কি দুজন বাদে আর সকলের। অথচ এ জিত্ তাঁর মতো একজন কি দুজনের। আমরা আজ বিজেতাকে অভিনন্দন জানাব, কিন্তু বিজিতকেও সমবেদনা জানাতে ভুলব না। আত্মার সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এমন নিগূঢ় যে হয়তো আমাদের আনন্দ-বেদনা মৃত্যুর পরপারে তাঁর কাছে পৌঁছবে।

আঠারো-উনিশ বছর বয়সে তাঁর 'জন ক্রিস্টোফার' আমার হৃদয় হরণ করেছিল। 'পীপ্‌ল্‌স্ থিয়েটার' আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। ইচ্ছা করত, জন ক্রিস্টো-ফারের মতো বাঁচতে, জনসাধারণের জন্যে সৃষ্টি করতে। জানতুম যে, জনসাধারণ আমাকে বুঝবে না, ক্রিস্টোফারকেও বুঝল না, সেইজন্যে আগে থাকতে শোক করতুম। শোক করতুম আর সুখী হতুম এই ভেবে যে, আমি সেই স্বল্পসংখ্যক দুঃখীজনের একজন যাদের কেউ বুঝবে না, অথচ যারা সকলের জন্যে সর্বস্ব দিয়ে গেছে। যখন বুঝবে তখন আর খুঁজে পাবে না, তার আগে আমরা জ্বলেপুড়ে নিঃশেষ।

এই যে 'elite' বা স্বল্পসংখ্যকের মোহ এ মোহ আমার অনেক দিন পর্যন্ত ছিল, এখনো পুরোপুরি যায়নি। কিন্তু রলাঁ তাঁর এ মোহ শেষ বয়সে কাটিয়ে উঠেছিলেন। যদি কেউ কোনো দিন তাঁর জীবনচরিত হৃদয় দিয়ে লেখেন তা হলে দেখাবেন, এইটুকুর জন্যে তাঁকে কী অমানুষিক দুঃখ পেতে হয়েছিল। নিজেকে বহুসংখ্যকের একজন ভাবা শুনতে যত সহজ আসলে তত নয়। যাঁদের এক ছটাক প্রতিভা আছে তাঁরাও এক-একটি কেষ্ট-বিষ্টু। রলাঁর মতো দুর্লভ প্রতিভার অধিকারীর পক্ষে নোবেল প্রাইজের সিংহাসন থেকে নেমে চাষী মজুরের সঙ্গে কাঁধ মেলানো ইতিহাসে অপূর্ব। সতেরো বছরের অবিরাম অন্তর্দ্বন্দ্বের পরে তিনি তাঁর জীবনের মূল সমস্যার মীমাংসায় পৌঁছেছিলেন।

তাঁর জীবনের মূল সমস্যা বলেছি। বলা উচিত ছিল, তাঁর সাহিত্যিক বা শিল্পী-জীবনের। এ ছাড়া তাঁর আরো একটা জীবন ছিল, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবন। তিনি ছিলেন মূর্তিমান বিবেক। টলস্টয়ের পরে ইউরোপের বিবেক ছিলেন তিনি এবং বার্নার্ড্ শ। বিবেকের সঙ্গে আপোস দুজনের মধ্যে একজনও করেননি। কিন্তু, শ'র বিবেকের চেয়ে রলাঁর বিবেক নির্ভরযোগ্য। গত মহাযুদ্ধে এর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যায়।

তার পর থেকে ইউরোপের বিবেকীদের দৃষ্টি শ'র প্রতি তেমন নয়, রলাঁর প্রতি যেমন। কিন্তু এবারকার এই মহত্তর যুদ্ধে দেখা গেল, রলাঁর বিবেকও অনির্ভরযোগ্য। বেঁচে থাকলে তিনি আর বিবেকীদের দৃষ্টিপথে পড়তেন না। সে দৃষ্টি পড়ছে অল্‌ডাস হাক্‌স্‌লি প্রভৃতির উপর। যদিও এঁরা কেউ রলাঁর মতো, শ'র মতো, বিরাট পুরুষ নন। এইখানেই তাঁর ট্র্যাজেডী।

কিন্তু এর উপর তাঁর হাত ছিল না। এ ট্র্যাজেডী অনিবার্য। তাঁর জীবন আলোচনা করে আমি বুঝতে পেরেছি, তিনি কেন সেবারকার যুদ্ধে যোগ দেননি, কেন এবারকার যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়েছেন। কারণটা রাজনৈতিক বললে কিছুই বলা হয় না, কারণটা তাঁর স্বভাবের মধ্যে নিহিত। ওটা তাঁর নিয়তির নির্দেশ। বিবেক হেরে গেছে নিয়তির হাতে। তাঁর দোষ নেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসীদের দেশে যে বিপ্লব ঘটে তার স্মৃতি ফরাসীমাত্রেরই মনোজীবনের অঙ্গ। এমন দিন নেই যেদিন তাদের মনে পড়ে না বিপ্লবী জনতার সুকৃতি বা দুষ্কৃতি, বিপ্লবী নেতাদের উদয় বা অস্ত। তার পরেও আরো কয়েক বার বিপ্লব ঘটে গেছে সে দেশে। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের আঠারো বছর পরে রলাঁর জন্ম। তাঁর যখন পাঁচ বছর বয়স তখন আরো এক বার বিপ্লব বাধে, কিন্তু ইতিহাসে তাকে বিপ্লব বলে গণ্য করা হয় না। বলা হয়, কমুনার্দ্‌ বিদ্রোহ। রলাঁর মনোজগতে এইসব বিপ্লব বা বিদ্রোহের জের চলছিল জন্মকাল থেকে।

কিন্তু যাদের মাঝখানে তিনি মানুষ তারা মধ্যবিত্ত বা বুদ্ধিজীবী, তাদের স্বার্থ প্রথমবারের বিপ্লবেই সাধিত হয়েছে, দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা রাখেনি। দ্বিতীয় বারের বিপ্লবে তাদের যেটুকু সহানুভূতি ছিল তৃতীয় বারের বেলা সেটুকুও রইল না। কমুনার্দ্‌ বিদ্রোহে তো তাদের সহানুভূতির বদলে অবজ্ঞার ভাব ছিল। মধ্যবিত্তরা বিপ্লবের নেতৃত্ব করা দূরে থাক, বিপ্লবকে হাড়ে হাড়ে ভয় করত। আবার বিপ্লব বাধবে, এতে তাদের অন্তরের সায় ছিল না। তবে তারা ভালো করেই বুঝত যে, জনসাধারণকে যদি তাতিয়ে কিংবা মাতিয়ে রাখা না যায় ওরা বিপ্লবের কথা ভাববে। সেইজন্যে জার্মানীর সঙ্গে আবার কবে যুদ্ধ বাধবে, এবার ফ্রান্স জিতবে, এই ছিল তাদের নিত্যকার জল্পনা। আর ছিল আমোদপ্রমোদের ফলাও ব্যবস্থা। অন্তহীন মত্ততা। এবং তপ্ততা।

রলাঁ মানুষ হন এই আবহাওয়ায়। তিনিও মধ্যবিত্ত তথা বুদ্ধিজীবী। স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে যুদ্ধবিগ্রহ ও ইন্দ্রিয়সুখ এই তো জীবনের লক্ষ্য। এর জন্যে যত পারো টাকা কামাও, যেমন করে পারো— ছলে বলে কৌশলে। তখনকার দিনের নৈতিক আদর্শ এর উপরে উঠত না। কিন্তু অতি অল্প বয়স থেকে রলাঁর তাতে বিরাগ আসে। দ্বিতীয়ত, তিনি যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকে টলস্টয়ের শিষ্য। যাকে বলে জীবনের সাফল্য তার চরমে উপনীত হয়েও টলস্টয়ের তৃপ্তি হলো না, তিনি একে একে সব ত্যাগ করলেন— যা কিছু অর্থকরী, যা কিছু অনর্থকরী ? কী করে মানুষকে ভালোবাসবেন, মানুষের সেবা করবেন— সব মানুষের,

দীনহীন মানুষের, এই চিন্তায় টলস্টয় বিভোর। এমন সময় রলাঁর চিঠি, অজানা অচেনা তরুণের চিঠি, তাঁর হাতে পৌঁছয়। নগণ্য একটি তরুণকে "প্রিয় ভ্রাতা" বলে সম্বোধন করে তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন সে উত্তর দু কথায় দায়সারা গোছের নয়। এই তরুণটি যেন তাঁর উত্তরাধিকারী, উত্তরাধিকারীকে সমস্ত জানাতে ও বোঝাতে হয়, তাই তিনি তাঁকে প্রকাণ্ড একখানি পত্র লিখেছিলেন। এইভাবে রলাঁর মন্ত্রদীক্ষা হলো।

স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি ইটালী যান, সেখানে দুবছর কাটান। এক হিসাবে তাঁর শিক্ষানবিশী শেষ হয়েছিল স্বদেশেই। শিক্ষানবিশীর পরে এক বছর দেশভ্রমণের রীতি ইউরোপের সনাতন প্রথা। রলাঁর ভ্রমণকাল কাটল ইটালীর রোম প্রভৃতি অঞ্চলে। সেখানে তাঁর আলাপ হলো এক বর্ষীয়সী জার্মান মহিলার সঙ্গে, নাম মালভিডা ফন মাইজেন্‌বুগ। ইনি গ্যেটের সময়কার মানুষ। ভাগ্‌নার, নীট্‌শে, মাৎসিনি. গারিবল্‌ডি, ইব্‌সেন প্রভৃতির অন্তরঙ্গ বন্ধু। রলাঁকে দেখে ইনি চিনতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তরবাসীকে। দুজনেই আদর্শবাদী, যে আদর্শ নরজগতে মহত্তম সেই আদর্শ দুজনের। মালভিডা তাঁকে আত্মপ্রত্যয় দিলেন, অস্তগামী তারা যেমন সূর্যকে দেয়। রলাঁ যখন রোম থেকে ফিরলেন তখন তিনি আদর্শনিষ্ঠ হতে কৃতসংকল্প। তখন আর তাঁকে মধ্যবিত্ত বলে ভুল করা যায় না। যাঁদের সে ভুল ছিল তাঁদের ভুল ভাঙতে দেরি হলো না। একজন তাঁকে বিয়ে করলেন ও বিয়ের অল্পকাল পরে আলাদা হলেন।

উপরে যাকে স্কুল বলা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে কলেজ। রলাঁ হলেন সেখানকার অধ্যাপক। পরে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের, প্যারিস বিশ্ববিদালয়ের, অধ্যাপক হন। পরবর্তী বয়সে তিনি পদত্যাগ করেন। লেখা থেকে যা পেতেন তাতেই তাঁর চলত। সারা জীবন সামান্য খরচে চালিয়েছেন।

ইটালী থেকে ফেরার পরে তিনি যখন সাহিত্যে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর প্রিয় বিষয় হলো বিপ্লব ও প্রিয় বিভাগ হলো নাটক। জনগণের নাট্যশালা বলে তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল। সাধারণ রঙ্গালয় তো আমোদপ্রমোদের দোকান। তার জন্যে নাটক লেখা মানে দোকানদারি। যাতে দু'পয়সা হবে না তেমন কোনো নাটক কেউ অভিনয় করবে না। আর অভিনয় করলেও কেউ পয়সা দিয়ে দেখবে না। অথচ নাটকের মতো সার্বজনীন অভিজ্ঞতাকে আমোদপ্রমোদের আধার করে তাই দিয়ে বণিকবৃত্তি সম্পাদন যে ঘোর অসভ্যতা ও অনীতি। গ্রীকদের নাট্যশালা গির্জার মতো মন্দিরের মতো ধনগন্ধহীন ছিল। ফরাসীদের নাট্যশালাও তাই হবে। তার জন্য তিনি লিখতে লাগলেন বিপ্লবের কাহিনী। বিপ্লবের ও ন্যায়নিষ্ঠতার। কিন্তু লিখলে কী হবে। বিপ্লবের প্রতি মধ্যবিত্তদের মনোভাব প্রসন্ন নয়, তাদের হাতেই কলকাটি। তাতে জল মেশাতে রলাঁ রাজি নন। সব চেয়ে দুঃখের কথা, জনগণ উদাসীন। হাড়ভাঙা খাটুনির পরে তারা চায় একটু রঙ্গ, একটু বিস্মৃতি। রলাঁ তা দিতে অক্ষম।

এর পরে তিনি নাটক লেখায় ক্ষান্তি দিয়ে জীবনচরিত ও উপন্যাস রচনায় মন

দিলেন। এসব জনগণের জন্যে নয়। এগুলিতে বিপ্লবের কথা ছিল না, তবে বিদ্রোহের কথা ছিল। তাঁর মনের তার বিপ্লবের না হোক বিদ্রোহের সুরে বাঁধা প্রথম থেকেই। কিন্তু যুদ্ধের উপর তাঁর আন্তরিক বিরাগ। যুদ্ধ বলতে ফরাসীর কাছে বোঝায় জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধ। জার্মান মানে মাল্‌ভিডা ফন মাইজেন্‌বুগ, জার্মান মানে বেঠোফেন। সংগীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আশৈশব। তিনি বোধ হয় মনে মনে চেয়েছিলেন সংগীতশিল্পী হতে, ঘটনাচক্রে হয়ে দাঁড়ালেন সংগীতসমালোচক ও সাহিত্যিক। সংগীত ভালোবাসতেন বলে সংগীতনায়কদেরও ভালোবাসতেন। তাঁদের মধ্যে বেঠোফেনকেই ভালোবাসতেন সকলের চেয়ে বেশী। বেঠোফেন ছিলেন তাঁরই মতো বিপ্লবী বা বিদ্রোহী। সেই বেঠোফেনের স্বজাতির বিরুদ্ধে অসিধারণ? রলাঁর জন ক্রিস্টোফারও জার্মান। জন ক্রিস্টোফার-এর স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ? কখনো নয়। যুদ্ধ যদি আর কারো বিরুদ্ধে হতো তা হলে হয়তো কথা ছিল। কিন্তু আর কারো বিরুদ্ধে হলেও তিনি যুদ্ধবিরোধী হতেন। কারণ, তাঁর হৃদয়টা আন্তর্জাতিক। তিনি জাতিভেদে বিশ্বাস করতেন না। সেইজন্যে তাঁর পক্ষে কঠিন হতো যে-কোনো জাতির বিরুদ্ধে খড়্গধারণ।

অথচ তিনি যে ঠিক অহিংসাবাদী ছিলেন তা নয়। তা যদি হতেন বিপ্লবের কথা ভাবতেন না। বিপ্লব কি কোনো দিন বিনা রক্তপাতে হয়েছে? না। তিনি তা জানতেন। সেইজন্যে তাঁকে অহিংসক বলে ধরে নেওয়া যায় না। কিন্তু টলস্টয়ের প্রভাবে তিনি অহিংসার প্রয়োজন মানতেন। বিপ্লব বা বিদ্রোহ ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যদি অহিংসভাবে সিদ্ধ হয় তো অহিংসাই শ্রেয়, যদি না হয় তো হিংসার আশ্রয় নিতে হবে। উপায়কে উদ্দেশ্যের উপরে স্থান দিলে চলবে না। এটা যে কেবল তাঁর শেষ বয়সের যুক্তি তা নয়, এ যুক্তি বরাবরই তাঁর মনের তলে প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু একবার যদি এ যুক্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় তো যুদ্ধবিগ্রহেরও সমর্থন করা হয়। যুদ্ধবিগ্রহকে সমর্থন করলে জার্মানীর বিরুদ্ধে ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধে। বেঠোফেনের বিরুদ্ধে, মাইকেল এঞ্জেলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ? ক্রিস্টোফার-এর বিরুদ্ধে, গ্রাৎসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? অসম্ভব।

গত মহাযুদ্ধের মধ্যভাগে রাশিয়ায় যখন বিপ্লব ঘটে তখন রলাঁ পড়লেন দোটানায়। বিপ্লবী তিনি, তাঁর তো আনন্দে উদ্‌বাহু হওয়া উচিত। লেনিন নাকি তাঁকে সহযাত্রী হতে সেধেছিলেন সুইটজারল্যাণ্ড থেকে রুশ দেশে। তিনি গেলেন না। বিপ্লব হলেই প্রতিবিপ্লব হবে, উভয় পক্ষে হাতাহাতি বেধে যাবে, তার মানে গৃহযুদ্ধ। তাই হলো রাশিয়ায়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে যিনি সুইটজারল্যাণ্ড থেকে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন তিনি কেমন করে গৃহযুদ্ধের পোষকতা করতেন? অসংগতির অপবাদ রটত। তবে এ কথাও ঠিক যে, তিনি রক্তপাতে কাতর ছিলেন। ইতিহাসের বৃহত্তম যুদ্ধ-জনিত যে ভয়াবহ রক্তপাত ও তদ্‌জনিত শোকতাপ ইউরোপের বক্ষ ব্যাকুল করেছিল রলাঁর বুকে বাজছিল সেই ব্যাকুল ব্যথা। এর উপর আবার বিপ্লব! তিনি প্রস্তুত ছিলেন না তার জন্যে।

মহাযুদ্ধের পরেও বহুকাল যাবৎ প্রস্তুত ছিলেন না। বিপ্লব যে মন্দ, এ যুক্তি তাঁর নয়। তাঁর যুক্তি, বিপ্লবের পদ্ধতি মন্দ। উদ্দেশ্য মন্দ নয়, উপায় মন্দ। বারবুস্‌কে লিখেছিলেন,

"I wrote in *Clérambault* (and I am more than ever of that opinion): It is not true that the end justifies the means. The means are ever more important for true progress than the end...... For the end (so rarely reached and always incompletely) but modifies the external relations between men. The means, however, shape the mind of men according either to the rhythm of justice or to the rhythm of violence."

কিন্তু উপায়ের উপর এতটা জোর দিলে প্রকারান্তরে বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করা হয়, কারণ ইতিহাসে এমন বিপ্লব কোথায় যাতে উপায়ের শুদ্ধিরক্ষা হয়েছে? এই স্বতোবিরোধ রলাঁকে নিষ্ফল করত যদি না তিনি আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করতেন গান্ধীকে। গান্ধীও বিদ্রোহী জননায়ক, অথচ তাঁর উপায় অশুদ্ধ নয়। রলাঁর মন যা চায় তিনি তাই, তিনিই সেই বিপ্লবী যাঁর যুক্তি বিপ্লবের মূলোচ্ছেদ করে না। গান্ধীকে রলাঁ ইউরোপের বিপ্লবী মহলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিন্তু ইউরোপের বিপ্লবীদের সম্মুখে তখন জরুরি প্রশ্ন সোভিয়েট রাশিয়া যদি বিপন্ন হয় তা হলে কি উপায়ের কথা ভেবে সময় নষ্ট করা উচিত? রলাঁর গান্ধীচরিত এ প্রশ্নের উত্তর নয়। রলাঁ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত উপায়ের অশুদ্ধতা মেনে নিয়েছিলেন।

ভালো হোক মন্দ হোক এত কাল পরে একটা বিপ্লব ঘটেছে, তার ফলে জনসাধারণের অধিকার ও ক্ষমতা বেড়ে গেছে, এটা তো স্পষ্ট। কথা হচ্ছে, তার দুর্দিনে তাকে বাঁচাতে হলে হিংসার আশ্রয় নেওয়া চলবে কি না? রলাঁ বললেন, চলবে। যদি সোভিয়েটকে নিয়ে যুদ্ধ বাধে তা হলে যুদ্ধে যোগদান চলবে কি না? রলাঁ বললেন, চলবে। এমনি করে তিনি যুদ্ধবিরোধী থেকে যুদ্ধসমর্থক হয়ে উঠলেন। কিন্তু এর জন্যে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের সীমা ছিল না। জার্মানীর সঙ্গে ইটালীর সঙ্গে যুঝতে হলো ফ্রান্সকে। বেঠোফেনের সঙ্গে মাইকেল এঞ্জেলোর সঙ্গে তাঁকে। কী প্রগাঢ় বেদনা! এ যেন নিজের হাতে নিজের পাঁজর ভাঙা।

খানিকটা আত্মপ্রতারণাও ছিল। রলাঁ মনে করেছিলেন, সময়মতো হস্তক্ষেপ করলে যুদ্ধ বাধবেই না। 'য়্যাক্‌শন্' 'য়্যাক্‌শন' বলে তিনি যখন হাঁক ছাড়তেন তখন এই কথাটাই বোঝাতে চাইতেন যে, সময় থাকতে চেষ্টা করলে যুদ্ধ বন্ধ হবে। আমাদের অনেকেরই সেই ধারণা ছিল। হিটলারকে উঠতে না দিলে কি এত বড়ো যুদ্ধ বাধত? মুসোলিনিকে বাড়তে না দিলে কি হিটলারকে হারানো এত শক্ত হতো? রলাঁর যুক্তি এক হিসাবে যুদ্ধবিরোধীরই যুক্তি। কিন্তু আমরা যেমন ছেলে-

মানুষ ছিলুম তিনিও তেমনি শিশু ভোলানাথ। জানতেন না যে, সরষের ভিতর ভূত থাকে।

লাভের মধ্যে হলো এই যে, রলাঁর নৈতিক উচ্চতা টলস্টয়ের ধারেকাছেও রইল না। গান্ধীর কাছে তো নয়ই। নিয়তি।

তবে রলাঁ ছিলেন স্বভাবশিল্পী, সুযোগ পেলেই পিআনো নিয়ে বসতেন, বেঠোফেন বাজাতেন। নাটক বা উপন্যাস লিখতেন। লিখতেন সংগীতবিষয়ক প্রবন্ধ। মহাপুরুষদের জীবনদ্বন্দ্ব। জীবনছন্দ। তাঁর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দচরিত একপ্রকার শিল্পকাজ। ও বই লিখে তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার বা বিপ্লবী ইউরোপের জিজ্ঞাসা দূর করেননি। ভারতের আত্মার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন ইউরোপের আত্মার। সাধনার সঙ্গে সাধনার। আবিষ্কার করে আনন্দিত হয়েছেন যে, বাইরে আমাদের দূরত্ব যত হোক অন্তরে আমরা নিকট। এই আবিষ্কার তাঁকে শান্তি দিয়েছে শেষ বয়সের চরম অশান্তির মাঝে। বল দিয়েছেও।

সাহিত্য হিসাবে তাঁর জীবনবৃত্তগুলির মূল্য কত জানিনে। তাঁর নাটক বেশী পড়িনি, মূল্য আমার অজানা। দুখানি উপন্যাস পড়েছি— 'জন ক্রিস্টোফার' ও 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা'। দ্বিতীয়টি শেষ করিনি। যতদূর পড়েছি তার উপর নির্ভর করে বলতে পারি প্রথমটির সমান হয়নি, কিন্তু তার চেয়েও গভীর হয়েছে। রসঘন হয়েছে। হয়েছে মর্মন্তুদ।

উভয় গ্রন্থেই গ্রন্থকারের মনে একই জিজ্ঞাসা। কেমন করে বাঁচব? একই উত্তর, মিথ্যার সঙ্গে আপোস করব না, সত্য করে বাঁচব। এর দরুন যদি দুঃখ পেতে হয়, দুঃখ পাব, এড়াব না। জীবনে বহু দুঃখ আছে, তা জেনেও জীবনকে ভালোবাসব। সেই তো বীরত্ব। মর্ত্যলোকে একমাত্র বীরত্ব।

ক্রিস্টোফার ও আনেৎ, দুই উপন্যাসের নায়ক নায়িকা, উভয়েই অসুখী। তাদের সুখী করার জন্যে তাদের স্রষ্টার বিন্দুমাত্র প্রয়াস নেই। কিন্তু যাতে তারা খাঁটি থাকে পোড়খাওয়া সোনার মতো খাঁটি, সৃষ্টিকর্তার সমস্তক্ষণ লক্ষ্য। সাংসারিক অর্থে তারা সাধু বা সাধ্বী নয়, কিন্তু উচ্চতর অর্থে তারা শুদ্ধ, তারা নির্মল। পিউরিটি বলতে কী বোঝানো উচিত তার একজোড়া নতুন উদাহরণ দিয়ে গেলেন রলাঁ। হয়তো শুধু এইজন্যেই তাঁকে এ দুটি মহাভারত রামায়ণ লিখতে হয়েছিল এত কাল ধরে।

মহাভারত-রামায়ণের সঙ্গে এ দুটি এপিক উপন্যাসের তুলনা করছি আর এক কারণে। উভয়েরই অন্তরালে রয়েছে দুই প্রলয়ংকর যুদ্ধ। ভাবী যুদ্ধের ছায়া পড়েছে 'জন ক্রিস্টোফার'এর উপরে। 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা'র উপর ভূত ভবিষ্যৎ উভয় যুদ্ধের ছায়া। সুতরাং পরোক্ষ ভাবে এ দুখানি যুদ্ধকাব্য। উচ্চাঙ্গের কি না, স্মরণীয় কি না, সে বিচার মহাকাল করবে।

আমাদের কারো কারো জীবনে রলাঁর এ দুটি পুঁথি স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছে। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপে 'জন ক্রিস্টোফার' অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওর সমকক্ষ অনেক। ওর চেয়েও মাথায় উঁচু টলস্টয়-ডস্টোয়েভ্স্কির একাধিক

উপন্যাস। রলাঁর স্থান সাহিত্যের সভায় তাঁদেরই পাশে। তবে 'জন ক্রিস্টোফার' বা 'মন্ত্রমুগ্ধ আত্মা' প্রধানত জীবনজিজ্ঞাসুদের জন্যে। 'সমর ও শান্তি' বা 'কারামাজভ' জীবনজিজ্ঞাসু তথা সর্বসাধারণের জন্যে।

'জন ক্রিস্টোফার' বিশেষ করে সংগীতপ্রেমিকদের জন্যে। এর পাতায় পাতায় সংগীত-প্রসঙ্গ। বোধ হয় বেঠোফেনের জীবনী লিখে রলাঁর সংগীত সম্বন্ধে বলবার কথা ফুরোয়নি, তার সঙ্গে মিলেছে সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তব্য। ক্রিস্টোফারের সঙ্গে অলিভিয়েরের। জার্মানের সঙ্গে ফরাসীর। ক্রিস্টোফারকে জার্মান না করলে কি চলত না ? না, চলত না। উঁচুদরের সংগীতকার যাঁরা তাঁদের শিক্ষা এক পুরুষের নয়, তিন-চার পুরুষের। বাখ্ ও বেঠোফেন প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সংগীতশিল্পী। জার্মানীতে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত, ফ্রান্সে বিরল। তার পর, সংগীতশিক্ষা তো কেবল পরিবারে হয় না, হয় রাজ-রাজড়ার দরবারে। জার্মানীতে শত শত দরবার ছিল এক শ বছর আগেও। ফ্রান্সে বড়ো জোর ছিল একটি। তার পর জার্মানী এমন দেশ যে তার ছোট বড়ো সব শহরেই থিয়েটার অপেরা কন্‌সার্ট ও সেই জাতীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান অগুনতি। পাড়ায় পাড়ায় জলসা, ঘরে ঘরে গানবাজনা। কাজেই ক্রিস্টোফারকে জার্মান করতেই হলো। কিন্তু জার্মানীতে তখন সামরিকতার বাড়াবাড়ি, ক্ষুদে কর্তাদের সঙ্গে মুখ সামলে কথা কইতে হয়, কথায় কথায় বিধিনিষেধ। স্বাধীনচেতা ক্রিস্টোফারকে তাই বিপদে পড়ে ফেরার হতে হলো প্যারিসে। সেখানে তার ধীরে ধীরে পসার জমল, নামডাক হলো। প্যারিস যদিও ফ্রান্সের রাজধানী তবু আন্তর্জাতিকতার পীঠস্থানও বটে। গুণী লোক দেখলে ফরাসীরা খাতির করে। ক্রিস্টোফার তাদের একজন হয়ে উঠল, ফ্রান্সকে ভালোবাসল অলিভিয়েরকে বন্ধু পেয়ে। এদের দুজনের বন্ধুতা প্রেমের চেয়েও নিখাদ। দেশের ব্যবধান অলীক, ভাষার ব্যবধান অলীক।

অলিভিয়ের আদর্শবাদী সাহিত্যিক। ক্রিস্টোফার আদর্শবাদী সংগীতকার। এমনি আরো কয়েকজন আদর্শবাদীকে বাস্তববাদীকে আমরা পাচ্ছি, তাদের কেউ নারী কেউ পুরুষ। তাদের এক-এক জনের এক-এক ধারা, এক-এক দিকে গতি। একজনের নাম ফ্রাঁসোয়াজ উদোঁ। অভিনেত্রী। এঁর সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলেছেন,

"But especially he was indebted to her for a better understanding of the theatre ; she helped him to pierce through to the spirit of that admirable art, the most perfect of all arts, the fullest and most sober. She revealed to him the beauty of that magic instrument of the human dreams,—and made him see that he must write for it and not for himself, as he had a tendency to do... Francoise's ideas were in accordance with Christopher's who, at that stage in his career, was inclined towards a collective art,

in communion with other men. Francoise's experience helped him to grasp the mysterious collaboration which is set up between the audience and the actor.... It was this common soul which it was the business of the great artist to express."

এর পরে আধুনিক ইউরোপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

"Modern Europe had no common book : no poem, no prayer, no act of faith which was the property of all. Oh ! the shame that should overwhelm all the writers, artists, thinkers, of to-day ! Not one of them has written, not one of them has thought, for all. Only Bethoven has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood : but only musicians can read it, and the majority of men will never hear it."

রলাঁর সাধ ছিল সংগীতকার হতে। বিধাতা বাদী। পূর্বপুরুষেরা সংগীতশিল্পী নন। নাট্যকার হতে স্পৃহা ছিল। তাঁর স্পৃহা থাকলে কী হবে, লোকের আগ্রহ ছিল না। বার বার তিন বার। এবার ঔপন্যাসিক। এবার সিদ্ধার্থ।

কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা যায় বেঠোফেন সম্বন্ধে যা তিনি বলে গেছেন। একটু ঘুরিয়ে বললে যা দাঁড়ায় তা এই :

"Rolland has left a few pages of a new Gospel of consolation and brotherhood : but only seekers after Life can read it, and the majority of men will never hear it."

(১৯৪৪)

কবিগুরু গ্যেটে

ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে নব ভাবের নব উদ্যমের নব নব প্রত্যাশার সাড়া পড়ে যায়। সে যুগের সাহিত্যকে সাধারণত রোমাণ্টিক বলে বিশেষিত করা হয়। কিন্তু ভোর হবার আগে যেমন পাখি ডাকে তেমনি ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কাল হতেই কোনো কোনো দেশে রোমাণ্টিক সাহিত্যিকদের কলকূজন শুরু হয়ে যায়। জার্মানীতে এঁদের পরিচয় ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যিক বলে।

প্রথম যৌবনে 'তরুণ ভের্টরের দুঃখ' লিখে গ্যেটে যখন দেশ বিদেশে রাতারাতি বিখ্যাত হন তখন জার্মানীর ঝড়ঝাপটা যুগের বাণীমূর্তি বলেই তাঁর নাম করত সকলে। ইতিমধ্যে ও অতঃপর তিনি যেসব নাটক লেখেন তাতে তাঁর এ নাম পাকা হয়। কিন্তু সাফল্যের শিখরে উঠতে না উঠতেই তিনি স্বেচ্ছায় ও পথ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর। তাঁর কাছে তাঁর পক্ষপাতী পাঠক ও সমধর্মা লেখকদের আশার অন্ত ছিল না। আশায় নিরাশ হয়ে তাঁরা তাঁকে ভুল বুঝলেন ও দোষ দিলেন।

ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যিকদের যিনি নেতা তিনি কি তবে তাঁর যুগের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন? আপাতদৃষ্টিতে এ রকম মনে হওয়া বিচিত্র না। কারণ তিনি গেলেন ভাইমার নামক একটি সামন্ত রাজ্যের মন্ত্রী হয়ে। সেখানকার অভিজাত মহলে তাঁর অবারিত দ্বার। তাঁদের সঙ্গেই তাঁর লীলাখেলা দহরম মহরম। লেখা তাঁর হাত দিয়ে বেরোয় না বড়ো-একটা। বেরোয় যদি তো আগের মতো নয়। ক্বচিৎ এক-আধটা নিখুঁত কবিতা ঝরে পড়ে। ছাব্বিশ থেকে আটত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত এই তাঁর দশা।

বাইরে থেকে যা মনে হয় আসলে কিন্তু তা নয়। ঝড়ঝাপটা যুগের সাহিত্যও তো রোমাণ্টিক সাহিত্য। রোমাণ্টিক সাহিত্য বলতে যাই বোঝাক না কেন ওর ভিতরে এমন কিছু ছিল যা পাঠকদের অশান্ত করে তুলত। লেখককেও। সেই অশান্তি যে কিসের জন্যে তা যখন বিশ্লেষণ করতে বসি তখন নেতি নেতি করতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে কথার সঙ্গে কাজ চাই, নইলে কথা কেবল মুখের কথা। কাজ মানে বীরের মতো কাজ, বিদ্রোহ, বিপ্লব, সংঘাত, সংঘর্ষ। রোমাণ্টিক সাহিত্যের ভিতর য়্যাকশনের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। যার জীবনে য়্যাকশনের লেশমাত্র নেই সে রোমাণ্টিক সাহিত্যিক হয়ে দু'দিন বীরপূজা পাবে। তার পরে তার বিজয়া দশমী।

দশমীতে বিসর্জনের জন্যে অপেক্ষা না করে নবমীতে অপসরণ শ্রেয়। গ্যেটে সময় থাকতে সরে দাঁড়ালেন। তার পরে কী করবেন তা ভেবে মনঃস্থির করতে

তাঁর দশ বারো বছর লাগল। একই মানুষ কবি হবে, বীর হবে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কি না সন্দেহ। থাকলেও প্রথম শ্রেণীর নয়। রোমাণ্টিক কবিরা অধিকাংশ স্থলে নিবে যায়। যারা নিবতে চায় না তাদের বড়ো জ্বালার জীবন। তাদের বেলা দেখা যায়, হয় তারা কথার সঙ্গে কাজের সংগতি রাখতে গিয়ে কাজের লোক হয়ে উঠেছে, কাব্য ছেড়ে দিয়েছে, নয় তারা সুর বদলে দিয়েছে, রোমাণ্টিকের বদলে ক্লাসিক ধরেছে। ক্লাসিক সাহিত্যিকদের কাছে কেউ বিদ্রোহ বিগ্রহ আশা করে না। আশা করে প্রশান্ত উপভোগ বা রূপভোগ। যারা স্বভাবত ক্লাসিক তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু যে বেচারা রোমাণ্টিক পন্থ ছেড়ে ক্লাসিক পন্থ ধরবে তার পক্ষে এ যেন মৃত্যু ও নব জন্মগ্রহণ। মাঝখানে দশ বারো বছর গর্ভযন্ত্রণা।

বয়স যখন আটত্রিশ গোটে পালিয়ে যান ইটালী। সেখানে বছর দেড়েক থেকে পুরোদস্তুর ক্লাসিক দীক্ষা নেন। তার পরে যখন দেশে ফিরে আসেন তখন তাঁর মুখে অন্য সুর। তখন তিনি বাণীমূর্তি আর-এক যুগের। এ যুগ নয়া ক্লাসিক যুগ। কিন্তু পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এর স্বতোবিরোধ ছিল। ঠিক সেই সময় শুরু হয় ফরাসী বিপ্লব। লোকে তখন ক্লাসিক চায় না। যার চাহিদা নেই তা লিখছেই বা ক' জন! একা গ্যেটে এক হাতে কতটুকু করবেন। 'এগমণ্ট', 'তাসো' প্রভৃতি কয়েকটি পরীক্ষার পর তিনি বিজ্ঞানে মন দিলেন ও বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ লিখে অন্য এক রাজ্যে জয়যাত্রা করলেন।

পরে শিলার তাঁর পরীক্ষার সাথী হন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন দুজনেই। গ্যেটের 'হেরমান ও ডরোথেয়া', শিলারের 'ভিলহেলম টেল' দুজনের দুই ক্লাসিক কীর্তি। কিন্তু ইউরোপের নানা দেশে তখন ফরাসী বিপ্লবের বান ডাকছে। বাইরের জগতে যখন ঝড়ঝাপটা চলছে মানসিক জগতে তখন শরতের প্রশান্তি কেমন করে স্থায়ী হবে! গ্যেটে ক্লাসিকের দীক্ষা নিয়েও রোমাণ্টিকের আবর্ত থেকে উদ্ধার পেলেন না। শিলারের মৃত্যুর পর একাকী বোধ করলেন। একক চেষ্টায় শেষ করলেন 'ফাউস্ট' প্রথম ভাগ। ভাবলেন ক্লাসিক সাধনার পরাকাষ্ঠা হলো। কিন্তু হলো রোমাণ্টিক সাধনার বিলম্বিত ও বিমিশ্র পরাকাষ্ঠা।

ইতিপূর্বেই তাঁর 'ভিলহেলম মাইস্টারের শিক্ষানবীশী' শেষ হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও ক্লাসিক ও রোমাণ্টিকের বিচিত্র মিশ্রণ। প্রধানত এই দুখানি মহাগ্রন্থের উপর তাঁর দেশকালোত্তর যশ নির্ভর করছে। এ ছাড়া তাঁর বিভিন্ন বয়সের অগ্নিগর্ভ প্রণয়কবিতার উপর। প্রেমের দহন তাঁকে সারাজীবন দগ্‌ধেছে। ঈশ্বর তাঁকে এমন করে সৃষ্টি করেছিলেন যে প্রেমের অনুভূতি তাঁকে বার-বার আগুনে পুড়িয়ে সোনার মানুষ করেছিল। সোনা হয়ে তিনি যাই লিখলেন তাই সোনা হয়ে গেল। নারী তাঁকে কোনদিনই বিপথে নেয়নি। প্রতিবারেই নিয়ে গেছে ঊর্ধ্বে হতে আরো ঊর্ধ্বে। বিরাশি বছর বয়সে মৃত্যুর অল্প দিন পূর্বে যখন 'ফাউস্ট' দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত হয় তখন তার শেষ কথা হলো—

"The Eternal Womanly draws us above."

নারী সম্পর্কে দান্তের পরে এত বড়ো প্রশস্তি আর কেউ রচনা করেননি।

যুগের সঙ্গে যোগাযোগ সেই ছাব্বিশ বছর বয়সের পর থেকে বেতালা হয়েছিল বলে গ্যেটের কপালে ছিল নিরবচ্ছিন্ন ভুল বোঝা। ঊর্ধ্বচারী বলে শ্রদ্ধা করত তাঁকে সকলে, এমন কি শত্রুরাও। কিন্তু ঠিক বুঝত না বেশী লোক। এখনো তাঁর প্রতি একটা বিমুখভাব রয়ে গেছে তাঁর দেশে ও বিদেশে। ঝড়-ঝাপটার যুগ এখনো জগৎ জুড়ে চলছে। রোমান্টিক সাহিত্যই সাধারণের হৃদয় হরণ করে। কিন্তু যারা লেখে তারা বীর নয়, তাই নিজেরাও তৃপ্তি পায় না, অপরকেও দিতে পারে না। যেভাবে গ্যেটে তাঁর সমস্যার সমাধান করেছিলেন সেভাবে অর্থাৎ ক্লাসিক দীক্ষা নিয়ে সমাধান করতে পারছে ক'জন! সমাধানের জন্যে যাচ্ছে নিচে নেমে। করছে মনোরঞ্জন। সাহিত্য হয়ে উঠছে সিনেমার মতো এনটারটেনমেণ্ট। আর যারা ওভাবে সমাধান করতে অনিচ্ছুক তারা অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাদের মানসিক অস্বাস্থ্য তাদের দেহকে আক্রমণ করেছে। এমনি করেই তো মারা গেলেন শেলী কীটস্ বায়রন। কেউ জলে ডুবে, কেউ যক্ষ্মায়, কেউ যুদ্ধের নাম করে। যারা মরে না তারা পাগল হয়ে যায়।

এ সব কথা যদি মনে রাখি তা হলে বুঝতে পারি গ্যেটে কেন 'কবিগুরু'। কাজী আবদুল ওদুদ কেন তাঁর গ্রন্থের নাম রেখেছেন 'কবিগুরু গ্যেটে'। ইচ্ছা করলে তিনি বলতে পারতেন 'মহাকবি গ্যেটে'। কিন্তু আজকের দিনের কবিদের কাছে মহা-কবির চেয়ে কবিগুরুর তাৎপর্য বেশী। একালের কবিরা যদি বুঝতে চেষ্টা করেন তাঁকে তা হলে তাঁর আর কতটুকু লাভ হবে! লাভ হবে একালের কবিদের অনেক কিছু। তা বলে তাঁর অনুসরণ করা চলবে না। সম্ভব নয়ও। যুগের সঙ্গে তাল রাখার কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ব্যর্থতা যেন কেউ নিজের ব্যর্থতার সমর্থন-রূপে ব্যবহার না করেন।

কাজী সাহেবের এই গ্রন্থ কেবল বাংলা সাহিত্যে নয়, বোধ হয় ভারতীয় সাহিত্যে অপূর্ব। ইংরেজীতেও এমন জীবনীর সঙ্গে অনুবাদের সংযোজন বড়ো-একটা চোখে পড়ে না। গ্যেটের অনেকগুলি কবিতার তর্জমা আমি এই প্রথম পড়লুম, কেননা ইংরেজী তর্জমা কিনতে পাওয়া যায় না অনায়াসে। কাজী সাহেব স্বয়ং একজন প্রচ্ছন্ন কবি। সেইজন্যে তাঁর তর্জমা হয়েছে মৌলিকের মতো মধুর। তার উপর তিনি আজীবন গ্যেটেপন্থী। গ্যেটে তাঁর কাছে কেবল কবি নন, জীবনপথের দিশারী। গ্যেটের বহু অমূল্য বাণী তিনি একত্র গ্রথিত করেছেন। এটিও এ গ্রন্থের অন্যতম আকর্ষণ। যাঁরা যেমন তেমন করে বাঁচতে চান না, কেমন করে বাঁচব এ যাদের প্রশ্ন, সেইসব জীবনজিজ্ঞাসুকে পড়তে হবে এ বই। নয়তো খুঁজতে হবে 'একারমানের সঙ্গে গ্যেটের কথোপকথন' নামক ইংরেজী বই।

কাজী সাহেব গ্যেটেগৃহিণী ক্রিস্টিয়ানাকে যথেষ্ট জায়গা দেননি বলে তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া আছে। গৃহিণীকে পত্নীর মর্যাদা দিতে পনেরো বছর ধরে ইতস্তত করা কি উচিত হয়েছিল গ্যেটের, এ কথা এই দেড় শ বছর অনেকের মনে উদয় হয়েছে।

এর একটা নিষ্পত্তি চাই। নইলে লোকে চিরকাল তাঁকে ভুল বুঝবে। জীবন-শিল্পীদের জীবনের বড়ো বড়ো সিদ্ধান্তগুলো অকারণ নয়। কারণ আছে নিশ্চয়ই, যদিও আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট নয়। প্রথম যৌবনে কবি যাঁকে ভালোবাসতেন তাঁর নাম ফ্রীডেরিকা। এঁর ভালোবাসাও তিনি পেয়েছিলেন। বিবাহের বয়স হয়েছিল, এমন কোনো বাধাবিঘ্ন ছিল না, সমান ঘর না হলেও যাজকের সম্মান সব দেশে। কেন তবে তিনি ব্যথা বুকে চেপে বিদায় নিলেন ? কারণ খ্রীস্টীয় বিবাহে পাত্রপাত্রীকে অঙ্গীকার করতে হয়, সারাজীবন বিশ্বস্ত থাকব। গ্যেটের পক্ষে এরূপ অঙ্গীকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ হতো। হয়তো তিনি বিশ্বস্ত থাকতেন জীবনের অবশিষ্ট ষাট বছর। কিন্তু যদি না পারতেন তা হলে কী হতো ? তা হলে হতো অসত্যাচরণ। অথবা আপনার প্রতি অবিচার। চোখ বুজে অত বড়ো একটা অঙ্গীকার করা উচিত হতো না। সেই জন্যে তিনি বিবাহের প্রস্তাব না করে প্রস্থান করলেন। কয়েক বছর পরে লিলির সঙ্গে তাঁর বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। এমন সময় তিনি চললেন সুইটজারল্যাণ্ড ও তার পরে ভাইমার। বাগ্‌দানের পরে লিলির পিতামাতার মত ছিল না বলে বাগ্‌দান ভঙ্গ করতেন কেন গ্যেটে ? তা নয়। খ্রীস্টীয় বিবাহের ভিত্তিভূমি যে আজীবন বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকারের দ্বারা তিনি নিজেকে বাঁধতে পারলেন না। এমন যে গ্যেটে তিনি ক্রিস্টিয়ানাকে খ্রীস্টীয় মতে বিবাহ করতেন কেমন করে ? সিভিল ম্যারেজ তখনকার দিনে চলিত ছিল না। সম্পর্ক না পাতালেই পারতেন, কিন্তু ক্রিস্টিয়ানার দিক থেকে বিবাহের প্রত্যাশা ছিল না। তিনি জানতেন যে অভিজাতের সঙ্গে শ্রমিকের বিবাহ সেকালের সমাজ সহ্য করত না। যা হবার নয় তার চেয়ে যা হয়ে থাকে তাই ভালো। এই ভাবেই তাঁদের মিলন হয়। পরবর্তীকালে পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে গ্যেটে নিজের থেকেই ক্রিস্টিয়ানার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিধিবদ্ধ করে নেন। এবং রাজদরবারকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেন যে তাঁর পুত্র আইনসংগত বংশধর। এর পরে তাঁর ছেলের বড়ো ঘরে বিয়ে হয়। অভিজাত সমাজ তাকে মেনে নেয়। প্রথম থেকেই গ্যেটে ক্রিস্টিয়ানার প্রতি সশ্রদ্ধ ছিলেন। বিশ্বস্ত থাকতে তাঁর কিছুমাত্র কষ্ট হয়নি। ক্রিস্টিয়ানাও ছিলেন অসাধারণ পতিগতপ্রাণা। সুতরাং তাঁদের সম্পর্ক বিধাতার চোখে বিবাহই ছিল, মানুষের চোখে যাই হোক না কেন। আর একটি কথা, গ্যেটে কোনো দিনই কোনো মানুষকে হীন জ্ঞান করেননি। কোনো শ্রেণীকেই তিনি নীচ শ্রেণী বলে ভাবতেন না। অভিজাত বলে তাঁর গর্ব ছিল না। তবে এ বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন তা ঠিক। কাজী সাহেবের গ্রন্থ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করি।

> "নিম্ন শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে গ্যেটে চিরদিন মিশতেন, দয়াপরবশ হয়ে নয়, শ্রদ্ধার সঙ্গে। তাদের তিনি ভাবতেন, 'ভগবানের সৃষ্টিতে যেন সর্বশ্রেষ্ঠ— সংযম, সন্তোষ, ঋজুতা, বিশ্বাস, সামান্য সৌভাগ্যে উৎফুল্লতা, সরলতা, অনন্ত-কষ্টসহিষ্ণুতা, এই সমস্ত গুণ তাদের মধ্যে বর্তমান।' গ্যেটের পুত্রবধূ লুইসের কাছে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন এই বলে যে অত বড় জ্ঞানী সামান্য লোকদের

সঙ্গে যে কী করে প্রাণভরে আলাপ করতেন তা তাঁর ধারণার অতীত।"
(১৫৭ পৃষ্ঠা)

গোটের এই নিম্নশ্রেণীপ্রীতির সূচনা হয় বাল্যকালেই। তখন ভালোবাসতেন সত্যিকারের এক গ্রেট্‌খেনকে। সেই গ্রেট্‌খেনই বিবর্তিত হতে হতে হয়ে উঠল 'ফাউস্টে'র মার্গারেট বা গ্রেচেন। নিম্নশ্রেণীর এই বালিকাই জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকের মহীয়সী নায়িকারূপে কবির পরিণত বয়সের অন্তিম প্রশান্তির অধিকারিণী হয়েছে চিরস্মরণীয় আর্ষ বাক্যে—

"The Eternal Womanly draws us above."

(১৯৪৯)

যোগভ্রষ্ট

তোমার চিঠির উত্তরে চিঠিই লিখছি। ভেবেছিলুম নীরব থাকব। কিন্তু যেখানে আর সবাই সরব সেখানে একজন নীরব থাকলে তারও একটা কদর্থ হবে।

মনে পড়ে গেল বিশ বছর আগের একটি ঘটনা। আমার এক প্রতিবেশীর পুত্রের যায়-যায় অবস্থা। শহরের সব কয়েকজন গণ্যমান্য ডাক্তার বাইরে বসে পরামর্শ করছেন। কেসটা যাঁর তিনিই সিদ্ধান্ত নেবার মালিক। তিনি যদি অপরের পরামর্শ নেন ভালো। তখন দায়িত্বটা তাঁর। একমাত্র তাঁর। তখন তাঁকেই তাঁর বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। সে-সময় তিনি বলতে পারবেন না যে, অপর পাঁচ-জনের পরামর্শে কাজ করেছেন। দোষ তাঁর একার নয়।

আমার স্পষ্ট মনে আছে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলে। কিন্তু ডাক্তার গুপ্ত একটিও কথা বলেন না। তাঁর কেস নয় বলে কি? আমার ভাবতে খারাপ লাগছিল যে তিনি উদাসীন। রাত তখন অনেক। সিদ্ধান্ত একটা কিছু না নিলেই নয়। অথচ ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ। একজন তো একেবারেই নীরব। তাঁর কেস নয় বলে কি তাঁর দয়ামায়া নেই? আমি তো তাঁকে ভালো করেই চিনি। মানুষ হিসাবেও সমান ভালো।

শেষে ডাক্তার গুপ্ত উঠলেন। বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ নামলেন। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "এই দুর্গাদাস। উঠলে কেন? তুমি কী করতে বল?" গুপ্ত ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমি হলে এই ওষুধটি দিয়ে দেখতুম।" এই বলে একটা ওষুধের নাম করলেন। তখন তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হলো। আবার চলল আলোচনা। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। গাড়ী তৈরি ছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং এসে পেট্রোল কুপন দিয়ে গেছলেন। লোক ছুটল ওষুধ কিনতে। ওষুধ এলো। ওষুধ দেওয়া হলো। ছেলে বাঁচল। আমরা বাঁচলুম।

তা হলে দেখছি নীরব থাকা মানে উদাসীন থাকা নয়। এর অন্য অর্থ থাকতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কে না চিন্তিত, কে না উদ্বিগ্ন? আজ আমরা সবাই তো গৃহকর্তা। তা বলে আমরা সবাই কি ডাক্তার? এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের সংখ্যা সারাদেশে তিনজন কি চারজন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র জবাহরলালের উপরেই সিদ্ধান্তের ভার। গৃহকর্তা কোন্ সাহসে তাঁকে বিদায় দিয়ে তাঁর জায়গায় আরেকজনকে বসাবেন? আরেকজন কোন্ সাহসে বসবেন? ভোজ রাজা যখন বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে যান তখন বত্রিশটি পুত্তলিকা তাঁকে বত্রিশটি উপাখ্যান শুনিয়ে নিরস্ত করেছিল। নইলে ভোজ রাজাই অপদস্থ হতেন। তাঁর প্রজাদেরও অমঙ্গল হতো। এ ক্ষেত্রে

জবাহরলালকে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর কারো পরামর্শ যদি তিনি চান, যাঁর যা বক্তব্য আছে পেশ করতে পারেন। তিনি যদি সে পরামর্শ গ্রহণ করেন উত্তম। কিন্তু দায়িত্বটা তাঁরই।

নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবে যে বিনোবাজী নীরব। অর্থাৎ যেটুকু না বললে নয় কেবল সেইটুকুই তিনি বলেছেন। দেশরক্ষা করতে হবে। তার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভূদান গ্রামদান গ্রামসংগঠন শান্তিসেনা গঠন। সেই পুরোনো কথাই নূতন অবস্থায় বলেছেন।

বিনোবাজীর শিক্ষা গান্ধীর কাছে। জবাহরলালজীর শিক্ষাও গান্ধীর কাছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন শুরু করতে হলো তখন, গান্ধীজী বললেন বিনোবাজী হবেন প্রথম সত্যাগ্রহী। কারণ বিনোবাজী সর্ব অবস্থায় অহিংস। তাঁর প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অহিংস। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী কে হবেন তা নিয়ে গান্ধাজী অনেক চিন্তা করেন। উদ্বেগজনক বিশ্বপরিস্থিতিতে ভারতভাগ্য হয়তো একদিন ভারতীয়দের হাতেই আসবে। তখন কি দেশ সম্পূর্ণ অহিংসভাবে আত্মরক্ষা করতে পারবে? গান্ধীজী যদি বেঁচে না থাকেন বিনোবাজী কি সেইভাবে দেশরক্ষা করতে পারবেন? আদর্শবাদী গান্ধীজী বাস্তববাদীও ছিলেন। তাই দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী বলে মনোনয়ন দিলেন জবাহরলালজীকে।

তখন থেকেই দেখা যাচ্ছে দেশের জনমত দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগের প্রতিনিধি বিনোবা। অপর ভাগের প্রতিনিধি জবাহরলাল। মাথা-গুনতিতে কার ভাগে লোক বেশি তা জানবার উপায় নেই। কারণ কোন্ পদ্ধতিতে দেশরক্ষা করা সমীচীন এ প্রশ্নের উপর ভোট নেওয়া হয়নি। ভোটে বিনোবার জিৎ হলে তিনি কি প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নেবেন? সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিবর্তে নিরস্ত্র প্রতিরোধের আদেশ দেবেন? জওয়ানদের বদলে শান্তিসৈনিকদের লডাখে ও নেফায় পাঠাবেন? না। তিনি চাইলেও দেশবাসী তা চাইবে না। সে সাহস আমাদের নেই। দেশ তার জন্যে প্রস্তুত নয়। কোনো কালেই ছিল না। গান্ধীজীই বাধ্য হলেন কাশ্মীর রক্ষার জন্যে সশস্ত্র সৈনিক পাঠানোর প্রস্তাবে সায় দিতে। শান্তিসৈনিক পাঠালে হয়তো আদর্শ রক্ষা হতো, কিন্তু কাশ্মীর রক্ষা হতো না। উদ্দেশ্য যদি হয় কাশ্মীর রক্ষা তবে তখনকার পরিস্থিতিতে একমাত্র কার্যকর উপায় ছিল সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ। গান্ধীজী সেটা জানতেন ও বুঝতেন। তাই দুঃখের সঙ্গে মেনে নিলেন।

আজকের পরিস্থিতিতে বিনোবাজীকেও মেনে নিতে হচ্ছে দেশরক্ষার চিরকেলে উপায়। কিন্তু ইতিহাসের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে দেশরক্ষার অহিংস উপায়ও উদ্ভাবন করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে। ভারতই একমাত্র ভূমি যেখানে তার সাফল্যের লেশমাত্র সম্ভাবনা আছে। আদৌ যদি না থাকত তবে তিনি প্রথম সত্যাগ্রহী বলে মনোনয়ন পেতেন না, পেলেও নিতেন না। গান্ধীজীও তাঁর চেয়ে যোগ্যপাত্র না পেলে অমন একটা পরীক্ষার কথা বিশ্ববাসীকে শোনাতেন না, শুনিয়ে হাস্যাস্পদ হতেন না। ইতিহাস গতানুগতিক পন্থায় চলত। গান্ধী টলস্টয় অরণ্যে

রোদন করতেন। বিনোবাজী যদি তাঁর বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন তা হলে ইতিহাস তাঁকেও একটা সুযোগ দিতে পারে। ভারতের মরা হাড়ে ভেলকি আছে গান্ধী নেতৃত্বের আগে কেউ কি তা বিশ্বাস করত ? আমি একবার করেছি একবার করিনি আবার করেছি আবার করিনি। মহাত্মাজীর সঙ্গে যেবার মালিকান্দায় সাক্ষাৎ করি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ তখনো আরম্ভ হয়নি। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখি তিনি গভীরভাবে চিন্তিত। অত বড় পরীক্ষা তাঁর জীবনে আসেনি। বললুম, "আপনি করে দেখান, আমি বিশ্বাস করব।"

ভারত কি একদিন করে দেখাতে পারবে ? আমার যুক্তিবাদী মন বলে "খেপেছ! অহিংস দেশরক্ষা! সোনার পাথরবাটি! এ শতাব্দীতে নয়।" কিন্তু আমার মধ্যে একজন সৃষ্টিবাদী আছে। সে বলে, "প্রকৃতি নিত্য নূতন সৃষ্টি করে চলেছে। মানুষও নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে করতে সভ্য হয়েছে, সভ্যতর হয়েছে। চেষ্টা করলে সে সভ্যতম হতে পারে। হাইড্রোজেন বোমার পরে কী ? হয় প্রলয়, নয় সৃষ্টি। সৃষ্টির পথই মানুষকে ধরতে হবে। যদি না সে ডাইনোসরের মতো নিশ্চিহ্ন হতে চায়। তাকে পথ দেখাবে কে ? ওই গান্ধী। ওই বিনোবা। ওই আধখানা ভারত, যে আজ পদব্রজে তপস্যা করে চলেছে, যার মনে লেশমাত্র ভয় নেই, যার অন্তর বিশ্বপ্রেমে উদ্বেল।"

সারা ভারত আজ দেশরক্ষার সংকল্প নিয়েছে। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু দেশরক্ষার পদ্ধতি কী হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। দুটো মতই সমান সত্য। জবাহরলালকে যেমন তাঁর নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে দিতে হবে তেমনি বিনোবাকে তাঁর বিশ্বাস ও সামর্থ্য অনুসারে। কেউ কাউকে বাধা না দিলেই হলো। এই ভারত সামান্য দেশ নয়। তিন হাজার বছরের ইতিহাস পাওয়া গেছে, আরো দু'হাজার বছরের নিদর্শন খুঁজলে পাওয়া যাবে। এদেশে কত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষাই না হয়েছে! গোমাংস যাদের ঋষিদেরও প্রিয়খাদ্য ছিল তারা এখন গোমাংসের ধার দিয়েও যায় না। তাদের একটা বড় অংশ আমিষ পর্যন্ত খায় না। আমরা এই পাঁচ হাজার বছর ঘাস কাটিনি। অহিংসায় অনেক দূর এগিয়েছি। রামায়ণ মহাভারতের বনিয়াদের উপর আমাদের জনগণ দাঁড়িয়ে আছে। দুই মহাকাব্যেরই প্রধান প্রতিপাদ্য সত্যের মহিমা, দুই নায়কই সত্যসন্ধ। কবে কোন দেশে সত্যের উপর এই পরিমাণ জোর দেওয়া হয়েছে যে যুধিষ্ঠির যুদ্ধকালে অর্ধসত্য বলেছিলেন বলে তাঁকে সেই পাপে নরকদর্শন করতে হলো ?

দেশের আধখানা মন হিংসায়, আধখানা অহিংসায়। এই হয়েছে আমাদের ট্র্যাজেডী। ষোলো আনা হিংসার প্রস্তুতি নেই, ষোলো আনা অহিংসারও প্রস্তুতি নেই, বলা বাহুল্য অহিংসার প্রস্তুতির প্রথম কথাটি অহিংসা নয়, সত্য। মহাত্মাজী বার-বার সত্যের উপর সবচেয়ে জোর দিয়েছেন। সত্যই ভগবান। হিংসা কোনো কোনো অবস্থায় সমর্থন করা যায়। অসত্য কোনো অবস্থায় নয়। দেশরক্ষার জন্যে অসত্য উচ্চারণ করতে হবে, অসত্য আচরণ করতে হবে এমনতর দাবি যদি

কেউ করে ভারতের অন্তরাত্মা পীড়িত হবে। যুদ্ধে জয়লাভ হয়তো হলো, কিন্তু তার পরে তো মহাপ্রস্থান ও নরকবাস। ও ছাড়া আর কোনো পরিণাম সম্ভব হলে ব্যাসদেব তা দেখাতেন। অথচ যুদ্ধের দাবি এমন সর্বগ্রাসী যে সত্যই হয় তার প্রথম বলি। সব দেশেই সব কালেই এটা দেখা গেছে যে হিংসার সঙ্গে থাকে অসত্য। অহিংসার সঙ্গে থাকে সত্য। যেখানে এক পক্ষ হিংসার আশ্রয় নেয়, অপর পক্ষ নেয় অহিংসার আশ্রয় সেখানে সত্যই হয় নারায়ণ, আর অসত্য হয় নারায়ণী সেনা। তবে সাধারণত যা ঘটে তা হিংসা বনাম অহিংসা নয়, হিংসা বনাম হিংসা। সেইজন্য দুই দিকেই থাকে কিছু সত্য কিছু অসত্য।

যেখানে দুই পক্ষেই কিছু কিছু সত্য আছে সেখানেও কম বেশীর প্রশ্ন আছে। সেই কম বেশীর উপরেও যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে। ইতিহাসে নিছক গায়ের জোর বহুক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে, সেইজন্য নিছক গায়ের জোরের প্রেস্টিজ এখনো প্রচুর। কিন্তু মানুষ ইতিমধ্যে এক ধাপ উপরে উঠেছে। তাই প্রত্যেকবার যুদ্ধকালে তর্ক করে কোন্ পক্ষে ন্যায়ের জোর বেশী। ন্যায় অন্যায় বিনিশ্চয়ও আধুনিক যুদ্ধের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যারা যুদ্ধ করতে যায় তাদের মধ্যে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তারা জানতে চায় কোন পক্ষে কতখানি ন্যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসীদের অধিনায়ক ছিলেন মার্শাল ফশ। পরে তিনি মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর তিনি লিখেছিলেন—

"To sum up, whether we are dealing with the soldier, the high command, the nation or the Government, in each of these divisions war demands an ever-increasing share of the moral forces whose close union and wise combination are alone capable of producing victory. It is to the insufficiency of certain of these forces, or to the lack of cohesion between them, that we must look to grasp and explain the collapse, in the course of the last war, of certain Great Powers, and likewise of armies of formidable repute, which in so far as they themselves are concerned certainly did not fall short of that repute." (*Encyclopaedia Britannica,* 14th Edition, Vol. ?, Army : Morale in War, page 415).

যারা যুদ্ধে লিপ্ত নয় তারাও তো দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে যুধ্যমান দুই নেশনকে। তারাও জানতে চায় কার দিকে ন্যায়, কার দিকে সত্য। তাদের নৈতিক সমর্থনও যুদ্ধকালে মূল্যবান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ইংলণ্ডের পক্ষে নামবে কি না সে নিয়ে মার্কিন জনমন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু ক্রমেই জনমত জার্মানীর বিপক্ষে গেল। অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে জার্মানরা মার্কিনদের ন্যায়বোধকে আঘাত করে। ইংরেজদের সঙ্গে মার্কিনদের এমন কোন চুক্তি ছিল

না যে একের বিপদে অপরকে অস্ত্র ধরতে হবে। স্বার্থের বন্ধন যেমন ছিল তেমনি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাও ছিল। রক্তের বন্ধন তো উভয় পক্ষেরই সঙ্গে। এই যেমন একটা উদাহরণ দিলুম তেমনি আরও দিতে পারতুম। আধুনিক যুদ্ধে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন ঘটনার গতি বদলে দিতে পারে। সুয়েজ নিয়ে কী হলো? ইংরেজ ফরাসীরা দুনিয়ার লোককে বোঝাতে পারল না যে তাদের কেসটাই ঠিক। এমনকি স্বদেশের লোকও একবাক্যে সায় দিল না। বিশ ত্রিশ বছর আগে হলে সুয়েজ যুদ্ধ অমন ঝড় তুলত না। ইংরেজ ফরাসী ইসরায়েলীরা কেল্লা ফতে করত। গায়ের জোর তো তাদেরি বেশী। কিন্তু এই বিশ বছরে দুনিয়ার লোক গায়ের জোরকে সন্দেহ করতে শিখেছে। তাদের প্রথম প্রশ্ন হলো. কে ঠিক? কে বেঠিক?

ইতিমধ্যে ইউনাইটেড নেশনস বলে একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ নেশন উপস্থিত। কয়েকটা ঝগড়া তারা মিটিয়ে দিয়েছে। নইলে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেত। কয়েকটা মেটাতে পারেনি। তাই বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়নি। ভারত সেই মহৎ প্রতিষ্ঠানের সদস্য। চীন বলেও সেখানে এক সদস্য আছে। কিন্তু সেই চীনের সঙ্গে ভারতের কোনো সংস্রব নেই। সে চীন তার কয়েকটি দ্বীপে দ্বীপান্তরিত। যার সঙ্গে আমাদের কারবার সে লাল চীন বা নয়া চীন। চীনের অধিকাংশ জায়গা জমি তারই দখলে। ইউনাইটেড নেশনস তাকে স্বীকার না করলে সে চীনের জন্যে সংরক্ষিত আসনটি অধিকার করতে পারছে না। অথচ সে আসন তাকে দিলে সে ফরমোজার দখল চাইবে. তখন যদি ঝগড়া বাধে সেটা হবে চীনাদের ঘরোয়া ঝগড়া। সে ঝগড়া মেটানোর জন্যে ইউনাইটেড নেশনস ছুটে যেতে পারবে না। কঙ্গোয় ছুটে গেছে, কারণ কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকার তাকে ডেকেছে। চীনের কেন্দ্রীয় সরকার তো তাকে ডাকবে না। তা হলে লাল চীনকে আসন দিতে ইউনাইটেড নেশনসের কী এমন তাড়া? লাভ হতে পারত আমাদের ও আমাদেরই মতো কয়েকটি প্রতিবেশীর। কারণ আমাদের সঙ্গে সীমানা নিয়ে ঝগড়া বাধলে সেটাকে আমরা ইউনাইটেড নেশনসে তুলতে পারতুম। লাল চীন সেখানে উপস্থিত থাকলে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিরা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্তি-রক্ষা করত, আর সে যদি অবুঝ হতো, তাকে না করে আমাদের সাহায্য করত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও লাল চীনকে আমরা তার প্রাপ্য আসন পাইয়ে দিতে পারিনি।

ঝগড়া যে বাধতে পারে এ চেতনা আমাদের অনেকেরই ছিল সেই ১৯৪৯ সাল থেকেই। কারণ ওদের মানচিত্র আর আমাদের মানচিত্র মিলিয়ে দেখলে বেশ খানকটে জায়গা চোখে পড়ে যেটা আমাদের মতে আমাদের. কিন্তু ওদের সেকথা বললে ওরা গা করে না, ঝুলিয়ে রাখে। মানচিত্র সংশোধন করতে সময় নেই, হচ্ছে, হবে, দাঁড়াও দেখি। আগে তো আমাদের সোভরেন্টি স্বীকার কর। আমরা যদি তিব্বতের উপর সোভরেন না হয়ে থাকি তো আমাদের স্বাক্ষরের দাম কী? স্বাক্ষরটি না পেলে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছ না তো একবার প্রাণ খুলে বল,

ভাই চীন, তিব্বতের উপর তুমি সোভরেন। উল্লেখ করতে ভুলে গেছি যে জায়গাগুলি তিব্বতের সীমানাসংলগ্ন।

চু এন-লাই যেবার শান্তিনিকেতনে আসেন আমি তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দিয়েছি ও মানুষটির উপর নজর রেখেছি। তাঁর নামের প্রকৃত উচ্চারণ আমাদের তিনি বলেন। ভোজের শেষে হঠাৎ আওয়াজ তুললেন, "হিন্দী চীনী ভাই ভাই।" আমার কান খারাপ না হয়ে থাকলে আমি শুনলুম "বহাই বহাই।" হতে পারে বেহাই বেহাই। আমার দুই বন্ধু তান য়ুন-শান ও সুধীর খাস্তগীর বেহাই বেহাই হয়েছেন। চৈনিকদের সঙ্গে ভারতীয়দের দু হাজার বছরের উপর চেনাশোনা। রেশম এসেছে তাদের দেশ থেকে, চা চিনি এসেছে তাদের দেশ থেকে। রেশম সড়ক দিয়ে ওরাও যেমন আসত আমরাও তেমনি যেতুম। আমরা যেতুম বৌদ্ধধর্ম নিয়ে। অজন্তার চিত্রকলা নিয়ে। চীনের পথ দিয়ে সে সব দান জাপানেও পৌঁছয়। সমুদ্রপথ দিয়েও। কেউ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি যে চীনে ভারতে সংঘর্ষ বাধবে। রবীন্দ্রনাথ চীন দেশে গিয়ে বিপুল সম্মান পান। আমার কাছে তিনি চীন দেশের জ্ঞানীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শান্তিনিকেতনের চীন ভবন দুই দেশের মাঝখানের সেতু। চিয়াং কাই শেক কবিতীর্থে এসে বহু টাকা দান করে যান। চু এন-লাই এসে আরো টাকা দেন।

এই যে শাশ্বত চীন যার বৌদ্ধদের কাছে ভারত হচ্ছে হোলি ল্যাণ্ড, এর সঙ্গে কি শাশ্বত ভারতের কোনো দিন বিবাদ ছিল যে আমরা অমন একটা অশুভ সম্ভাবনার জন্যে সামরিক অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে প্রস্তুত হব? আমরা জানতুম যে সীমানা নিয়ে বিরোধ একদিন আপসে নিষ্পত্তি হবে। এ ধরনের বিবাদ বহু দেশে বহু বার হয়েছে। এমনি একটা বিবাদ ছিল পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমানা নিয়ে। জায়গাটার নাম সেইস্তান, প্রাচীন নাম শকস্থান। দু পক্ষ সালিশ মানে ইংরেজ সরকারকে। গোল্ডস্মিড কমিশন গিয়ে ১৮৭২ সালে সীমানা-রেখা টেনে দেন। কিন্তু গোলমাল তা সত্ত্বেও থামে না। কাগজে কলমে একটা লাইন টেনে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, সরেজমিনে গিয়ে জরীপ করে পিলার পুঁতে পাকাপাকি করাও দরকার। ত্রিশ বছর পরে আবার দুই পক্ষ ইংরেজকেই সালিশ মানে। তখন ভারতের ইংরেজ সরকার ম্যাকমহোন কমিশন পাঠান। ম্যাকমহোন ছিলেন বড়ঘরের ছেলে, স্যাণ্ডহার্স্ট থেকে পাস করা মিলিটারি অফিসার। পরে হন পলিটিক্যাল অফিসার। পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমানা জরীপ করে তিনি দু পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেন। এর জন্যে তাঁকে খাটতে হয়েছিল দু তিন বছর ধরে, ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল।

সেই যে ম্যাকমহোন তিনি প্রমোশন পেতে পেতে একদিন ভারতের ইংরেজ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি হন। তখনকার দিনে আর সব বিভাগের সেক্রেটারির উপরে একজন করে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর থাকতেন। কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগ ছিল বড়লাটের খাস দপ্তর। তাই তখনকার দিনে ফরেন সেক্রেটারি যিনি হতেন তিনি বাছা বাছা লোকদের মধ্যেও বাছা লোক। বলতে

গেলে তিনিই বড়লাটের সচিব-স্থানীয়। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন লর্ড কিচেনারকে ইজিপ্ট থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায়। ইজিপ্ট হয়ে যায় ব্রিটিশ প্রোটেক্টোরেট। সেখানে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। কাকে জানো ? ম্যাকমহোনকে। তিনি ভারত ছাড়ার আগে একটি কাজ করে যান। তিব্বত, চীন ও ভারত এই তিন পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি বৈঠক করেন। মানচিত্রের উপর দুটি লাইন নির্দেশ করেন। একটি হলো ভারত ও তিব্বতের সীমানাসূচক। অপরটি তিব্বত ও চীনের সীমানাসূচক। প্রথমটিতে চীনা প্রতিনিধির তেমন আপত্তি ছিল না, দ্বিতীয়টিতে ছিল। উপরওয়ালার হুকুম না নিয়ে তিনি স্বাক্ষর করতে পারবেন না বলে চীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে কাগজপত্র পাঠানো হলো। চীন সরকার মঞ্জুরি দিলেন না।

না দেওয়ার কী কী কারণ ছিল সব আমার জানা নেই। তবে একটা কারণ কিছু কিছু জানি। চীনের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক নিয়ে বহুকালের একটা বিবাদ ছিল। ভারত যেমন বলছে কাশ্মীরের প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হতে পারে না. কাশ্মীরের উপর ভারতের সোভারেন্টি, চীনও তেমনি বলত তিব্বতের প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হতে পারে না, তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্টি। তিব্বতের উপর রাশিয়ারও নজর ছিল, ইংরেজেরও নজর ছিল। তাই নিয়ে একটা সিংহ ভালুকের লড়াই বাধতে পারত। ইংরেজ ও রুশ মিলে ১৯০৭ সালে একটা কনভেনশন করে। তাতে স্থির হয় যে, তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্টি। তাই যদি হয় ১৯০৭ সালের পোজিশন তবে ১৯১৪ সালে সে পোজিশন বদলে যেতে পারে না। চীন তখনো সোভরেন। তৎকালীন চীন সরকার যদিও ইংরেজ সরকারের বন্ধু ও যুদ্ধ-কালীন মিত্র তবু তাঁরা সীমানার প্রশ্নটিকে অমীমাংসিতই রেখে দেন। সম্ভবত এই কারণে সে দলিলটিতে সই করলে তিব্বতকেও চীনের মতো একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হয়ে যায়। তা হলে সোভরেন্টির দাবী টেকে না। নিজের স্বাক্ষরই তার বিরুদ্ধে যায়।

ম্যাকমহোন ভারত তিব্বত চীনের বেলা হিমালয় ভূখণ্ডে সেই কাজটি করেন যে কাজটি করেছিলেন গোল্ডস্মিড পারস্য ও আফগানিস্থানের বেলা সেইস্তানে বা শকস্থানে। অর্থাৎ একটি লাইন নির্দেশ করেছিলেন। গোল্ডস্মিড লাইনের পরে ত্রিশ বছর কেটে গেল, তবু মিটমাট হলো না। তার কারণ কাগজে কলমে একটা লাইন টেনে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সরেজমিনে গিয়ে জরীপ করতে হয়, পিলার বসাতে হয়। তার জন্যে আলাদা একটা কমিশন দরকার। ম্যাকমহোন লাইনের বেলা সেটা কোনো দিন হয়নি, এখনো বাকি। চীন সরকার মঞ্জুরি দিলে সেটা জাতীয়তাবাদী আমলেই হয়ে চুকত। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চীন সরকারের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। কিন্তু কী জানি কেন ইংরেজ সরকারও গরজ দেখায়নি। ওরা এমন নির্বিকার ছিল যে মানচিত্রেও ম্যাকমহোন লাইন দেখাতে পঁচিশ বছর দেরি করেছে। ততদিনে চীন জড়িয়ে পড়েছে জাপানী যুদ্ধে।

মনে কর দুজন জমিদার নিজেদের মধ্যে একটা সীমানার প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে জমিদারি হস্তান্তরিত করে বা হারিয়ে দূরে সরে গেল। তাদের স্থান নিল আরো দুজন জমিদার। আগেকার জমিদারদের মাঝখানে যেটুকু সমঝোতা ছিল সেটুকু পরবর্তী জমিদারদের মধ্যে নেই। কাজিয়া তো বাধবেই। স্বাধীন ভারত বলছে, ব্রিটিশ ভারতের আমিই এখন উত্তরাধিকারী। ইংরেজরা শেষ মানচিত্রখানা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তাতে দেখছি এ সব জায়গা আমার। আমি দখলও করছি। তুমি যদি আমার সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাক তবে তুমি আমাকে আমার তালুক মুলুক নির্বিবাদে ভোগ করতে দাও। লাল চীন বলছে, এ সম্পত্তি আমি চিয়াং কাইশেকের অধিকার থেকে জয় করে নিয়েছি, তিব্বত যাকে বলছ সেটা আমাদের তিব্বত অঞ্চল। ইংরেজ তাকে হাত করেছিল, তার স্বাক্ষরের কোনো দাম নেই, কাঁচা দলিল। বেআইনী লাইন। এসো, আবার কথাবার্তা চালাই। আমাকে তুমি কিছু দাও, তোমাকে আমি কিছু দিই। আপসে নিষ্পত্তি হোক। তার পরে পাকা দলিল হবে। কমিশন বসবে। জরীপ হবে। পিলার দেওয়া হবে।

ম্যাকমহোন লাইন নিয়ে যেটুকু জানি বললুম। লডাখ সম্বন্ধে পড়াশুনা করিনি। জানিনে। তবে সেখানেও কমিশন বসেনি, জরীপ হয়নি পিলার বসানো হয়নি। এ সব না করলে বিবাদের জড় থেকে যায়। একশো বছর বাধেনি বলে পরে বাধবে না, এটা যুক্তি নয়, এটা বিশ্বাস। ইংরেজ জানত সে কোনো দিন নড়বে না। যাবৎ চন্দ্র-সূর্য তাবৎ ইংরেজ-রাজ। তিব্বতের লামাতন্ত্র জানত সে ইতিহাসের ধার ধারে না। ধর্মগ্রন্থই তাকে চিরকালের ইজারা দিয়েছে। তেমনি চীন দেশের শাসকরাও মনে করতেন কনফিউসীয় সমাজব্যবস্থা যখন আড়াই হাজার বছর টিকে আছে তখন আরো আড়াই হাজার বছর টিকবে। বিপ্লবের জন্যে, পরিবর্তনের জন্যে যদি কেউ কোথাও কোনো অবকাশ না রাখে তা হলে একদিন সাম্রাজ্য যায়, গদি যায়, সব কিছু নূতন করে মীমাংসা করতে হয়। নয়তো কাজিয়া বাধে।

এই মামলাটি আমরা হস্তান্তরসূত্রে ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছি। আর লাল চীন পেয়েছে দ্বীপান্তরসূত্রে জাতীয়তাবাদী চীনের কাছ থেকে। ইংরেজরা যে আমাদের পক্ষ নেবে এটা স্বাভাবিক। তেমনি ফরমোজা সরকারও পিকিং সরকারের পক্ষে কথা বলছেন। মার্কিন সরকার যখন ঘোষণা করলেন যে, ম্যাকমহোন লাইন তাঁরাও স্বীকার করেন তখন চিয়াং কাইশেকের গভর্নমেণ্ট প্রতিবাদ করে জানালেন যে ম্যাকমহোন লাইন অবৈধ। বেশ বোঝা যাচ্ছে এই প্রশ্নে লাল চীন নীল চীন দুই চীনেরই এক রা। এটা ওদের পৈত্রিক দাবী। ওরা কেউ তিব্বতকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র বলে আমল দিতে চায় না। ওদের দৃষ্টিতে তিব্বত একটি অঞ্চল বা প্রদেশ। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় চীন-তিব্বতের সম্পর্ক এক এক যুগে এক এক রকম। আগেই বলেছি ১৯০৭ সালের অ্যাংলো-রাশিয়ান কনভেনশনে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, তিব্বতের উপরে চীনের সোভরেন্‌টি। অথচ ১৯১৪ সালে তিব্বতকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ব্রিটিশ ভারত ও মাঞ্চু শাসন থেকে সদ্যমুক্ত প্রজাতন্ত্রী

চীনের বৈঠকে। তাকে সমান আসন দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী ? কারণ এই যে তিব্বতের উপরে যেটা ছিল সেটা চীনজাতির ছত্র নয়, মাঞ্চু সম্রাটের বা সম্রাজ্ঞীর ছত্র। চীনজাতি যেমন মাঞ্চু শাসন থেকে মুক্ত হয় তিব্বতী জাতিও তেমনি মাঞ্চু ছত্রাধীনতা থেকে মুক্ত হয়। তিব্বতীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেনি, কিন্তু স্বাধীন জাতির মতো ব্যবহার করেছে আর ইংরেজরাও সেটাকে প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছে। তা বলে চীন সরকার মেনে নেননি।

আমাদের মোকাবিলা করতে হবে শুধু চীনের সঙ্গে নয়, তিব্বতের সঙ্গেও। সে বলবে, আমি ১৯১৪ সালে পক্ষভুক্ত ছিলুম, আমার স্বাক্ষর না থাকলে ভারত-চীন চুক্তি অসিদ্ধ। আগে আমাকে স্বাধীন করে দাও, তার পরে আমার স্বাক্ষর নাও। সুতরাং চীনের স্বাক্ষর যেমন দরকারী তিব্বতের স্বাক্ষরও তেমনি দরকারী। নইলে বিশ ত্রিশ বছর পরে শোনা যাবে তিব্বত স্বাধীন হয়েছে সে বলছে, চীন-ভারত চুক্তির দ্বারা সে বাধ্য নয়, ওসব জায়গার উপর তার দাবী সে ছাড়েনি, তাকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে না দিলে সেও হাঁকবে, লড়কে লেঙ্গে। তার পিছনে কোনো এক শক্তি দাঁড়াবে। হয়তো রাশিয়া। যে মামলাটি আমরা হস্তান্তরসূত্রে লাভ করেছি সেটি ১৯১৪ সালেই মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তিন পক্ষের। অবশ্য লডাখের ব্যাপারটা আরো পুরনো। সাক্ষাৎ ভাবে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব ছিল না।

তার পর মনে রাখতে হবে যে ১৯১৪ সালে তিব্বত যখন তার স্বাক্ষর দিয়েছিল তখন সে পূর্ব সীমানায় কিছু পেয়েছিল বলেই দক্ষিণ সীমানায় কিছু ছেড়েছিল। অর্থাৎ চীনের কাছ থেকে কিছু ফেরত পেয়েছিল বা ফেরত পাবে আশা করেছিল বলেই ব্রিটিশ সরকারকে কিছু ছেড়ে দিয়েছিল বা ইংরেজরা আগে থেকে দখল করে থাকলে দখলটাকে মেনে নিয়েছিল। ভবিষ্যতে তিব্বতের স্বাক্ষর দরকার হলে সে বলবে, চীনের কাছ থেকে আমার পূর্ব সীমানার জমি আদায় করে দিলে তো স্বাক্ষর করব। নইলে আমার কী স্বার্থ ? বরং আমার স্বার্থ আমার নিজের জন্যে কতক জায়গা দাবী করা। পুরনো মানচিত্র আমার পক্ষে যায়।

এটা একটা জবর মামলা। গায়ের জোরে এর নিষ্পত্তি হলে সে নিষ্পত্তি ধোপে টিকবে না। স্টালিন পোলাণ্ডের খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে রাশিয়ার শামিল করে গেছেন। পোলাণ্ডকে ধরিয়ে দিয়েছেন জার্মানীর কাটা অংশ। সেখান থেকে পোলরা ভাগিয়ে দিয়েছে জার্মানদের। এটা নিছক গায়ের জোরে সমাধান। এ ব্যবস্থা একদিন না একদিন রদ হবে। যেমন রদ হলো অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া মিলে পোলাণ্ড ভাগাভাগি। ইতিহাসে দুই এক শতাব্দী খুব বেশী সময় নয়। তিব্বত একদিন স্বাধিকার ফিরে পাবেই। সে কি তার জাতীয় দাবী অমনি ছেড়ে দেবে ? তার পূর্ব সীমান্ত ও দক্ষিণ সীমান্ত দুই সীমান্ত ঠিক করে দিয়েছিলেন ম্যাকমহোন। পরে আবার দুই সীমান্ত ঠিক করে দিতে হবে, কমিশন বসাতে হবে, জরীপ করতে হবে, পিলার পুঁততে হবে।

এ সব কবে হবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু হবে একদিন। হতেই হবে।

ম্যাকমহোন যেখানে থেমেছিলেন সেইখান থেকেই পুনরায় আরম্ভ করতে হবে। ভারত স্বাক্ষর করেছে, তিব্বত স্বাক্ষর করেছে, চীন স্বাক্ষর করেনি। তার স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। সে এখন লাল হয়েছে, তা হলেও কমিউনিজম এক্ষেত্রে একটা ইসু নয়। ইসু হচ্ছে চীনের সোভরেন্‌টির সঙ্গে খাপ খায় তিব্বতের এমন এক স্টেটাস। চীনের সোভরেন্‌টি অস্বীকার করে তিব্বতকে একই এলাকার উপর সোভরেন স্টেটাস দিতে ১৯০৭ সালে ব্রিটেনের সাহস হয়নি, রাশিয়ার সাহস হয়নি। নিদ্রিত মাঞ্চু রাজবংশকে তার সার্বভৌমত্ব থেকে বঞ্চিত করতে তিব্বতেরও সাহস হয়নি। নবজাগ্রত প্রজাতন্ত্রী চীনকে বঞ্চিত করা ম্যাকমহোন বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল না। মহাযুদ্ধ আসন্ন দেখে তিনি বহুকালের একটা পুরনো বিরোধ মিটিয়ে দিতে যত্নবান হন। বিরোধটা মুখ্যত চীনে তিব্বতে। চীন-তিব্বতের মাঝখানকার সীমান্তটা ঠিক করাই ছিল আসল কাজ। গৌণত তিব্বতে ভারতে। তিব্বত-ভারতের সীমান্ত নিয়েও দ্বিমত ছিল। তিব্বতীদের জিজ্ঞাসা কর, এখনো তাদের মত আমাদের থেকে পৃথক। ম্যাকমহোন বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন। বহু পরিমাণে সফলও হয়েছিলেন। আবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু আবার চেষ্টা করবে কে ? কী করে ? ম্যাকমহোন এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু খোঁজ করলে সে-রকম যোগ্য ব্যক্তির অভাব হবে না। তার পরের ধাপটা হচ্ছে চীনকে ও তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে মিলে বৈঠক করতে ডাকা। চীনের নামে নিমন্ত্রণ পিকিং সরকারকে পাঠালে চলবে। কিন্তু তিব্বতের নামে নিমন্ত্রণ কোন্‌ সরকারকে পাঠানো উচিত হবে ? তিব্বত সরকার বলে এখন কেউ নেই। ছিল তিন বছর আগে। ইতিমধ্যে ছেদ পড়ে গেছে। বিদেশে বসে দালাই লামা একটা প্রবাসী তিব্বত সরকার গঠন করতে চাইলে আন্তর্জাতিক আইনের বাধা আছে। ভারত তাঁকে অ্যাসাইলাম দিয়েছে দয়াপরবশ হয়ে। রাজনীতি করতে চাইলে তাঁকে অন্যত্র যেতে হবে। তাঁর প্রবাসী তিব্বত সরকারকে লাল চীন কখনোই স্বীকার করবে না। নীল চীনও করবে না, করলে চীন দেশের সোভরেন্‌টি খর্ব হয়। লাল ও নীল চীন না করলে তাদের সঙ্গে যাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক তারাও করবে না। ভারত যদি করে ভারতই কোণঠাসা হবে। সবাই বলবে প্রবাসী তিব্বত সরকার হচ্ছে ভারতেরই পুত্তলিকা। সে-রকম একটা সরকার গঠিত হলে লাল চীন তৎক্ষণাৎ ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করবে। তা হলে নূতন ম্যাকমহোন বৈঠকে যোগ দিচ্ছে কে কে ?

নিকট ভবিষ্যতে সে-রকম কোনো বৈঠকের সম্ভাবনা নেই। সুদূর ভবিষ্যতে সুদূর পরাহত। লাল চীনকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলে নীল চীন তার স্থান নেবে। সেও তিব্বতকে স্বাধীনতা দিতে নারাজ হবে। তা হলে তাকেও যুদ্ধে হারিয়ে দিতে হয়। যার পিছনে আমেরিকা তাকে হারিয়ে দেওয়া কি ভারতের কর্ম ? তাহলে তিব্বতের একমাত্র ভরসা গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ। সশস্ত্র বিদ্রোহ কোনো কাজে লাগবে না। তিব্বতকে মিথ্যা আশা দেওয়া অন্যায়। পরের সাহায্যের আশায় সে যদি সশস্ত্র

বিদ্রোহ করে তবে সে একেবারে পথে বসবে। গান্ধীবাদী গণ-সত্যাগ্রহই তার একমাত্র আশা। ভারতে সেটা সফল হতে প্রায় ত্রিশ বছর লাগল। তিব্বতে তার চেয়েও বেশী দিন লাগবে।

আপাতত ভারত-চীন-তিব্বত বৈঠকের আশা নেই। আশা আছে ভারত-চীন বৈঠকের, যদি চীনের সুমতি হয়, যদি সে ভারতের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বরের পূর্বের লাইনে ফিরে যায়। হামলা করে চীন তার দরাদরি করার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে। সে কি তার সেই বাড়তি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হবে? সে যদি নারাজ হয় তবে ভারতই বা তার শর্তে রাজী হবে কেন? মধ্যস্থরা উদ্যোগী হয়ে কলম্বোতে পঞ্চায়েত বসিয়েছিলেন। পঞ্চায়েতের প্রয়াস সফল হলে ভারত-চীন সাক্ষাৎ আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা একবার আরম্ভ হলে একটার পর আরেকটা প্রশ্ন উঠবেই। কথায় কথায় তিব্বত প্রসঙ্গও উঠবে। যদি দশটা প্রশ্নের মধ্যে সাতটা প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে যায় তা হলে কোনো সভ্য দেশ বাকি কয়েকটার জন্যে রক্তক্ষয় করে না, আরো কিছুকাল ধৈর্য ধরে। কঠিনতম প্রশ্নগুলিই শেষের দিকে থাকে। আবার এমনও হয় যে কঠিনতমগুলিকে আগে মিটিয়ে নিতে হয়। তা হলে বাকিগুলি অপেক্ষা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে কঠিন হলো তিব্বতের স্টেটাস। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যকে কমনওয়েলথ নাম দিয়ে রানীকে কমনওয়েলথের সর্দার করেছে। ফলে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীন হয়েও স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথের সভ্য। তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ। চীনারা যদি তেমনি কৌশলী হতো তাহলে তিব্বতকেও সেইভাবে সন্তুষ্ট করত।

কঠিনতম না হলেও তার কাছাকাছি যায় তিব্বত থেকে সিনকিয়াং যাতায়াত করার জন্যে নবনির্মিত সড়কের প্রশ্ন। এই সড়ক লডাখ ভেদ করে গেছে। ভারতের আপত্তি স্বাভাবিক। আপত্তি। শুধু এইজন্যে নয় যে অতখানি জমি বেদখল হয়েছে। গুরুতর কারণ আছে। ভবিষ্যতে যদি কোনো দিন রাশিয়ার সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধে তা হলে সিনকিয়াং চলে যাবে রাশিয়ার কবলে। তখন চীন যদি ঐ সড়ক দিয়ে রাশিয়াকে তাড়াতে যায় রাশিয়া বলবে, ভারত, তুমি কেন চীনকে তোমার জমির উপর দিয়ে আমাকে আঘাত করতে আসতে দিচ্ছ? আজ থেকে তুমি আমার শত্রু। কিংবা এমনও হতে পারে যে ওই সড়ক দিয়ে চীনের সমরোপকরণ যাবে প্রকাশ্যে সিনকিয়াং অঞ্চলে। সেখান থেকে গোপনে আজাদ কাশ্মীর হয়ে পাকিস্তানে। আমারই শিল আমারই নোড়া আমারই ভাঙে দাঁতের গোড়া। চীন যদি ও-সড়ক হাতে রাখতে চায় তা হলে মিটমাট বড়ই কঠিন। অথচ চীন ও-সড়ক অকারণে বানায়নি। বানিয়েছে গুরুতর কারণে। সে আশঙ্কা করে যে ফরমোজা থেকে তার উপর একদিন বহুমুখী আক্রমণ হবে। সেই ভয়ে সে তার পূর্ব উপকূল থেকে কল-কারখানা শ্রমিক ইঞ্জিনীয়ার চালান করে দিচ্ছে সিনকিয়াং ও তিব্বতে, শহরকে শহর খালি করে দিচ্ছে। বেশীর ভাগ লোকই ফিরে যাচ্ছে গ্রামের খেত-খামারে। কতককে

পাঠানো হচ্ছে পাহাড় আবাদ করতে। তিব্বত আর সিনকিয়াং হলো চীনের সাইবেরিয়া। সড়কটা তার প্রাণ।

আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হলে আগুন ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে জ্বলে ওঠে। ঘরের কোন্ দিকের চালে লাগে সেটা সব সময়ই একটা চমক। কেউ কি জানত জাপানীরা পার্ল হারবারে হঠাৎ হানা দেবে ? প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছি। পদে পদে চমক। চীনারা বিশ্বাসঘাতকতা করল, এই সত্যটার আগে আর একটা সত্য বোধ হয় অনেকের নজরে পড়েনি। আলাপ আলোচনা চড়ায় ঠেকে বন্ধ হয়ে গেছল। আলাপ আলোচনায় অচল অবস্থা হচ্ছে যুদ্ধের পূর্বাবস্থা। তখনি বোঝা উচিত ছিল যে চীনাদের হাতে আর কোন তাস নেই, এবার ওরা খেলবে আক্রমণের তাস। এবং আক্রমণটা ওরা ওদের সুবিধামতো এলাকায় করবে, আমাদের সুবিধা-মতো নয়। এখন তো আমরা ঠেকে শিখলুম, এর পরে আর সে ভুল করব না। যুদ্ধ চাই কি চাইনে এইটে আগে ভালো করে ভেবে নেওয়া যাক। যুদ্ধ চাইনে, এই যদি হয় মনের কথা, তবে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, বন্ধ করলে চলবে না। যুদ্ধ চাই, এই যদি হয় অন্তরবাসনা, তবে সবরকম চমকের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আলাপ আলোচনায় ছেদ পড়া মাত্রই বুঝতে হবে আর-একটা চমক আসছে।

আলাপ আলোচনা যে ব্যর্থ হবেই এমন অলুক্ষণে কথা আমি মুখে ধরব না। কিন্তু দুই দেশের মেজাজ যা দেখছি তার ফলে আমার ভাবনা এখন অন্য খাতে বইছে। চীন ও ভারত এই দুই প্রাচীন ও প্রতিবেশী দেশের সত্যকার ট্র্যাজেডী হচ্ছে এইখানে যে, এরা পরস্পরকে বাঁচতে সাহায্য করছে না, মরতে সাহায্য করছে। এদের মধ্যে বাণিজ্য নেই, লোক চলাচল নেই, ভাব বিনিময় নেই, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বহুদিন শুদ্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভীম পরিচয় ঘটে যুদ্ধক্ষেত্রে। ঘটায় অঘটনঘটন পটীয়সী প্রকৃতি। মারতে মারতে মরতে মরতে মানুষ পরস্পরকে চেনে। তা ছাড়া, এদের জনসংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সীমায় ফিরিয়ে আনার আর কোনো উপায় যদি না থাকে তবে প্রকৃতিই মন্ত্রণা দেবে উভয়ের কানে, "ওরা অসুর, তোমরা দেবতা। ওদের মারলে পাপ হবে না। ওদের মারো।"

আমি দিনরাত চিন্তা করেছি। আমার কর্তব্য কী ? নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য আমার রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। আমার স্ত্রী জওয়ানদের জন্যে পশমের দস্তানা বুনছেন, আমার মেয়েরা ফার্স্ট এড শিখছে, আমিও চাঁদা দিচ্ছি, ট্যাক্স দিচ্ছি। ডাক পড়লে সিভিল ডিফেন্সে যোগ দিতেও রাজী। কিন্তু লেখক বা শিল্পী হিসাবে আমার নিজেরও তো একটা যোগসাধনা আছে। সৃষ্টিযোগে স্রষ্টার সঙ্গে ও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যোগসাধন। আমাকে যোগভ্রষ্ট করে কার কী লাভ ? কতটুকু লাভ ? আমি যদি আমার সাধনায় নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অতন্দ্র থাকি কার কী ক্ষতি ? কতটুকু ক্ষতি ? আমিও তো একটা দিক সামলাচ্ছি। সংস্কৃতির দিক। বিশুদ্ধ সঙ্গীত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ প্রেম এসব সূত্র থেকেও প্রতিরোধ শক্তি আহরণ করা যায়। যেকাজে আমি হাত দিয়েছি সেটাও একটা করবার মতো

কাজ। তার জন্যে আমি জীবিকা ত্যাগ করেছি। এখন যদি তাকেও ত্যাগ করি তবে আমার জীবনের সম্বল আর কী রইল ?

কবি বা শিল্পী যেন গর্ভিণী নারী। তাকে তার গর্ভ রক্ষা করতে হবে অতি যত্নে, অতি সাবধানে। সেই তার দেশরক্ষা। দেশ কি কেবল দেশের মাটি ? দেশের আদর্শ, দেশের ধ্যান, দেশের স্বপ্ন, দেশের রস, দেশের রূপ এসবও দেশ। চিন্ময় ভারতকে মৃন্ময় ভারতেরই মতো রক্ষা করতে হবে। একাজ করবে কে, যার কাজ সে যদি না করে ? সবাইকে সব কাজে ডাকতে নেই। দেশমাতার চল্লিশ কোটি সন্তান রয়েছে। প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ ভাগ করে দিলেই হয়। তা হলে কোনো কিছুর জন্যে লোকের অনটন হবে না। আমাকেও লিখতে হবে না এমন কোনো রচনা যার জন্যে আমার সৃষ্টি হয়নি, যা আমার সৃষ্টি নয়। যেটা আমি লিখছি সেটা যদি ঠিকমতো লিখতে পারি দেশ তার থেকেও প্রতিরোধশক্তি পেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলি। প্যারিসে আমার এক বন্ধু ছিলেন। বাঙালী। আমার প্রথম প্রকাশিত বই "তারুণ্য" তাঁকে উপহার দিই ১৯২৮ কি ১৯২৯ সালে। তার পর আমি দেশে ফিরে আসি। তিনি থেকে যান। অনেকবার তাঁর কথা জানতে চেয়েছি, কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান পাইনি। সেই নিরুদ্দেশ বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পাই কলকাতায় বিনয় সরকার মহাশয়ের ওখানে ১৯৪৭ সালে। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনিই আমাকে চিনলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে। অস্ট্রিয়ান কাউণ্টেস। মহাযুদ্ধের সময় তাঁরা ছিলেন হলাণ্ডে। সে সময় কালো মানুষ বলে তাঁকে কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। তাঁর স্ত্রীকে ভয় দেখানো হয় এই বলে যে, তোমার স্বামীকে তুমি ডিভোর্স কর, নইলে তার প্রাণ-সংশয়। স্বামীর মত নিয়ে স্ত্রী তাই করলেন। কিন্তু কাছাকাছি এক জায়গায় থাকলেন।

"সেই দুর্দিনে", বন্ধু আমাকে বললেন, "আপনার বই আমাকে মনের জোর জুগিয়েছে। আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। নাৎসীদের কবলে যে কয় বছর ছিলুম আপনার বই ছিল আমার সঙ্গী ও আপনার বাণী ছিল আমার সহায়।"

আমি অভিভূত হলুম। অত বড় পুরস্কার কেউ কোনো দিন আমাকে দেয়নি। আমিও মনে জোর পেলুম। আমার বন্ধু আমাকে বাঁচতে সাহায্য করলেন। দেশ বিভক্ত, হিন্দু মুসলমান লাখে লাখে মরছে ও পালাচ্ছে, গান্ধীজীর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, প্রাণও গেল কিছুদিন বাদে। বাঁচতে কে চায় ? কিসের জন্যে বাঁচবে ? তবু বাঁচতে হলো আমাকে। আমার অর্জুন-বিষাদ দূর হলো। দেখলুম সত্যের শক্তি অসীম। নাৎসীর বিরুদ্ধেও সে প্রতিরোধশক্তি জোগায়। সাহিত্যকে যদি আমি রক্ষা করি সে অপরকে রক্ষা করবে।

যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা

যে দেশে বহু ধর্ম সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত ? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। পাকিস্তানের অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে স্থির হয়ে গেছে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হতে পারত হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত করল অপর একটি যুক্তি অবলম্বন। ভারতের মতে সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই সত্য, সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর সব ধর্মের উপর অবিচার করা হবে, সুতরাং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সর্বোদয়ের বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

এই যুক্তি বর্মাও অবলম্বন করেছিল। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হলো উ নু ও তাঁর দলের। তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে জিতেই আইন পাশ করিয়ে নিলেন যে বর্মা হবে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। অধিকাংশের ইচ্ছায় কর্ম। কে বাধা দেবে ? কিন্তু এর পরিণাম হলো অশুভ। শান, কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির তরফ থেকে দাবী উঠল আংশিক স্বাতন্ত্র্যের। শেষে প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করে শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন। পাকিস্তানেও তাই হয়েছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র এখনো লোপ পায়নি, যেমন লোপ পেয়েছে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। পাকিস্তানী জনগণ যদি কোনো দিন গণতন্ত্রের মর্যাদা বোঝে তা হলে সেই সঙ্গে সেকুলার স্টেটের মর্যাদাও বুঝবে। যেখানে সেকুলার স্টেট নেই সেখানে গণতন্ত্র কেবলমাত্র অধিকাংশের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, সর্বজনের ইচ্ছানির্ভর। গণতন্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে পারে না। যারা প্রতিবেশীকে দ্বিতীয়-শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করে তারা ডিক্টেটরের পদানত হবেই। তারা আত্মকর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কারণ তারা অপরের সমান অধিকার মানে না।

ভারত সেকুলার স্টেট হয়ে বর্মার ও পাকিস্তানের দশা এড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট যতই দৃঢ় হবে গণতন্ত্রও ততই দৃঢ় হবে। অনেকেই এটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কিন্তু সকলে এখনো করেননি। তাঁরা চান হিন্দু রাষ্ট্র, হলোই বা সেটা ফাসিস্ট শাসিত। ইতিহাস এঁদের বাসনা পূর্ণ করলে ভারতেরও দশা হবে পাকিস্তানের বা বর্মার মতোই।

এ গেল ধর্মের কথা। ইতিমধ্যে ভাষার প্রশ্ন প্রবল হয়েছে। যে দেশে বহু ভাষা সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত ? এর উত্তরে বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যাণ্ড একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। কার উত্তরটা ঠিক ? কারটা বেঠিক ?

বেলজিয়াম বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩০ সালে। তার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসী। দশটা বছর যেতে না যেতেই ফ্লেমিশদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তারাও তো বেলজিয়ান। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসীর সমান মর্যাদা পাবে না? দীর্ঘকাল আন্দোলন চালানোর ফলে ১৮৯৮ সালে আইন করে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ভাষারূপে সমান স্থান দেওয়া হয়। এখন সে দেশের রাষ্ট্রভাষা এক নয়, দুই। সরকারী কাজকর্ম দুই ভাষায় চলে।

তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের ন্যাশনাল ভাষা হবে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। বলা বাহুল্য এ তিনটি ভাষা শুধু উপরের দিকের কাজকর্মের ভাষা। নিচের দিকের কাজকর্ম জেলা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় চলে। জেলা স্তরে আরো দুটি ভাষারও অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া সর্বত্র ইংরেজীর প্রচলন। সেটা অবশ্য বেসরকারী ভাবে। সুইসরা একাধিক ভাষা শিখতে অভ্যস্ত।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে এ ধারণা ইউরোপেও ছিল। তার দরুন প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জ্বালিয়েছে। আজকাল আর সে ধারণা নেই। কিন্তু একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে, এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এর ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। আলসাস লোরেনের লোক একবার জার্মানদের হাতে মার খেয়েছে, একবার ফরাসীদের হাতে।

এখন ভারতের কথা বলি। একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে, এ ধারণা যাঁদের মধ্যে নেই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বেলজিয়ামের চেয়ে, সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ যে দেশ, যার ভাষাসংখ্যা খুব কম করে ধরলেও চোদ্দ পনেরটি সেদেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একটিমাত্র বিদেশী ভাষার দ্বারা একসূত্রে গাঁথা ছিল। তার থেকে একটা সংস্কার জন্মেছে যে রাষ্ট্রভাষা একাধিক হতে পারে না। আমি কিন্তু এই সংস্কারের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করিনি। এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির উপরে, সুবিধার উপরে, ন্যায়বোধের উপরে। অধিকাংশের ভোটের জোরে কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে আর সকলের উপর চাপালে পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের মতো একটা অপরিণামদর্শী সমাধান হয়। সেরকম একটা সমাধান যখন বেলজিয়ামে বা সুইটজারল্যাণ্ডে টিকল না তখন ভারতেও টিকতে পারে না। ইতিমধ্যেই তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠেছে। মাত্র পনেরো বছর যেতে না যেতেই এই। এখনো তো অর্ধ শতাব্দী কাটেনি। ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইসুতেই হবে।

হিন্দীর পিছনে সকলের সম্মতি নেই। সকলের তাতে সুবিধা হবে না। সকলের ন্যায়বোধ তার দ্বারা চরিতার্থ হবার নয়। তার পক্ষে একটিমাত্র যুক্তি। অধিকাংশ লোক হিন্দী চায়। অর্থাৎ অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। পাকিস্তান যেমন ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত. ভারতে তেমনি ভাষার ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের আশংকা

জাগে। এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা গায়ের জোরে বা ভোটের জোরে নিষ্পত্তি করা যায় না। ধর্ম তার একটি। ভাষা তার আরেকটি। ধর্মের বেলা আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। ভাষার বেলাও কি দিতে পারিনে ?

তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। ইংরেজীকে সরানোর পরে ঘোরতর বিবাদ বেধে যাবে। তামিলরা হিন্দীকে মানবে না, নাগারা মানবে না, কাশ্মীরীরা মানবে না। বাঙালীরাও মানবে না। এমনি না মানার লক্ষণ চার দিকে। কংগ্রেস থাকতেই এই। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী ? পরে যে দলটার হাতে ক্ষমতা পড়বে সে দল যদি সবকটা রাজ্যের আস্থা না পায় তখন হিন্দীর প্রতি বিরাগ হবে মানুষকে খেপিয়ে তোলার একটা উপায়। যেমন হিন্দুর উপর বিরাগ হয়েছিল মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অব্যর্থ উপায়। সেইজন্যে তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। তর্কটা আসলে হচ্ছে হিন্দী বনাম তামিল-বাংলা-পাঞ্জাবী ইত্যাদি। হিন্দী হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা. এর মানে হিন্দী হবে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তারা হিন্দী শিখতে গিয়ে দেখবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দীভাষী শিশু জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে থাকত প্রত্যেকটি ইংরেজ শিশু। ইংরেজীকে যারা বিদায় করবে তারা কি ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারীকেও একদিন ঘাড় থেকে নামাতে চাইবে না ?

হিন্দী যে ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার স্বপ্ন দেখছে হিন্দী কি বুঝতে পারছে না যে, আর সকলের সঙ্গে ভাগ না করে ভোগ করা যায় না ? ভাগ করার নমুনা কি এই যে, হিন্দীই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ও আর-সব আঞ্চলিক ভাষা ? সব ক'টা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চাই। সেটা যদি কাজের কথা না হয় তবে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা চাই যার দ্বারা আর সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হবে। প্রতিযোগিতার বা পরীক্ষার ভাষা যদি হয় ইংরেজী, তা হলে আমাদের ন্যায়বোধ যতখানি চরিতার্থ হয় হিন্দী হলে ততখানি হয় না। বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজীকে হটাতে চাও ? বেশ। তার বদলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত কর যে-ভাষা আমাদের ন্যায়বোধকে পীড়া দেবে না। সে-ভাষাটি সে-কোনো ভাষা, অহিন্দীভাষীদের দ্বারাই সেটি স্থির হোক।

আর কোনো ভাষা ভারতের সকল প্রান্তে ইংরেজীর মতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়. এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। যেখানে হিন্দী চলে না সেখানেও ইংরেজী চলে। ইংরেজীর অধিকারে না থাকলে সে সব অঞ্চল হিন্দীর অধিকারেও আসত না। ইংরেজী নামক সত্যটির উৎপত্তিস্থল ইংলণ্ড। তেমনি আরো অনেকগুলি সত্যেরও উৎপত্তি ইংলণ্ডে বা ইউরোপে। আমাদের শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, আইন আদালত, পার্লামেণ্ট, আর্মি, নেভী, পুলিস, স্কুল কলেজ, লেবরেটারি, রেল স্টীমার, ডাকঘর ডাক্তারখানা ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ, ছাপাখানা, খবরের কাগজ, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, ট্রাম, বাস, মোটর— কোন্‌টিই বা বিদেশাগত নয় ? এমনকি কংগ্রেসও তো বিদেশী। হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দী। এসবও তো বিদেশী ভাষার শব্দ। আজকাল স্বদেশী

পারিভাষিক শব্দ দিয়ে শোধন করে নেওয়া চলেছে। "রাজ ভবন" বললে স্বদেশিয়ানার একটা বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে বস্তুর নাম পালটে দেওয়া হয় তার বস্তুসত্তা অবিকল তেমনি রয়ে যায়। টেলিফোনকে কী একটা বিকট হিন্দী নাম দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেটা টেলিফোন নামক বিদেশী একটা যন্ত্রই। বিদেশী বলেই সেটা বর্জনীয় নয়।

তেমনি ইংরেজী। তার সঙ্গে পরাধীনতার সম্পর্ক একদা ছিল। এখন তো নেই। ভবিষ্যতেও সে সম্পর্ক ফিরবে না। ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে সব ছাত্রকেই একটা স্তরে ইংরেজী শিখতে হবে। অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীতে কারো আপত্তি নেই। তাই যদি হলো তবে শিক্ষার শেষ ধাপে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী হলে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? তামিলরা ও বাঙালীরা জিতে যাবে, হিন্দীভাষীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, এই কারণ নয় তো? উপরের দিকে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী যেমন ছিল তেমনি থাকাই রাষ্ট্রের স্বার্থ। সেইভাবেই রাষ্ট্র যোগ্যতম প্রার্থী বেছে নিতে পারে। করদাতার অর্থ সেইভাবেই সৎপাত্রে পড়বে। নিকট ভবিষ্যতে আমি এই ব্যবস্থার রদবদলের পক্ষপাতী নই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়াই যদি নীতি হয় তবে প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজীই থাকবে. ইংরেজী ভিন্ন আর কোনো ভাষা হবে না। যদি হিন্দীকেও অন্যতম মাধ্যম কর তবে বাংলাকেও করতে হবে. তামিল তেলুগু কন্নাডিগ মালয়ালমকেও করতে হবে।

জাতীয় মর্যাদার খাতিরে হিন্দি ভারত রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হোক, কিন্তু আভ্যন্তরিক ন্যায়ের খাতিরে ইংরেজীই পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম রূপে থাকুক। ইংরেজী মাধ্যম না থাকলে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক বাংলা, উর্দূ, মরাঠি, গুজরাতী ইত্যাদি চোদ্দ পনেরোটি ভাষা। শুধু হিন্দী নয়। যেখানে হিন্দীকে বসালে অহিন্দীভাষীদের ক্ষতি সেখানে ইংরেজীকে রাখাই সমীচীন। বিদেশী বলে তাকে খেদিয়ে দিলে স্বদেশী বলে শুধু হিন্দীকে নয়, বাংলাকে, পাঞ্জাবীকে, তামিলকেও বসাতে হবে। যেখানে কারুর কোনো ক্ষতি নেই সেখানে হিন্দী আরাম করে বসুক। কিন্তু অপরের ক্ষতি যেখানে সেখানে হিন্দীর আরাম করে বসার অধিকার নেই। জাতীয়তার জন্যে তাকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এটা একভাষী দেশের বেলাই খাটে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটাকে খাটাতে যাঁরা চাইছেন তাঁরা মনে মনে ইংরেজীরই নজির অনুসরণ করছেন। ইংরেজী যেমন একচ্ছত্র ছিল তেমনি একচ্ছত্র হবে অন্য একটি ভাষা। অন্য একটিমাত্র ভাষা। সেই বিদেশী লজিকের জোরে হিন্দীকেও একচ্ছত্র করতে হবে। কিন্তু বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী যদি বিদায় হয় তবে তার নজিরটাকেই বা মানতে যাব কেন? জাতীয় ঐক্য কি সুইসদেরও নেই? বেলজিয়ানদেরও নেই? একাধিক রাষ্ট্রভাষা কি তাদের ঐক্যহানি ঘটিয়েছে?

শেষ পর্যন্ত তর্কটা দাঁড়ায় ইংরেজী হলো বিদেশীর ভাষা, বিজেতার ভাষা। তাকে বিদায় না দিলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। বেশ, তাই হোক। তা হলে ইংরেজীর নজিরটাকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। ভারতের সব ক'টা ভাষাকেই হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা করা হোক। সেটা কাজের কথা নয় এ যুক্তি আর আমরা শুনতে চাইনে। একটা বহুভাষী দেশের রাষ্ট্রভাষা একটাই হবে এটাও কি কাজের কথা? ইংরেজরা তাদের নিজেদের সুবিধের জন্যে ওরকম করেছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতীয়েরও ওতে কিছু সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের দিক থেকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা—হিন্দী হলেও—কাজের কথা নয়। যতগুলি ভাষা ততগুলি রাষ্ট্রভাষা এইটেই কাজের কথা। আমরা যদি এই সত্যকে স্বীকার না করি, এই সত্যের সঙ্গে আপস রফা না করি তবে অমীমাংসিত সমস্যা একদিন আপনার পথ আপনি করে নেবে। বহুভাষী দেশ বহু রাষ্ট্র হবে।

ইউরোপীয়রা যদি না আসত তা হলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো। এরা যে যার সুবিধামতো এক একটা স্বদেশী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক স্বদেশী ভাষাকে। হিন্দীর সার্বভৌমত্ব সব হিন্দু মেনে নিত না। উর্দূর সার্বভৌমত্ব সব মুসলমান মেনে নিত না। হয়তো সবাই মিলে একদিন একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গড়ে তুলত। কিন্তু সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা যে একমাত্র হিন্দী বা একমাত্র উর্দূ হওয়া উচিত এটা সবাইকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হতো। অত দূর যেতে হবে কেন? ধরুন, ১৯৪৭ সালে যদি জিন্নাসাহেব ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় রাজী হয়ে যেতেন, যদি অখণ্ড ভারতবর্ষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো তা হলে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি এক হতো, না একাধিক হতো, না হিন্দী উর্দূর যমজরূপ হতো? সকলেই জানেন যে একমাত্র হিন্দীর একচ্ছত্র দাবি কেউ স্বীকার করতেন না। না জিন্না, না গান্ধী। ঐক্যের খাতিরে হয় যমজ ভাষাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে হতো, নয় ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হতো।

দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলেই একদিকে হিন্দি ও অন্যদিকে উর্দূ একচ্ছত্র হবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে ওই ছাড়পত্রটা উর্দূভাষী মুসলমানদের শাসন শোষণের সনদ। তাই তারা বাংলাকেও উর্দূর সমান অংশীদার করার জন্যে প্রাণপণ করছে। আক্ষরিক অর্থে প্রাণ দিয়েছেও। উর্দূই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা তারা কোনো কালেই মেনে নেবে না। তারা যেন বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ ভাষী। লেগে থাকলে তাদের মাতৃভাষাও পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা হবে, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা নয়। উর্দূ ভাষীরা যদি তাতে নারাজ হয়, তবে রাষ্ট্র দু ভাগ হয়ে যাবে। তার জন্যে দায়ী হবে উর্দূভাষীদের জেদ। আর নয়তো ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল

রাখতে হবে। আপসের আর কোনো উপায় নেই। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, কিন্তু আপসের একমাত্র উপায়।

উর্দূর বিরুদ্ধে নয়, উর্দূভাষীদের প্রচ্ছন্ন সনদের বিরুদ্ধেই পূর্বপাকিস্তানীদের এ বিক্ষোভ। তেমনি হিন্দীভাষীরাও একটা সনদ পেয়ে গেছে। ভাবী ভারতের শাসক ও ধনিক শ্রেণী হবে হিন্দীভাষী এরকম একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী ভেবেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতি অল্প ক্ষমতা দেবেন, আর সব ছড়িয়ে দেবেন প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে। ঠিক উল্টোটি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ভরসা নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণের অন্তরায়। দেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকেই বরণ করে নিয়েছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে হিন্দীভাষীদের ধনাধিক্য ও ভোটাধিক্যের উপর ছেড়ে দিলে সেটা গণতন্ত্রের মতো দেখায়, কিন্তু সেটা হয় উত্তর ভারতের দ্বারা ভারাক্রান্ত মাথাভারী গণতন্ত্র। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তামিলদের একদল এরই মধ্যে খেপেছে। হিন্দী নামক ভাষার বিরুদ্ধে ততটা নয়। যতটা হিন্দীভাষী শাসক ও ধনিক শ্রেণীর সনদের বিরুদ্ধে। মিটমাট না হলে দেশ আবার ভাঙবে। আপসের আর কী উপায় আছে— ইংরেজীকে সহচর ভাষারূপে অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখা ভিন্ন?

আমাদের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা বলছে যে দেশ বহুখণ্ড হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বিপদের সময় দেশবাসী একজোট হয় না। সুতরাং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন চাই। এতকাল পরে আমরা আমাদের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছি। কাশ্মীরী, কেরলী, বাঙালী, তামিল, অসমীয়া, গুজরাতী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা প্রান্তের লোক একবার কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল শুনেছি। সেটা কিন্তু মিলেমিশে দেশ চালানোর জন্যে নয়। ইতিহাসে এই প্রথমবার আমরা একজোট হয়ে রাষ্ট্র চালাচ্ছি। এ জোট যদি ভেঙে যায় তবে আবার পরাধীনতা। একে অটুট রাখতেই হবে। অথচ একমাত্র রাষ্ট্রভাষার সনদ যে একে তলে তলে ভাঙছে। এটা এমন একটা ইসু যার একপ্রান্তে হিন্দীভাষীদের স্বার্থ, অপর প্রান্তে অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ, মাঝখানে ওই আপসের প্রস্তাব। ওই সহচর ভাষা। ভাঙনকে রোধ করতে হলে ওর চেয়ে আর কোনো সহজ উপায় নেই। বিদেশী বলে ইংরেজীতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা ইচ্ছা করলে ইংরেজীর বদলে বাংলা তামিল মরাঠি ইত্যাদি চৌদ্দ পনেরটি ভাষাকে সহচর ভাষা বানাতে পারেন। কিন্তু সেটার নাম আরো সহজ নয়, আরো জটিল।

'বিদেশী' এই বিশেষণটাই যদি যত নষ্টের গোড়া হয়ে থাকে তবে আমরা তার বদলে 'আন্তর্জাতিক' এই বিশেষণটি ব্যবহার করতে পারি। স্বাধীন রাষ্ট্র যদি কমনওয়েলথ নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তো আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সেটা যদি খাপ খায়, তবে এটাই বা বেখাপ হবে কেন? আগেকার দিনে বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি শোনা যেতো ইদানীং স্বদেশী ভাষার বিরুদ্ধেও ততগুলি শোনা যাচ্ছে। তামিলরা তো সাফ

বলে দিয়েছে যে, হিন্দীও ওদের পক্ষে বিদেশী। আমরাও তো দেখছি হিন্দী শিখতে ইংরেজীর চেয়ে কম শক্তি খরচ হলেও হিন্দীতে শেখবার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে, ইংরাজীতে বিস্তর। শব্দগুলো হয়তো চেনা, কিন্তু অর্থ এক নয়। আর ব্যাকরণ তো আরবীর কাছাকাছি যায়। 'মহাত্মা গান্ধীকী' হলো কেন? 'কা' হলো না কেন? কারণ 'জয়' শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। আর বিশেষ্য যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে বিশেষণকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে, ক্রিয়াপদকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ, 'জয়' কেন স্ত্রীলিঙ্গ হবে? 'ফতে' স্ত্রীলিঙ্গ বলে।

যাই হোক হিন্দী আমাদের দেশের সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা। দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা না হলেও শিখতুম। শিখেছি। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' হেঁকেছি। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে সুখীই হয়েছি। তা হলে বাধছে কোন্‌খানে? বাধছে এইখানে যে, ভারত যেমন ধর্মের বেলা নিরপেক্ষ তেমনি নিরপেক্ষ ভাষার বেলা নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সে তার রাষ্ট্রকে একাকার করেনি, কিন্তু হিন্দীভাষার সঙ্গে তা করেছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র নয়, কিন্তু সংবিধানের যদি সংশোধন না হয়, তবে ১৯৬৫ সালে হিন্দী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হওয়ামাত্র ভারতকে বলা যাবে হিন্দী-রাষ্ট্র। তখন হিন্দীভাষীরাই হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। পাকিস্তানের হিন্দুরা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ভারতের বাংলাভাষী তামিলভাষী পাঞ্জাবীভাষীরাও তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বনবে। সংবিধান রচনার সময় কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলির সদস্যেরা সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করেননি। তাঁদের মধ্যে তখনি দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। এক পক্ষ ছিলেন হিন্দীর সমর্থক। অপর পক্ষ ইংরেজীর। বলা বাহুল্য ইংরেজীর সমর্থকরা জানতেন যে ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা। শুধু বিদেশীর নয় বিজেতার ভাষা। ইংরাজীর সমর্থন করেছিলেন বলে তাঁরা যে কম স্বদেশী বা কম স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাও কংগ্রেসের লোক। ভোটে দিয়ে দেখা গেল দু'পক্ষের ভোটসংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীর সামান্য একটিমাত্র ভোটের ব্যবধান। এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দী ইংরেজী দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল।

এখানে আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমাদের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' বলে আখ্যাত করা হয়নি। হিন্দীকে বলা হয়েছে 'সরকারী ভাষা'। সংবিধান যদি সংশোধন করা হয়, তবে ইংরেজীকে বলা হবে 'সহচর সরকারী ভাষা'। 'রাষ্ট্রভাষা', 'জাতীয় ভাষা' ইত্যাদি আখ্যা প্রকৃত-পক্ষে সব ক'টি ভারতীয় ভাষারই পাওনা। কোনো একটি ভাষার নয়। হিন্দী যদি সে রকম একটা আখ্যা পেয়ে থাকে, তবে সেটা বিধিসম্মতভাবে নয়। সেটা পাঁচজনের মুখে মুখে। যেমন সুবোধ মল্লিক মহাশয়কে লোকে 'রাজা' বলত। যেমন কংগ্রেস সভাপতিকে লোকে 'রাষ্ট্রপতি' বলত। রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দীর একটা নামডাক হয়েছে। মন্ত্রীরাও তাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে এর

কোনো সমর্থন নেই। সুতরাং হিন্দী এমন কিছু হারাচ্ছে না, যা সংবিধান অনুসারে তার প্রাপ্য। আর ইংরেজীও এমন কিছু পাচ্ছে না যার বশে সে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হবে। লোকমুখে হিন্দীই থেকে যাবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সংবিধানে তার একটি সহচর সরকারী ভাষা জুটবে। সেটি যদি ইংরেজী না হয়ে উর্দূ কিংবা তামিল হতো তাতেও হিন্দী গোঁড়াদের আপত্তির তরঙ্গ উঠত। ইংরেজীকে যেমন তাঁরা 'বিদেশী' বলে অপাংক্তেয় করতে চান, তেমনি তাকেও করতেন অন্য কোনো ছুতোয়। মোদ্দা কথা শরিক তাঁরা চান না। হলেই বা সে স্বদেশী।

হিন্দী থাকছে, ইংরেজীও থাকবে, ভবিষ্যতে ভাববিনিময়ের ভাষার অভাব হবে না। যাঁরা হিন্দীতে চান তাঁরা হিন্দীতে ভাব বিনিময় করবেন, যাঁরা ইংরেজীতে চান তাঁরা ইংরেজীতে। যদি বিনিময় করার মতো ভাব থাকে। যদি সে রকম মনোভাব থাকে। সরকারের কাজকর্মের ভাষা ছাড়া কি ভাববিনিময় হয় না ? সংস্কৃতেও হতে পারে। উর্দূতেও।

গান্ধীজী সাধারণত হিন্দীতেই ভাববিনিময় করতেন কিন্তু জীবনের শেষদিনও তাঁকে বাংলা হাতের লেখা তৈরি করতে দেখা গেছে। নোয়াখালিতে ফিরে বাংলায় ভাববিনিময় করতেন। তামিলদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি তামিল ভাষা শিখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে। পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি উর্দূতেও কথা বলতেন। রথীবাবুর সঙ্গে, আমার সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে কথা বললেন ১৯৪৫ সালে। ভাববিনিময় একটিমাত্র ভাষায় হবে— হিন্দীতে— এমন অদ্ভুত ধারণা তো গান্ধীজীর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতভাষী সুধীদের এক সম্মেলন হয়। আমাদের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক গেছলেন যোগ দিতে। ফিরে এসে বললেন, আলোচনা হলো— কোন্ ভাষায়, বলুন তো ? ইংরেজীতে !

আর একটা মজার গল্প বলি। পাঞ্জাবে সেদিন দারুন বচসা বেধে গেল। খোঁপা আর এলোচুলে নয়, পাঞ্জাবীতে আর হিন্দীতে। তামাশা এই যে, দু'পক্ষেরই বাক্য-বাণ বর্ষিত হলো উর্দূ সংবাদপত্রে। মামলার ভাষা হলো উর্দূ। মনে আছে ছেলে-বেলায় আমি একবার লালা লাজপৎ রায়ের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার নমুনা চেয়ে পাঠাই। পত্রিকা দেখে আমার চক্ষুঃস্থির। হিন্দী নয়, ইংরেজী নয়. উর্দূ। যেখানে উর্দূ উভয়ের জানা সেখানে ভাববিনিময়ের ভাষা উর্দূ হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুল কলেজে যিনি যাই পড়ুন না কেন দেখা হলে হিন্দুতে আর শিখে বাতচিৎ হয় উর্দূতেই।

সরকারী ভাষা বলে গণ্য না হলেও উর্দূতেই পশ্চিমা হিন্দু ও শিখদের স্বাচ্ছন্দ্য আমি অনেকবার লক্ষ করেছি। তেমনি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত না হলেও ইংরেজীর কদর এদেশে দীর্ঘকাল থাকবে। কেন থাকবে তার একশো কারণ। জাতীয়তাবাদীরা যত সহজে ইংরেজকে হটিয়েছেন, তত সহজে ইংরেজীকে অচলিত

করতে পারবেন না। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো। স্বাধীনতার পরে আমাদের গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে। লোকে চায় হাই স্কুল। টোল নয়, মাদ্রাসা নয়, বুনিয়াদী নয়, বিশুদ্ধ বাংলা বিদ্যালয় নয়, সেই সেকালের মতো হাই স্কুল। কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল। কলেজের সংখ্যাও বাড়ছে। যেখানে মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী উঠে যাচ্ছে সেখানেও বিষয় হিসাবে ইংরেজী থেকে যাচ্ছে। এটাও জনগণের ইচ্ছায়।

ইংরেজীর কাজ হবে স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া বা ঠিক করতে সাহায্য করা। সে কাজ হিন্দীর দ্বারা হতে পারে না। সামনের দশ বিশ বছরে তো নয়ই, এই শতাব্দীতে নয়। একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা একবিংশ শতাব্দী ভাববে। আমরা যারা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি তাদের ভাবনা বিংশ শতাব্দীকেই ঘিরে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে। সে প্রয়োজন প্রশাসনঘটিত নাও হতে পারে। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতো তা হলে আমরা কেউ ইংরেজীকে সরকারী ভাষা বা তার সহচর করতুম না। সব যুক্তিকে খারিজ করত সেণ্টিমেণ্ট। বাংলা-ভাষাই হতো রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও ইংরেজীর প্রয়োজন ফুরোত না। লোকে ইংরেজীকে চাইত বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেবার জন্যে। সৃষ্টির ও সমালোচনার আদর্শ চোখের উপর তুলে ধরার জন্যে। ইংরেজের যুগ গেছে, ইংরেজীর যুগ যায়নি। আরো আধ শতাব্দী থাকবে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি ? খাস ইংরেজের দেশে ইংরেজী যদি পেছিয়ে পড়ে, তেমন বড় লেখক যদি না জন্মান, বইগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, সাময়িক-পত্রগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, খবরের কাগজগুলো যদি হয় বিশেষত্বহীন, সেই জ্বলন্ত বিবেক যদি নিবে আসে, চিন্তার স্বাধীনতা যদি চোরাবালিতে ঠেকে যায় তা হলে অর্ধ শতাব্দীকাল কে একটা মরা সাহিত্য কাঁধে করে বেড়াবে ? ইংরেজী যদি বাংলাকে বা হিন্দীকে এগিয়ে দিতে না পারে তবে ইংরেজীর অবস্থানকাল আধ শতাব্দীও নয়। আরো আগে তার উপর থেকে লোকের মন উঠে যাবে। মানুষকে জোর করে ইংরেজী শেখানোর আমি পক্ষপাতী নই। ইংরেজী যে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হয়েছে এটাও আমার মতে অনুচিত। ছেলেরা যদি ইংরেজী শিখতে না চায় না শিখবে। না শিখলে পরে পশতাবে। নিজেদের ছেলেমেয়ে হলে তাদের বলবে অমন ভুল না করতে। কতক লোকের পশতানো দরকার। আজকাল মাড়োয়ারীর ছেলেরা মন দিয়ে ইংরেজী শেখে। বাঙালীর ছেলেরা ফাঁকি দেয়।

ইংরেজীর পেছিয়ে পড়া যেমন অসম্ভব নয় হিন্দীর এগিয়ে যাওয়াও তেমনি সম্ভবপর। এক পুরুষের মধ্যে হিন্দীর অসাধারণ উন্নতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে উর্দুকে আত্মসাৎ করতেও পারে। দেবনাগরী লিপি ছাড়া অন্যান্য লিপিতে কি হিন্দী লেখা যায় না, ছাপা যায় না ? রোমক লিপিতে ছাপা হলে হিন্দী বই কাগজ আরো চলবে। বাংলা লিপিতে ছাপলে বাঙালীরা অনায়াসে পড়বে। কতক হিন্দী বই কাগজ একাধিক লিপিতে ছেপে পরীক্ষা করা উচিত পাঠকসংখ্যা কী পরিমাণ বাড়ে। অনেকে দেবনাগরীর ভয়ে হিন্দীর দিকে ঘেঁষতে চায় না। তাদের উপর

জোরজুলুম করে যেটুকু ফল হবে তার চেয়ে ঢের বেশী হবে বিভিন্ন লিপিতে হিন্দী বই কাগজ ছেপে। তার পর হিন্দীর ব্যাকরণ আরো সরল হওয়া চাই। পশুপাখির কার কী লিঙ্গ তাই আমাদের জানা নেই। শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ থাকবে ও আমরা তা জানব, এ কী জ্বালা!

শেষ কথা, ইংরেজীর দীপশিখা নিবে গেলেই যে হিন্দীর দীপশিখার, বাংলার দীপশিখার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির দীপশিখার দেওয়ালি হবে এটা একপ্রকার নঞর্থক চিন্তা। বরং ইংরেজীর দীপ যতক্ষণ জ্বলছে জ্বলতে দাও, তার সাহায্যে নিজেদের দীপ জ্বালিয়ে নাও। ফুঃ দিয়ে তাকে অকালে নিবিয়ে দিলে পরে হয়তো দেখবে নিজেদের দীপও নিবু নিবু। দেওয়ালি হবে, না কালীপূজা হবে, কে এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবে?

সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার

জাতির বা দেশের জীবনে বিশ বছর এমন কিছু বেশী সময় নয়। ত্রিশ বছর, চল্লিশ বছর অর্ধশতাব্দী লাগলেও আমি আশ্চর্য হব না, কিন্তু বরাবরের মতো পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে যাক ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার মোটের উপর এক না দুই। যদি এক হয়ে থাকে তবে তাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ও উর্দূ ভাষার স্থান আছে. হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেরই উত্তরাধিকাররূপে। তাতে তাজমহলের ও কুতবমিনারেরও স্থান আছে। যৌথ উত্তরাধিকার রূপে।

তেমনি ইংরেজ আমলের শ্রেষ্ঠ দানগুলিও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে. বাঙালী পাঞ্জাবী মরাঠা গুজরাতী তামিল তেলুগু নির্বিশেষে. আর্য দ্রাবিড় আদিবাসী নির্বিশেষে, ভারতীয় পাকিস্তানী নির্বিশেষে আমাদের সকলের অবিভক্ত উত্তরাধিকার। বিশ বছর আগে দেশ ও রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে গেছে. কিন্তু সংস্কৃতি বিভক্ত হয়নি। কেউ তখন বলেনি যে সংস্কৃতিও বিভক্ত হলো।

তার পরেও কি বিভক্ত হয়েছে? সেরকম কোনো ঘটনা ঘটে থাকলে আমাদের অজানা। পাকিস্তানে এখনো এক কোটির মতো হিন্দু আছে, তারা তাদের প্রতিবেশীদের মতোই পাকিস্তানী। পাকিস্তানীদের যা সংস্কৃতি তাদেরও তাই। তেমনি ভারতীয় ইউনিয়নে পাঁচ কোটির চেয়ে বেশী মুসলমান আছে। তারা তাদের প্রতিবেশীদের মতোই ভারতীয়। ভারতের যা সংস্কৃতি তাদেরও তাই। সংখ্যালঘুরা কোনোখানেই আলাদা একটা সংস্কৃতির ধুয়ো তুলছে না। তুললে দুই রাষ্ট্রেই তুলবে। সংখ্যাগুরুরাও যে তুলছে তাও নয়। কিন্তু তাদের ব্যবহার দেখে দুঃখিত হতে হয়।

কলকাতা রেডিও খুললেই কানে আসে ধর্মীয় সঙ্গীতের ও অনুষ্ঠানের আতিশয্য। যাতে খ্রীস্টান বা মুসলমানের লেশমাত্র অংশ নেই। উত্তরভারতের রেডিওগুলিতে হিন্দু ও হিন্দীর দাপট কোনো নিরপেক্ষ শ্রোতা বিশ্বাস করবে না যে এটা আমাদের সকলের সম্মিলিত উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি। অথচ আমরাই দাবী করে থাকি যে আমাদের রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ। ভাষার ছদ্মবেশে ধর্মকেও আসরে নামানো হচ্ছে প্রতিদিন নানা ছলে। বিভিন্ন প্রোগ্রামে। রেডিও কর্তৃপক্ষ হয় বধির, নয় অজ্ঞ, নয় জেনেশুনে সেকুলার স্টেটকে অবজ্ঞা করছেন।

পাকিস্তান সেকুলার রাষ্ট্র নয়। তার রেডিও যদি ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মের সমান অধিকার না মানে তবে আমাদের কিছু বলবার নেই। ইসলামী দৃষ্টি থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিচার করা অযৌক্তিক হলেও অস্বাভাবিক নয়। তাই করতে

গিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপর আংশিক নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। পাকিস্তানীদের অনেকেই তার প্রতিবাদ করেন। শুনছি নিষেধাজ্ঞা রদ হয়েছে। অবশ্য তার মানে এ নয় যে রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রকার সঙ্গীত রেডিও পাকিস্তান পরিবেশন করবে। তা হলেও পাকিস্তানী কর্তারা প্রকারান্তরে স্বীকার করলেন যে পাকিস্তানের সংস্কৃতি বিশুদ্ধ ইসলামী নয়। এটা একটা অগ্রগামী পদক্ষেপ।

পাকিস্তানের সৃষ্টির সময় থেকেই একদল বলে আসছেন যে বাঙালী মুসলমানরা কেবল মুসলমান নয়, তারা বাঙালী। সুতরাং অন্যান্য বাঙালীর মতো তাদেরও একটা ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক উত্তরাধিকার আছে, যেখানে তারা অন্য ধর্মের বাঙালীর থেকে অভিন্ন, যেখানে তারা অন্যভাষী মুসলমানের থেকে ভিন্ন। এই দলটিই বাংলা বনাম উর্দূর দ্বন্দ্বে প্রাণদান করেন ও তার ফলে জনসমর্থন লাভ করেন। কিন্তু বিপরীত মনোভাবও কাজ করে আসছে। বাঙালী হিন্দু মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য ও সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অভিন্নতা স্বীকার করে নিলে ইসলামের দৃষ্টিতে 'পাক না-পাক' ভেদ রক্ষা করা অবাস্তব হয়। পূর্বপাকিস্তানের মহামান্য গভর্নর নাকি দুঃখ করছেন যে, ছেলেমেয়েদের নাম থেকে বোঝা যায় না কে মুসলমান ও কে মুসলমান নয়। ভেদজ্ঞান ছাড়া তিনি ও তাঁর দল আর কিছু জানেন না। ইতিহাসের বা সাহিত্যগ্রন্থের পাতা ওলটালে দেখতেন যে বাংলার তথা উপমহাদেশের সব হিন্দু মুসলমানের অমিলের চেয়ে মিলই বেশী।

দলকে দল রাজপুত মুসলমান হয়ে গেছে, কিন্তু রাজপুত আচার বা সংস্কার ছাড়েনি। সেইজন্যে এক ট্র্যাজেডী ঘটে গেল হীর ও রঞ্জার জীবনে। রঞ্জা ছিল জাঠ। পাঞ্জাবী হিন্দু মুসলমানের সব চেয়ে মধুর, সব চেয়ে করুণ ও সব চেয়ে আদরের কাব্য লেখা হয়েছে এই কাহিনী অবলম্বন করে। লিখেছেন ওয়ারিশ শাহ্। তাঁকে শিখ হিন্দু, মুসলমান সমান ভালোবাসেন। দেশভাগের পর যে মহামারী ঘটে তাতে বেদনাবিহ্বল হয়ে কবি অমৃত প্রীতম লেখেন, "ওয়ারিশ শাহ্, দেখে যাও তোমার সাধের পাঞ্জাবের কী দশা আজ।"

কবিতাটি পাঠ করতে করতে শিখ অধ্যাপকের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয়, তাঁর চোখে জল এসে পড়ে। ওয়ারিশ শাহ্ কে! একজন কবি ছাড়া কেউ নন। তবু তিনি পাঞ্জাবের আত্মা। তাঁর কাছেই আবেদন করছেন তাঁরা যাঁরা পাঞ্জাবী। যাঁরা শিখ হলেও সেকথা ওয়ারিশ শাহ্‌কে বলতে চান না। রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করে পূর্বপাকিস্তানী বাঙালী মুসলমান কবির কবিতাও পড়েছি। একই সুরে বাঁধা।

ওয়ারিশ শাহ্ অসংখ্য ওয়ারিশ রেখে গেছেন পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে। ওয়ারিশদের ধর্ম অনুসারে এক একটা খোপে পোরা যায়, কিন্তু ওয়ারিশ শাহ্‌কে ভাগ করবার কী উপায়? তাঁর কাব্যকেই বা বিভক্ত করবে কে? সেরকম কোনো ঘটনা এখনো ঘটেনি। মোনেম খান সাহেব যদি লাহোরে পদার্পণ করেন তা হলে আরো অবাক হবেন সেখানকার ব্যাপার দেখে। তারা এখনো পাঞ্জাবী ভাষায় লিখছে, যদিও উর্দূ হরফে। তাদের লেখা সীমান্ত ভেদ করে পাচার হচ্ছে ভারতীয়

পাঞ্জাবে। পড়ছে এপারের শিখ ও হিন্দুরা। কী শয়তানী ষড়যন্ত্র। অধ্যাপক আমাকে বললেন, "আমরা ওপার থেকে বিস্তর পাঞ্জাবী বই চোরাই ভাবে আনিয়েছি।" হাঁ, ওয়ারিশ শাহ্ এখনো জীবিত। তাঁর আত্মা পাঞ্জাবীদের ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ করছে। তারা এখন অনুতপ্ত, লজ্জিত।

অধ্যাপক আমাকে তাজ্জব বানিয়ে দিলেন যখন বললেন যে, "পাক-ভারতের যুদ্ধের সময় ভারতীয় ফৌজ যখন লাহোর জয় করতে যায় তখন এপারের পাঞ্জাবীরা মনে মনে প্রার্থনা করে, হে ভগবান, লাহোরের পতন যেন না হয়।"

"কেন, লাহোরের পতন হবে না কেন?" আমি প্রশ্ন করি।

"লাহোর যে আমাদের।" অধ্যাপক উত্তর দেন। সে মুহূর্তে তিনি ধর্মনির্বিশেষে পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবের রাজধানীর আধ্যাত্মিক ওয়ারিশ। লাহোরের পতনে যে তাঁরও অগৌরব। যদিও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তাতে গৌরব বোধ করতে পারে।

না, আমিও সেই অর্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নই যে অর্থে লাহোরের পতন আমার কাছে গৌরবের। দেশ বিভক্ত হয়েছে বলে আমি অন্য মানুষ হয়ে যাইনি। ভগবান না করুন, ঢাকার যদি কোনোদিন পতন হয় আমিও অগৌরব বোধ করব। সেরকম পরিস্থিতি কোনোদিন যেন না হয়।

সীমান্তের ওপার থেকে মাঝে মাঝে এক আধখানা বই কাগজ আমার হাতেও আসে। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিষেধ নিয়ে ঢাকার ইন্‌টেলেকচুয়ালরা দুই দলে ভাগ হয়ে যাবার নিদর্শন দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ পূর্বপাকিস্তানেও বিস্তর বাঙালী মুসলমান ওয়ারিশ রেখে গেছেন, তাঁরা তাঁকে ওয়ারিশ শাহের মতো ভালোবাসেন। সে ভালোবাসা এতই আন্তরিক যে কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। ভাষাপ্রীতি ও কবি-প্রীতি তাঁদের বেলা এক হয়ে গেছে। বাংলা আছে অথচ রবীন্দ্রনাথ নেই এ তাঁরা ভাবতেই পারেন না। কিন্তু আর একদল এটা সত্যি সত্যি ভাবতে পারেন। তাঁরা বাংলা রাখবেন, কিন্তু সে বাংলা হবে মুসলমানী বাংলা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্জনীয়। হিন্দুপ্রাধান্যের ভয় তাঁদের এখনো ভাঙেনি।

এই দ্বিতীয়োক্ত দলটিও বাঙালী। ঘটনাচক্র অন্যরূপ না হলে এঁরা ও আমরা একসঙ্গেই থাকতুম। দেশ যখন অবিভক্ত ছিল তখন একসঙ্গেই ছিলুম। সাতশো বছর একসঙ্গেই কাটিয়েছি। এঁরা মুসলমান বলে সাহিত্যে বা সঙ্গীতে পৃথক ছিলেন না। আলাওল, দৌলৎ কাজী, মাগন ঠাকুর, পাগলা কানাই, লালন ফকির, মদন বাউল কেই বা পৃথক ছিলেন? আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেব দেশভাগের পরে এঁদের পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন যে বাংলাভাষায় ও সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান বলে দুটো পৃথক ভাগ নেই।

তবে হিন্দুপ্রাধান্যের অভিযোগটা অমূলক নয়। একথা স্বীকার করতেই হবে যে ইংরেজীশিক্ষার উদ্যোক্তা যাঁরা ছিলেন তাঁরা হয় ইউরোপীয় নয় হিন্দু। কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজীর ক্লাস খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু মুসলমানরা তার সুযোগ নেন না। বিধর্মীর ও বিজেতার ভাষা বলে ইংরেজীর উপর তাঁদের এক বিজাতীয় ঘৃণা ছিল।

আবার হিন্দুকলেজ নামক প্রতিষ্ঠান যাঁদের কীর্তি তাঁরা ইউরোপীয়কে নিলেও মুসলমানকে নিতেন না। হিন্দুকলেজের শেষপর্বে তার গভর্নিং বডিতে এই নিয়ে বিতর্ক হয়। অনেকেই ঐ নীতি পরিবর্তন করার পক্ষে। বিপক্ষেও কতক লোক ছিলেন। নীতি পরিবর্তন করা হয়। মুসলমান ছাত্র নেওয়া হয়। কলেজের নতুন নাম হয় প্রেসিডেন্সী কলেজ। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কলেজ স্থাপন করেন তাতেও মুসলমানের প্রবেশ ছিল না। এ নিয়ম গত মহাযুদ্ধের সময়ও বলবৎ ছিল। এখন পরিবর্তন করা হয়েছে কি না জানিনে।

একে তো মুসলমানদের নিজেদেরই অনাগ্রহ, তার উপর সুযোগের অভাব, ফলে মুসলমানদের ইংরেজীশিক্ষা দুই পুরুষ পিছিয়ে থাকে। ইতিমধ্যে বাংলাসাহিত্যের নেতৃত্ব চলে যায় ইংরেজীশিক্ষিত হিন্দুদের হাতে। ইংরেজীর অনুকরণ বা অনুসরণ করতে গিয়ে এঁরা বাধ্য হয়ে সংস্কৃত পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করেন। আরবী ফারসী তা বলে এঁরা বর্জন করেন না। বঙ্কিমের রচনায় যত আরবী ফারসী আছে তত তাঁর পরবর্তী মুসলমানদের রচনাতেও নেই। আরবী ফারসী যে ধীরে ধীরে প্রভাব হারায় তার কারণ সরকারী ভাষা আর ফারসী থাকে না। জোর করে আরবী চালাতে গেলে ক'জন পাঠক বুঝতেন?

এখন ইংরেজীশিক্ষার সুযোগ মুসলমানরাও পাচ্ছেন, পাকিস্তানে তো নিশ্চয়ই। হিন্দু প্রাধান্যের ভয় ভেঙে যাওয়াই উচিত। আর সংস্কৃত শব্দ আলাওলের রচনায়ও কম নয়। সংস্কৃত নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক দর্শনের ও বৌদ্ধ জৈন গ্রন্থেরও ভাষা ছিল। সংস্কৃত আর হিন্দু সমার্থক নয়। অকারণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারের আমরাও বিরোধী। ভাষা যথাসম্ভব প্রাকৃতের মতো হবে। মুখের ভাষার কাছাকাছি যাবে। প্রাচীনত্বের বাহন হবে না। ধর্মের আঁচল ধরে থাকবে না। আধুনিক মনের গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলবে।

(১৯৬)

ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি

সংস্কৃতি বলতে সাধারণত ধর্মভিত্তিক সংস্কৃতিই বোঝাত। যেমন হিন্দু সংস্কৃতি, মুসলিম সংস্কৃতি, খ্রীস্টীয় সংস্কৃতি। কিন্তু গত দু'তিনশো বছরে ধর্মভিত্তিকের চেয়ে দেশভিত্তিকের বা মহাদেশভিত্তিকের প্রভাব বেড়েছে। তার ফলে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে প্রাক্‌খ্রীস্টীয় গ্রীক রোমক ও অখ্রীস্টীয় ইহুদী মুসলিম ধারা মিলিত হয়ে সাগরসঙ্গম সৃষ্টি করেছে। তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতিতে আর্য দ্রাবিড় তথা তুর্ক পারসিক মিলে যে ত্রিবেণী সঙ্গম রচনা করেছিল তার সঙ্গে ইউরোপীয় সাগরস্রোত মিলে গঙ্গাসাগরসঙ্গম সম্ভব করেছে।

ছেলেবেলায় আমরা ভারতের সমন্বয়শালিনী প্রতিভার কথাই শুনেছি। যে প্রতিভা আর্যকে দ্রাবিড়ের সঙ্গে, হিন্দুকে মুসলিমের সঙ্গে, প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে মিলিয়ে এমন একটি সমন্বয় বিবর্তিত করেছে বা করতে নিযুক্ত রয়েছে যা নিছক হিন্দু বা বিলকুল মুসলিম বা একান্ত ভারতীয় বা নিতান্ত প্রাচ্য নয়। যা ভারত-ভিত্তিক হলেও আংশিক ভাবে প্রতীচ্য, আংশিকভাবে মুসলিম।

অসহযোগ আন্দোলনের সময় আমাদের জাতীয়তাবাদীরা আর স্বীকার করতে রাজী হন না যে ভারতভিত্তিক সংস্কৃতি আংশিকরূপে পাশ্চাত্ত্য। তাঁদের সমন্বয়চিন্তায় মুসলিমের স্থান ছিল, তার মানে তুর্কপারসিক ধারার দান ছিল, কিন্তু ইউরোপীয়ের প্রবেশ ছিল না। স্বাধীনতার পরে দেখা গেল দেশ দু ভাগ হয়ে গেছে। তার এক ভাগে বিলকুল মুসলিমের জয়জয়কার। হিন্দু সেখান থেকে উৎখাত। ইউরোপীয়কেও বহিষ্কার করতে পারলে আরো ভালো হতো, কিন্তু ততদূর যেতে তেমন উৎসাহ নেই। গেলে বহু শতাব্দী পিছিয়ে যেতে হয়।

বাকী যে ভাগটার নাম ভারতীয় ইউনিয়ন সে ভাগটাতে বিশুদ্ধ হিন্দুর জয়জয়-কার হলে কেউ আশ্চর্য হতো না। কারণ পাশ্চাত্ত্যকে তো আগেই অস্বীকার করা হয়েছে, ইসলামী যখন আপনা থেকেই আলাদা হয়ে গেছে তখন তাকেই বা স্বীকার করা হবে কেন? এ যুক্তি এখনো একটি বিপুল জনসমষ্টির মনের উপর কাজ করছে। ভারতীয় সংস্কৃতি বলতে এরা বোঝে গঙ্গাসাগরসঙ্গমের নয়, ত্রিবেণীসঙ্গমের নয়, গঙ্গোত্রীর বা হরিদ্বারের গঙ্গাজল। এতে গ্রীক বা পারসিক বা তুর্ক বা ইংরেজ কোনো প্রকার যবনস্পর্শ থাকবে না, স্পর্শদোষের জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হতে হবে। সমন্বয় নয়, শুদ্ধিই এদের কাম্য। শুদ্ধির খাতিরে এরা ইংরেজী বর্জন করবে, উর্দূ বর্জন করবে। অসহযোগ আন্দোলন ও দেশবিভাজন এই দুটি ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই সাংস্কৃতিক শুচিবাতিক, এই বর্জনশীল মানসিকতা। এর

শিকড় অসহযোগের পূর্বেও যথেষ্ট দৃঢ় ছিল। স্বদেশী যুগের জাতীয়তাবাদ ইউরোপীয় কিংবা মুসলিম কোনো বিদেশী আমদানীকেই ভারতীয় প্যাটার্নের অঙ্গীভূত ভাবতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের ও ব্রাহ্মসমাজের জীবন্ত প্রভাব কাজ করছিল। ওদিকে রাণাডের ও প্রার্থনাসমাজের। রেনেসাঁস ও রেফরমেশন যেখানে যেখানে সক্রিয় ছিল সেইখানেই ছিল গ্রহণশীল সমন্বয়শীল মনোভাব।

ভারতীয় ভাষাগুলির প্রত্যেকটিতে নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছিল। সে জোয়ার সমুদ্রের জোয়ার। ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন তথা বিজ্ঞান এনেছিল সেই জোয়ার। কয়েক দশকের মধ্যে এমন অভূতপূর্ব বিকাশ না ঘটলে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' কখনো নোবেল প্রাইজ পেত না। এই যে বিকাশ একে অব্যাহত রাখতে হলে যবনসংস্পর্শকেও অব্যাহত রাখতে হয়। যবনসংস্পর্শের অর্থ ব্যাপকভাবে ইউরোপীয় তথা ইসলামী সংস্পর্শ। রামমোহন যার প্রথম দৃষ্টান্ত। রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে এদেশে রেনেসাঁসও হতো না, রেফরমেশনও হতো না। যা হতো তা ওই শুদ্ধি বা যবনবহিষ্কার।

ভাষাগুলির এই নবজন্মের ফলে আমাদের সংস্কৃতি এখন ভাষাভিত্তিক হয়ে উঠেছে বা উঠতে যাচ্ছে। বাংলা, মরাঠি, তামিল, তেলুগু, হিন্দী, উর্দূ কেউ কারো চেয়ে খাটো হতে চায় না, পশ্চাৎপদ হতে চায় না। জনসংখ্যা কম হতে পারে, বেশী হতে পারে, কিন্তু ভাষার উৎকর্ষ ও সাহিত্যের মানমর্যাদা লোকগণনার ঊর্ধ্বে। অতি অল্পসংখ্যকের ভাষাও মহান সাহিত্যের বাহন হতে পারে। চিন্তার নেতৃত্ব যাঁরা করেন তাঁদের ভাষা হয়তো নরওয়েজিয়ান, যেমন ইবসেনের। একদিন অসমীয়া ভাষা থেকেও হয়তো ইবসেনের মতো কেউ উঠে আসবেন। থিয়েটারের সংখ্যায় কটক পাটনার চেয়ে লখনউয়ের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। কলকাতা এগিয়ে রয়েছে বম্বের চেয়ে, যে কোনো ভারতীয় মহানগরীর চেয়ে ; এই যে অগ্রগণ্যতা এ কেবল সংখ্যায় নয়, গুণেও।

এখন ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির বিপদ হচ্ছে ভাষাভিত্তিকতা মনে প্রাণে গেঁথে যায়। ক্রমে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের পত্তন হয়। ভাষাভিত্তিক রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রশ্রয় পায়। ইতিমধ্যেই আমরা দেখেছি প্রদেশগুলির ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাস, পরে রাজ্যগুলির ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাস। তারপরে দেখেছি এক এক রাজ্যের এক এক সরকারী ভাষা নিয়ে দ্বন্দ্ব। একটি ভাষা একাধিক রাজ্যের সরকারী ভাষা হয়ে ক্ষান্ত নয়, সারা দেশের সরকারী ভাষা হতে বদ্ধপরিকর। সে তার সিংহাসনে আর কোনো ভাষাকে শরিক হতে দেবে না। ইংরেজীকে তো নয়ই, উর্দূকেও না। মানুষের মন যদি এই নিয়ে বিষিয়ে যায় তবে ইউরোপের মতো ভারতও একদিন ভাষাভিত্তিক নেশনরাষ্ট্রে বহুধা বিভক্ত হতে পারে। পাকিস্তানেও এর সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। সেখানে উর্দূ ও বাংলা দুই দিক থেকে টানতে টানতে সিংহাসনটাকেই দ্বিখণ্ড করতে পারে। যদি ইংরেজী নামক যোগসূত্র ছিন্ন হয়।

পাকিস্তানের একমাত্র যোগসূত্র ইংরেজী, যদি ইসলামকে বাদ দিয়ে ভাবা যায়।

লোকে এখনো সে ধারায় ভাবতে শেখেনি। কিন্তু শিখবে একদিন। ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতিই একদিন শেখাবে। ভাষাভিত্তিক কখনো নিছক ইসলামী হতে পারে না। যেমন নিছক ইসলামী কখনো ভাষাভিত্তিক হতে পারে না। পাকিস্তানের একটা বিপুল অংশ নিছক ইসলামী সংস্কৃতির মোহে মুগ্ধ। কিন্তু সে সংস্কৃতির বিকাশ বহুকাল হতে রুদ্ধ। অপরপক্ষে ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ নয়, রুদ্ধ হতে রাজী নয়। আপনার বিকাশের জন্যে সে পশ্চিমের সংস্পর্শ চায়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্পর্শ চায়। কেবল মক্কার উপর নির্ভর করলে সে অক্কা পাবে। সম্প্রতি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে উপলক্ষ করে ইসলামী বনাম বাংলা সংস্কৃতির এক রাউণ্ড কুস্তি হয়ে গেল। বাংলা সংস্কৃতিই জিতবে, যদি আরো এক দফা বলপরীক্ষা হয়।

এবারেও তেমনি এক বলপরীক্ষার জন্যে দেশ প্রস্তুত হচ্ছে। ইংরেজীকে হিন্দি একাই 'রিপ্লেস' করবে। কেবল সরকারী কাজকর্মের বেলা নয়, ব্যবসাবাণিজ্যের বেলা, লেখাপড়ার বেলাও। এ প্রস্তাবে দেশময় যে বিক্ষোভ দেখা দেয় তার ফলে ভারত সরকার এখন অন্যান্য ভাষাগুলিকে উচ্চতম পরীক্ষার ও উচ্চতম শিক্ষার বাহন বলে স্বীকার করে নিতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারে ও কেন্দ্রীয় শিক্ষায়তনে হিন্দীর একাধিপত্য মেনে নিতে হবে। ইংরেজীর জন্যে জবাহরলাল যে প্রতিশ্রুতি রেখে যান তা এখনো আইনে রূপায়িত হয়নি। কোনোদিন হবে কি না নির্ভর করছে হিন্দীভাষীদের মতিগতির উপর। তাদের পেছনেও অন্যান্য ভাষী জোট আছে।

তুমি চল ডালে ডালে তো আমি চলি পাতায় পাতায়। তামিলরা এর মধ্যেই মুখের মতো জবাব দিয়েছে। ওরা ইংরেজী ও তামিল ভিন্ন তৃতীয় কোনো ভাষা শিখতে বাধ্য থাকবে না। ওরা কেউ যদি হিন্দী না শেখে তবে ইংরেজী উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তামিলই তার স্থান নেবে, হিন্দী নয়। তখন পাকিস্তানের মতো ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারকেও মনঃস্থির করতে হবে তাঁরা মাদ্রাজের ছাত্রদের গুলী করে মাদ্রাজের উপর হিন্দীর স্টীমরোলার চালাবেন, না, তামিলকেও কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম সরকারী ভাষা করবেন, না, তামিলভাষী অঞ্চলকে ভারতীয় ইউনিয়নের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেবেন। তিনটির যে কোনো একটি সিদ্ধান্ত নিলে তার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হবে। ইংরেজী এখনো বিদ্যমান বলেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যত-দিন খুশি পেছিয়ে দিতে পারা যাচ্ছে। ইংরেজীর অন্তর্ধান আসন্ন হলে সিদ্ধান্ত জরুরি হবে। তখন তিনটির কোন্‌টি গ্রহণ করবেন ? তার চেয়ে ইংরেজীকে বহাল রাখাই শ্রেয় নয় কি ?

তামিলনাড হচ্ছে ভারতীয় ইউনিয়নের পূর্বপাকিস্তান। তাকে হজম করাও যাবে না, উগরে ফেলাও যাবে না। তার খাতিরে ইংরেজীকে বহাল রাখতে হবে, আর নয়তো তামিলকেও হিন্দীর সঙ্গে সমমর্যাদা দিয়ে ভারতের অন্যতম সরকারী ভাষা করতে হবে। বলা বাহুল্য তামিলকে সেরূপ মর্যাদা দিলে তেলুগু কন্নাডিগ

মালয়ালমকেও অনুরূপ মর্যাদা দিতে হবে। বাংলা কী অপরাধ করল? ওড়িয়ারই বা কী অপরাধ? আর উর্দূরই বা অপরাধ কী?

ভারতীয় ভাষাগুলির সম্বন্ধে কয়েকটি গোড়ার কথা মনে রাখতে হবে। পাঁচশো বছর আগে হিন্দী উর্দূ একই ভাষা ছিল। দেড় হাজার বছর আগে হিন্দী বাংলা একাকার ছিল। পাঁচ হাজার বছর আগে হিন্দী ইংরেজী একই গর্ভে ছিল। কিন্তু দশ হাজার বছর উজিয়ে গেলেও হিন্দী তামিলের একই উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে না। আর্য ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষা কোনো কালেই একগোষ্ঠীভুক্ত ছিল বলে শোনা যায় না। যেখানে এক ভাষার সঙ্গে আরেক ভাষার ব্যবধান এত গভীর যে তার তল দেখা যায় না সেখানে কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ তামিল অভিধানে স্থান পেয়েছে বলেই হিন্দী তামিল বোন-বোন হতে পারে না। তা হলে তো উর্দূ আরবীও বোন-বোন। অতি বড়ো মুসলিমও বিশ্বাস করেন না যে উর্দূ আরবী একই বংশের ভাষা যদিও আরবী নাম সবাইকে দেওয়া হয়। তেমনি সংস্কৃত নাম সবাইকে দিলেও মুখের ভাষার পারিবারিক সম্বন্ধ প্রমাণ হয় না।

ইতিমধ্যেই তামিল থেকে সংস্কৃত বহিষ্কার শুরু হয়ে গেছে। হিন্দীপ্রেমীরাও কি আরবী ফারসী বহিষ্কার করছেন না? এই শুদ্ধিকরণ অব্যাহত থাকলে বিশুদ্ধ হিন্দী ও বিশুদ্ধ তামিল ক্রমশ সুমেরু কুমেরুর মতো পরস্পরের বিপরীত হবে। পোলারাই-জেশন পরিপূর্ণ হলে সে কি কেবল ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিবদ্ধ থাকবে? ইংরেজীর তপ্ত কটাহ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আমরা কোন আগুনে দগ্ধ হতে যাচ্ছি কে জানে। একই ইসুতে ইউরোপ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। ভারত ও পাকিস্তান কি খান্‌খান্‌ হবে না? ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি যদি অন্ধদের হাতে পড়ে তবে ধর্মান্ধরা যেমন দুইভাগ করেছে ভাষান্ধরাও তেমনি বহুভাগ করবে।

পুনরুক্তি

সংস্কৃত যখন সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ছিল তখন বাংলাদেশের কোনো নগর সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক রাজধানী ছিল না। যখন ফারসী ছিল তখনো না। এই সৌভাগ্য ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, এর জের চলে বিংশ শতাব্দীতে। শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী হবার ফলেই। ইংরেজীর বদলে হিন্দী যদি হয় সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বাহন তা হলে দিল্লী হবে কলকাতার বদলে সর্বভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী। এ নিয়তি খণ্ডাবে কে? বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করতে পারো, কিন্তু সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতা এর পর থাকবে না। এতে এক দিক দিয়ে লাভ হতে পারে, আরেক দিক দিয়ে ক্ষতি হবে। কারণ বাঙালীর মন সংকীর্ণ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই হতে আরম্ভ করেছে। বাঙালী আর সব রাজ্য থেকে হটে আসছে। ভিড় করছে অপরিসর পশ্চিমবঙ্গে। বাংলা মাধ্যমের ফলে সে আরো কোণঠাসা হবে। অগত্যা তাকে বরণ করতেই হবে হিন্দী মাধ্যম। প্রসারের শর্তই হবে তাই। এ নিয়তি খণ্ডাবে কে?

মাতৃভাষায় কি উচ্চতম শিক্ষা দেওয়া যায় না? যায় বইকি। এ বিষয়ে জাপানের চেয়ে আরো ভালো দৃষ্টান্ত হাতের কাছে রয়েছে। হায়দরাবাদে নিজাম তাঁর ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম করেন উর্দূকে। অনেকদিন পর্যন্ত। নিজাম বাহাদুরের খেয়াল ছিল না যে তাঁর প্রজাদের অধিকাংশের মাতৃভাষা উর্দূ নয়। মাতৃভাষায় উচ্চ শিক্ষা দিতে হলে দিতে হয় তেলুগু, কন্নাডিগ ও মরাঠী ভাষায়। উর্দূভাষীর সংখ্যা নগণ্য। সারা ভারতে শুনতে পাই আটান্নটি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মধ্যে চৌত্রিশটির মাধ্যম মাতৃভাষা। এর ফলাফল কী হবে তা আজ থেকে বলা শক্ত। ইংরেজীনবিশদের চেয়ে এইসব ছাত্ররা কি বেশি জাতীয়তাবাদী হবে, বেশি বিদ্বান হবে, বেশি সৃষ্টিশীল হবে? বিভিন্ন সাহিত্যে কি এদের কল্যাণে নবযুগের সূচনা হবে? এদের হাতে গণতান্ত্রিক মূল্যগুলি নিরাপদ হবে কি? সিভিলের উপর মিলিটারি চেপে বসবে না তো? কাজীর বিচার ফিরে আসবে না তো?

ইংরেজী শিক্ষা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। শুধু কয়েকটি পাঠ্যবিষয় নয়। মানুষের মনে অলক্ষে প্রবেশ করে ব্যক্তিস্বাধীনতা, মানবিক অধিকার, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক স্বাধিকার, আইনের শাসন, মিলিটারির উপর সিভিলের শ্রেষ্ঠতা, আচারের উপর বিচারের শ্রেষ্ঠতা, অথরিটির উপর যুক্তির শ্রেষ্ঠতা। এসব ক্ষেত্রে জাপানীরা কি আমাদের উপর টেক্কা দিয়েছে, না পরাধীনতা সত্ত্বেও আমরা

তাদের উপর টেক্কা দিয়েছি ? তাদের ইনটেলেকচুয়ালরা কি আমাদের ইনটেলেকচুয়ালদের চেয়ে বড়ো ? আর একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেবার আগে সব দিক যেন চিন্তা করি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজীর বদলে বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করলে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দীর জন্যে চাপ দেবে না, বিশ্ব কিংবা ভারত আশ্চর্য হবে না। বাইরে থেকে ছাত্র না এলেও ঘরের ছাত্রের সংখ্যা আরো বাড়বে। তাদের জন্যে বাংলা ভাষায় প্রচুর বই লেখা হবে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হবে। এ গেল জমার দিক। কিন্তু একটা খরচের দিকও আছে। সেটার উপর লোকের নজর পড়বে বিশ ত্রিশ বছর বাদে। ততদিনে ভুল যা ঘটে থাকবে তার আর সংশোধন চলবে না।

সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বাহন যখন ছিল সংস্কৃত তখন কেউ বাংলাদেশের দিকে তাকায়নি। বাঙালী ছিল না সংস্কৃতির নায়ক। নবদ্বীপে যেমন কতক পড়ুয়া আসত তেমনি মিথিলাতেও যেত। কাশী ছিল আরো বড় কেন্দ্র। ফারসী যখন সংস্কৃতির বাহন হলো তখনো সর্বভারতের দৃষ্টি বাংলাদেশের উপরে পড়েনি। বাঙালীর সুদিন এলো ঊনবিংশ শতাব্দীতে। একে তো সারা ভারতের রাজধানী কলকাতা, তার উপর ইংরেজী শিক্ষার প্রধান পীঠ, তার উপর আধুনিক সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চের চিত্রকলার ও বিজ্ঞানের অগ্রণী। ঊনবিংশ শতাব্দীর জের টানল বিংশ শতাব্দী। রাজনীতিতেও কলকাতার নেতৃত্ব অবিসংবাদী। তারপর রাজধানী স্থানান্তরিত হলো দিল্লীতে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে গেল গান্ধীজীর হাতে। কিন্তু অপরাপর গৌরব অস্তমিত হলেও শিক্ষার গৌরব সংস্কৃতির গৌরব দেদীপ্যমান রইল। রবীন্দ্র অবনীন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে তার নির্বাণ ঘটেনি ? পার্টিশনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিলয় ঘটেনি।

ইংরেজী যদি শিক্ষার মাধ্যম না হয়ে শুধুমাত্র একটি শিক্ষণীয় বিষয় হয় তাহলে লেখাপড়া হয়তো আরো ভালো হবে, সাহিত্যেও নবযুগ আসতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের গঙ্গাসাগরসঙ্গম আর বাংলাদেশে থাকবে না। থাকলে নামমাত্র থাকবে। কেউ সেখানে স্নান করতে আসবে না। জাতীয়তার দিক থেকে লাভ হতে পারে, আধুনিকতার দিক থেকে হবে না। সারা ভারতের লোক আর বাঙালীর দিকে তাকাবে না। কারণ বাঙালীরা হয়ে থাকবে যাকে বলে প্রভিন্সিয়াল। সংস্কৃতির নায়কত্ব পাত্রান্তরিত হবে। হিন্দীর উপরেই পড়বে সর্বভারতের দৃষ্টি। দিল্লীই হবে সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক রাজধানী। বাংলাদেশ তার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পারে, কিন্তু অগ্রণীত্ব রক্ষা করতে পারবে না। এত রকমের এত ইংরেজী বই আর কলকাতায় আমদানী হবে না। অবশ্যপাঠ্য ইংরেজীর জন্যে ক'খানাই বা কেতাব লাগে!

তাহলে কি আমি মাতৃভাষাকে উচ্চতম শিক্ষার মাধ্যম করার বিপক্ষে ? না,

তেমন কথা আমি বলিনি। বলব না। আমার বক্তব্য এই যে, লাভ আর লোকসান দুই পিঠই হিসেবের মধ্যে ধরতে হবে। ত্রিশ চল্লিশ বছর এগিয়ে ভাবতে হবে। শিক্ষার ফল সমাজের উপরে রাজনীতির উপরে শাসনব্যবস্থার উপরে কী প্রকার হবে সেটাও বিচার্য।

(১৯৩৬)

মানবিকবাদ প্রসঙ্গে

Humanism বা মানবিকবাদ বলতে অনেকে মনে করেন যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কথা, বিশ্বের সারা মানব জাতির কথাই এই শব্দটির দ্বারা বলা হচ্ছে। কিন্তু এর একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে। মানবিক হচ্ছে মানববিষয়ক। যেমন দিব্য হলো দেববিষয়ক। বা ভাগবত যেমন ভগবান বিষয়ক। সংখ্যা এখানে অবান্তর।

আমরা জানি যে পৃথিবীতে বহু নূতন জিনিস, অজস্র নূতন তথ্য, নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে গ্রীসদেশ। প্রাচীন গ্রীসদেশই একদা বিশ্বসভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ছিল। আমাদের দেশে ও দেশের বাইরে যখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রথম শুরু হয়, তখন গ্রীসদেশের সাহিত্যিকগণ মানবিকবাদের তরঙ্গ তোলেন তাঁদের সাহিত্যে ও চিন্তায়। তারপর নানা ঐতিহাসিক কারণে গ্রীসদেশের সভ্যতা লুপ্ত হয়ে যায়। ফলে সেই সঙ্গে মানবিকবাদের ধারাটিও লুপ্তপ্রায় ছিল। বহুকাল পরে ইউরোপে দেখা দিল এক আশ্চর্য চেতনা। শিল্পের সাহিত্যের জীবনের চিন্তার নব নব মূল্যায়ন শুরু হলো এই যুগে। এই যুগকে বলা হলো 'রেনেসাঁস' বা নবজন্ম। প্রচলিত বহু ধারণা, বহু চিন্তা ও সত্যমূল্য নিরূপণের দৃষ্টি বদলে গেল। সব কিছুর মধ্যে শুরু হলো নূতন মূল্যবোধের সন্ধান আর তার প্রতিষ্ঠা। ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য, এমন কি মানবমনের, মানব জীবনের নূতন ব্যাখ্যাও শুরু হলো এই রেনেসাঁসের যুগে। মানুষের জ্ঞানের পরিধি, চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকল। মানুষের সভ্যতারও পথ গেল বদলে। এবং এই রেনেসাঁসের যুগে ইউরোপে humanism শব্দটি বা ধারণাটি আবার প্রচারিত হতে লাগল সেদেশের শিল্পবোধে, সাহিত্যে ও মননে। এটা আধুনিক সভ্যতার মূল লক্ষ্য। মানুষই সে সভ্যতার মূলকথা, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু তার মধ্যে থাকবে না। মানব চিন্তা ছাড়াও তার মধ্যে অন্য চিন্তা থাকতে পারে।

রেনেসাঁসপূর্ব যুগে মানুষ মনে করত যে দেবতা বা ঈশ্বর মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিমান এবং পূজনীয় তথা মহৎ। ইউরোপের সঙ্গে আমাদের দেশেও এই ধারণা ছিল যে মানুষ কিছুই নয়। ঈশ্বরই মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং ঈশ্বরের দয়ায় ও আশীর্বাদে মানুষ পৃথিবীতে আজো টিকে আছে। কিন্তু ইউরোপে রেনেসাঁস যুগে দীর্ঘদিনের এই মতবাদটিকে অস্বীকার করা হলো। বলা হলো মানুষ ছাড়া অন্য কোনো স্বনির্ভর সত্য নেই। ঈশ্বর বা ভগবান মানুষের সত্তার উপর নির্ভর। আমরা প্রত্যক্ষভাবে মানুষকেই দেখছি। মানুষ জন্মায় এবং মানুষ মারা যায়। মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে ভাবতে পারি। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে ভাবতে পারিনে, দেখতে

পারিনে। সুতরাং মানুষই একমাত্র প্রত্যক্ষ সত্য। আমাদের দেশের কবিও বললেন "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

প্রাচীনযুগে বৌদ্ধরাও বলতেন যে দেবদেবী আছেন বটে, তবে বুদ্ধই সকলের অপেক্ষা বড় এবং শ্রেষ্ঠ। তিনি মানুষ। ভগবান বা দেবতা নন। হিন্দুরা তাঁকে পরে অবতার কল্পনা করেছে। তাতে তাঁর উচ্চতা বাড়েনি। কমেছে।

এর পর যখন বিজ্ঞানের যুগ এলো তখন বলা হলো যে পৃথিবী একটা গ্রহ আর সেটা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। ভৌগোলিক আবিষ্কারকগণ বললেন যে পৃথিবী ঘুরে দেখা গেল পৃথিবীটা গোল। দেব দেবী বা স্বর্গ নরক এসব কিছুই দেখা গেল না। যা দেখা যাচ্ছে তা হলো মানুষ। যদি ঈশ্বর বলে কোনো কিছু থাকে তবে তা দৃশ্যের বাইরে। তখন খ্রীষ্টীয় চার্চের প্রভাব খুবই বেশী। বাইবেলবিরোধী তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার করার অপরাধে অনেককেই দণ্ড পেতে হলো, কতককে প্রাণ দিতে হলো। শাস্ত্রের বা ধর্মগুরুর বাক্যের উপর বিশ্বাস না করে যাঁরা প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভর করে দাঁড়ালেন, তাঁদের নূতন পরিচয় হলো humanist বা মানবিকবাদী। তাঁরা শাস্ত্রীয় বা ধর্মীয় শিক্ষা উপেক্ষা করে সব কিছুকেই যুক্তির দ্বারা পরীক্ষা ও বিচার করতে চাইলেন। তাঁরা বললেন যে ভূগোলে বিজ্ঞানে বা ইতিহাসে স্বর্গ নরক ঈশ্বর বা শয়তান বলে কোনো কিছু নাই। যা আছে তা হলো মানুষ। মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিচার বিবেক তাকে যা মূল্য দিতে বলে তা ছাড়া আর কোনো মূল্য দিতে তাঁরা অস্বীকার করলেন। খ্রীস্টান চার্চের মতে মানুষ মৃত্যুর পরে পরমেশ্বরের শেষ বিচারের পর স্বর্গে যাবে অথবা নরকে যাবে। মর্ত্য সুখ তার জন্যে নয়। মানবিক-বাদীরা সেটি অস্বীকার করেন। তাঁরা বলতে থাকলেন যে তাঁরা কাল্পনিক স্বর্গীয় সুখে বিশ্বাসী নন। মানুষের জীবনেই পৃথিবীর বিচিত্র আনন্দকে আস্বাদন করে সার্থকতা লাভ করবেন। মানুষ ও মানব জীবনের এই যে সার্থকতা এর উপর ধর্মযাজকরা এতকাল পাহারা দিয়েছিলেন। মধ্যযুগের মানুষ ছিল নজরবন্দী। প্রাচীন গ্রীকদের মতো আনন্দময় জীবন নিয়ে বাঁচতে হবে। মধ্যযুগীয় খ্রীস্টানদের মতো নিরানন্দ জীবন চাইনে। বন্ধ দুয়ার ভাঙতে হবে। নিষিদ্ধ ফল খেতে হবে। এটিই হলো রেনেসাঁসের মূল সুর।

'সবার উপরে মানুষ সত্য' ঐ কথাটিও সর্বমানব সম্বন্ধে বলা হয়নি। প্রত্যেকের মধ্যে যে মানবসত্য আছে সেই মানবসত্য সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। আমাদের দেশের মতোই একদা প্রাচীন ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায় যে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন বাইরের দেবদেবীগণ। রেনেসাঁস এই ধারণাটাকে ভেঙে দিল। মানবিক-বাদীরা বললেন মানুষকে বিপদ থেকে দেবদেবীগণ রক্ষা করেন এটা ভুল। আমাদের দেশেও মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেখা যায় যে মানুষ যখন বিপদে পড়ে ডেকেছে দেবদেবীগণ তাদের বিপদ দূর করে দিয়েছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের পর আমাদের দেশে যে আধুনিক সাহিত্য লেখা হলো তাতে আর দেব দেবীদের ডাকা হলো না, তাঁরাও এসে ঘটনায় হস্তক্ষেপ করলেন না। মধ্যযুগের সাহিত্য মানবিক-

বাদী সাহিত্য নয়। আধুনিক সাহিত্য মানবিকবাদী সাহিত্য। আমরা পৃথিবীকে মানবিক ভাবতে শিখলুম। অলৌকিক ভাবতে আস্তে আস্তে ভুলে গেলুম। আমরা ক্রমশ মানবমুখীন হয়ে পড়লুম।

রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর ও মানুষ দুইই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্যভাবনায় তিনি মানবিকবাদী। তিনি জানতেন যে দেবতা মানুষকে রক্ষা করেন না। মানুষই স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা, বীর্যের দ্বারা, জ্ঞানবিজ্ঞানের শক্তির দ্বারা নিজেকে রক্ষা করছে এবং করবেও। মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করবার জন্যে দেবতা বা ঈশ্বর চাই-ই একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতেন না। রবীন্দ্রসাহিত্যের সুর মানুষের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাসের সুর। এই মানববিশ্বাসের রেনেসাঁসধর্মী ঐতিহ্যকেই তিনি এগিয়ে দিলেন। তিনি humanist tradition-এ মানুষ। পরিপূর্ণ জীবনবাদী। বন্ধ দুয়ার ভেঙে ফেলার পক্ষপাতী তিনি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য পাঠ করে এবং তাঁর জীবন দর্শনে আমরাও তাই মানবিকবাদী হয়ে গেলুম। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তী সাহিত্য-সেবীগণও এই ভাবাদর্শ অনুসরণ করে মানবিকবাদী হয়ে পড়লেন। তাঁদের জীবন এবং সাহিত্যও মানবজীবনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠল।

প্রাণরক্ষার ও বংশরক্ষার অধিকার

মানবমাত্রেরই দুটি মৌল অধিকার আছে। একটি তো তার বাঁচবার অধিকার। আর একটি তার বংশরক্ষার অধিকার। এটা শুধু কায়িক অর্থে নয়, মানসিক বা সাংস্কৃতিক অর্থেও বটে। রবীন্দ্রনাথের বংশ রবীন্দ্ররচনাবলী তথা বিশ্বভারতী তথা অশেষ কীর্তি, যা জীবিত থেকে তাঁকে জীবিত রাখবে, তাঁর বাণীকে জীবিত রাখবে। তেমনি মহাত্মার বংশ তাঁর গ্রন্থমালা, তাঁর আশ্রম, তাঁর বিবিধ প্রতিষ্ঠান, তাঁর অগণিত স্মৃতিচিহ্ন। এ সকলের মধ্যে তিনি জীবিত আছেন, কেউ যদি ধ্বংস না করে তবে জীবিত থাকবেন। যে কোনো মহাপুরুষের বেলাই একথা খাটে। এমন কি সাধারণ মানুষের বেলাও একথা সত্য। বাঁচবার অধিকার তথা বংশরক্ষার অধিকার সার্বজনীন অধিকার। এ দুটি অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না।

বাইশ বছর আগে মহাত্মা গান্ধীর বাঁচবার অধিকার হরণ করে একদল পিতৃহন্তা যে অমানুষিক অপরাধ করেছিল আর-একদল পিতামহহন্তা এখন তারই পরিসমাপ্তি ঘটাতে উদ্যত হয়েছে। সুযোগ পেলে এরা মূর্তিভঙ্গও করবে। মহাত্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি প্রতিক্রিয়াশীল। তিনি যে অর্থে প্রতিক্রিয়াশীল সে অর্থে আরো হাজার হাজার মুনি ঋষি জ্ঞানী গুণী কবি চিত্রকর প্রভৃতিও প্রতিক্রিয়াশীল। এইরূপ হাজার হাজার জনের জীবননাশ ও বংশনাশ করলে সংস্কৃতি বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। অন্ধকারযুগ নেমে আসবে।

সাম্যবাদীরাও মানবিকবাদী। তাঁরা মানবের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকেই তার ঐতিহাসিক মূল্য দেবার জন্যে অবিকৃতভাবে রেখে দেন। টলস্টয় বা চেকভের সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া অতি যত্নের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যেকটি উক্তি রক্ষা করছে। কমিউনিস্ট চীনদেশ তার কনফুসীয় তথা বৌদ্ধ ঐতিহ্যের থেকে বহুদূরে সরে এলেও অতীতের বিলোপ ঘটায়নি। এত বড়ো গুরুতর অপরাধ আর কোনো দেশের সাম্যবাদীরা করেননি। করেছে একমাত্র ফাসিস্টরা। সাম্যবাদী বলে যারা পরিচয় দিচ্ছে তাদের কার্যকলাপ কিন্তু ফাসিস্টদের মতো। মানবিকবাদী হলে এরা অমন কাজ করত না।

জার্মান কবি হাইনে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আজ যারা বইপত্র পোড়াচ্ছে একদিন তারা মানুষকেও পোড়াবে। হিটলারী আমলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্যাস চেম্বারে পুরে যেভাবে মারা হলো সেটাও একপ্রকার পোড়ানো। সুতরাং সময় থাকতে সতর্ক হতে হবে এদেশের লোকের। বইপত্র পোড়ানো কেবল সম্পত্তিনাশ নয়। এ হচ্ছে প্রাণনাশের আদিপর্ব। লেখা হচ্ছে লেখকের রক্ত। লেখা ধ্বংস করা হচ্ছে

রক্তপাত করা। আমরা যারা লিখি তারা এই রক্তপাত সহ্য করতে পারিনে। এর নিন্দা করা উচিত। এতে বাধা দেওয়া উচিত। এদের বুঝিয়ে নিরস্ত করা উচিত।

দুই

আমাদের মনীষীদের কারো মূর্তি ভাঙা হচ্ছে, কারো মূর্তির মুখে আলকাতরা মাখানো হচ্ছে। কারো প্রতিকৃতি পোড়ানো হচ্ছে, কারো বই পোড়ানো হচ্ছে। কোথাও কেউ প্রতিরোধ করতে সাহস পাচ্ছে না। যদি বোমা পড়ে। এমন কী, প্রতিবাদ করতেও লোকে ভয় পায়। চাচা, আপনা বাঁচা।

দেশের সাংস্কৃতিক সম্পদ একবার ধ্বংস হলে পরে আর পুনরুদ্ধার হয় না। একখানার জায়গায় আর-একখানা ছবি আঁকিয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই ছবিখানা তো নয়। তেমনি একটি মূর্তির জায়গায় আর একটি মূর্তি গড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই মূর্তি তো নয়। সেই বই অবশ্য আবার ছাপিয়ে নেওয়া যায়, যদি একটিও কপি আস্ত থাকে। কিন্তু সেই সংস্করণ তো নয়। প্রত্যেকটি সাংস্কৃতিক কর্মের বা কীর্তির মধ্যে একটি অপূরণীয়তা আছে। সেটা আছে বলেই সেটার মূল্য এত বেশী।

যাদের মূল্যবোধ বিকৃত বা অসাড় তারা ধ্বংসের কাজটাই করে দিয়ে যায়। সৃষ্টির দায় নেয় না। সে ক্ষমতা বা সে প্রতিভাই নেই। সব কিছুই তাদের কাছে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রকাশ। আর বুর্জোয়া সংস্কৃতি হলেই তা একদম পচা, একেবারেই প্রতিক্রিয়াশীল। শ্রমিকের কাছে তা হারাম, কৃষকের কাছে তা গোমাংস।

গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, আশুতোষ এঁরা এমন কী অপরাধ করেছিলেন যে এঁরা অবমাননার যোগ্য হবেন ? এদের কীর্তিলোপ বা সূক্ষ্ম অর্থে বংশলোপ করা হবে ? প্রাণরক্ষার প্রশ্ন এদের বেলা ওঠে না কারণ এঁরা এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু কীর্তিরক্ষা বা সূক্ষ্ম অর্থে বংশরক্ষার প্রশ্ন কি উঠবে না ? এদের যদি কীর্তি লোপ হয় তা হলে এঁদের গায়ে লাগবে না, এঁরা এখন তার ঊর্ধ্বে। কিন্তু আমরা যাঁরা এঁদের কীর্তির মূল্য বুঝি তাদের গায়ে লাগবে না ? এঁদের বাণীর মূল্য যদি এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গিয়ে না থাকে তবে সে মূল্য বিনষ্ট হতে দেখলে আমাদের কারো মনে লাগবে না ?

কতগুলো মিথ্যা এখন মানুষকে সত্যের মুখোশ পরে বিভ্রান্ত করছে। তার মধ্যে এটাও একটা যে আমাদের মনীষীরা বুর্জোয়া সংস্কৃতির ধারক আর বাহক আর যেহেতু এটা বুর্জোয়া সংস্কৃতি সেহেতু এটা প্রতিক্রিয়াশীল ও পচা। ফরাসী ভাষায় বুর্জোয়া বলতে যাদের বোঝায় তারা প্রধানত কলকারখানার মালিক, দোকানদার, ব্যবসাদার, ব্যাঙ্কার বা পরের ধনে ধনী। সে রকম একটা শ্রেণী গড়ে উঠতে ইউরোপের ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রায় দু'শো বছর লেগেছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই শ্রেণী শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে উঠেছে। আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লব হলোই বা কবে, বাঙালীরা তার সুযোগ নিলই বা কবে ? প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে

শুরু করলে প্রায় অর্ধশতাব্দী হলো আমদের এদেশেও বুর্জোয়ার উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় সেই বুর্জোয়া পরিবারগুলিকে আস্ত একটা সমাজ বলা যায় না। সংস্কৃতির উপর তাদের অভাব অতি ক্ষীণ।

মধ্যবিত্ত বলে আর একটা কথা আছে। এটা বুর্জোয়ার সমর্থক নয়। অনেক সময় বোঝবার ভুলে আমরা মধ্যবিত্তকেই বুর্জোয়া বলে চালিয়ে দিই। মধ্যবিত্তরা সাধারণত চাকুরিজীবী। বেশীর ভাগই কেরানী বা শিক্ষক। সুদ, মুনাফা, খাজনা বা বাড়ী থেকে যারা বড়লোক তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। সেই ক'জনকে বুর্জোয়া বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু অধিকাংশ মধ্যবিত্তের আয়ের উৎস হচ্ছে মাসের শেষে মাইনে। উকিল বা ডাক্তার হয়ে থাকলে ফী। তাঁদের মধ্যে ক'জনেরই বা হাতে টাকা জমে, জমানো টাকা থেকে আরো টাকা আসে। বুর্জোয়ার প্রধান লক্ষণ হলো টাকা থেকে আরো টাকা। বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ইতিহাস সেরকম নয়। এই শ্রেণীকে বুর্জোয়া আখ্যা দিলে শুধু যে এর প্রতি অবিচার করা হয় তাই নয়, শব্দটারই অপব্যবহার করা হয়।

সম্ভবত এদেশেও একটা বুর্জোয়া শ্রেণী গড়ে উঠবে। যেমন ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এমন একটি শ্রেণীর পিণ্ডি মধ্যবিত্তদের ঘাড়ে চাপবে কেন? মাইকেল, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ কেন তাদের হয়ে জবাবদিহি করবেন? রবীন্দ্রনাথের রচনায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রভাব কোথায়? কবে তিনি তাদের মনের কথাটাই ব্যক্ত করলেন? আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে মধ্যবিত্তদের বন্ধু বলতে পারা যায়, কিন্তু বুর্জোয়াদের তিনি কেউ নন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানের বিস্তার, সেইসঙ্গে চাকরির একটা হিল্লে। কলকারখানা, আমদানী রপ্তানী, ব্যাঙ্ক ইনশিওরান্স ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি থাকলে তিনি ঘরে ঘরে গ্রাজুয়েট সৃষ্টি করতেন না। যার ফলে গ্রাজুয়েটের চাহিদার চেয়ে জোগান গেল বেড়ে, বাজারদর এসে চল্লিশ টাকায় ঠেকল। তাও দুর্লভ।

বাংলার মধ্যবিত্তরা ভুল নিশ্চয়ই করেছেন অনেক। কিন্তু এ ভুলটা করেননি যে সংসারে অর্থোপার্জন ও অর্থবৃদ্ধিই হবে মুখ্য, জ্ঞানলাভ ও সৌন্দর্যসৃষ্টি হবে গৌণ বা তুচ্ছ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বদনাম ছিল যে তিনি বাঙালীর ছেলেকে মাড়োয়ারি করতে চান। এ কালের পরিভাষায় বুর্জোয়া করতে চান। না, বাংলার মনীষীরা তাদের বুর্জোয়া করতে চাননি। মধ্যবিত্ত করতে চেয়েছিলেন। একালে যাদের বলা হয় নিম্নমধ্যবিত্ত। তবে একেবারে নিঃস্ব করতে চাননি। না, শ্রমিক বা কৃষক করতেও নয়, সেটা গান্ধীবাদী চিন্তা।

গান্ধীবাদী চিন্তাও কমিউনিজমের দোসর। কমিউনিজমের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেবার জন্যে গান্ধীজী কঠোর কায়িক শ্রমের উপর ও নির্লোভের উপর জোর দেন। তাঁর শিক্ষা ক'জনই বা বুঝেছে বা নিয়েছে! নিলে ইতিহাস অন্যরূপ হতো। অথচ সেই মানুষের প্রতিকৃতি যত্র তত্র দগ্ধ হচ্ছে। যেহেতু তিনি ধনকুবেরদের বন্ধু। বন্ধু তো তিনি দীনতমদেরও ছিলেন। অস্পৃশ্যদেরও ছিলেন। অবলাদেরও ছিলেন।

কুষ্ঠরোগীদেরও ছিলেন। বন্ধু তিনি সর্বশ্রেণীর। কিন্তু কী করে এ ধারণা জন্মায় যে তিনি শোষণের সমর্থক ছিলেন ?

গান্ধীজীর কথা থাক। বাংলার মনীষীদের কথাই বলা যাক। সকলেই এঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতের সংস্কৃতি চিরকালের। কিন্তু সেইসঙ্গে আবার অনেকেই বিশ্বাস করতেন যে আধুনিক ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মেলবন্ধন করা অত্যাবশক। এর থেকেই আসে ইংরেজী শিক্ষার রুচি। বাঙালী একদিন ইংরেজী শিক্ষায় গভীর আনন্দ পেয়েছে। তার সেই আনন্দ প্রকাশ করতে চেয়েছে ইংরেজীতে সাহিত্য সৃষ্টি করে। পরে তার আনন্দ প্রকাশের মাধ্যম হয় বাংলা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টারা সকলেই ইংরেজী শিক্ষার সুফল। যে সংস্কৃতি তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিল সে সংস্কৃতি ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কল্পনা ও মনন। যে সংস্কৃতি তাঁদের হাত দিয়ে সৃষ্ট হলো তার সঙ্গে মেশানো ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার ও আদর্শ। এমনি করে ঘটে আমাদের রেনেসাঁস, তার সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয় রেফরমেশন অর্থাৎ ধর্মসংস্কার। ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত সুবিধার জন্যে রামমোহন বা বিদ্যাসাগর দেশবাসীর ক্রোধের ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হননি। কত লোক যে সমাজের হাতে মার খেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র শতখানেক বছর আগেই লিখেছেন 'সাম্য'। সাম্যবাদী ইশ্‌তাহার-হিসাবে তখনকার দিনে অভূতপূর্ব। দেশ তাঁর 'আনন্দমঠ''কে নিল, "বন্দেমাতরম্‌"কে নিল, কিন্তু 'সাম্য'কে নিল না। নেবার সময় হয়নি বলে। কিন্তু তাঁর কাজ তিনি করে গেছেন। সে কাজ বুর্জোয়ার নয়, দূরদ্রষ্টা ও ঋষির কাজ। প্রমথ চৌধুরী অর্ধশতক আগে "রায়তের কথা" লেখেন। দেশ তখন নিল না, এখনো কি সমস্তটা নিয়েছে ? তাঁর কথাভাষা সংক্রান্ত প্রস্তাব এতদিনে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু ভূমিসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব এখনো ঝুলছে।

স্বামী বিবেকানন্দ তো অন্ত্যজদের ভাই বলে ভাবতে বলে গেছেন। বহুদূর থেকে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে ইতিহাসের শূদ্রযুগ আসন্ন। সোশিয়ালিজমকেও তিনি আবাহন করে ধরে তুলতে চেয়েছিলেন। দেশ তখন প্রস্তুত ছিল না, নামটাও জানত না, তত্ত্বটাও অজানা। দেশ যদি সত্যি সত্যি সোশিয়ালিজমের পক্ষপাতী হয় তবে স্বামীজীকে বিপক্ষের লোক মনে করে আলকাতরা মাখাতে পারে না।

তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া যায় যে বুর্জোয়া সংস্কৃতি এদেশের শ্রমিক ও কৃষকদের বর্জনীয় আর সেই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক যাঁরা তাঁরা দণ্ডনীয় তা হলেও একবার তো বিচারকের ভূমিকা নিয়ে বিচার করতে হয়। তার আগেই সরাসরি জল্লাদের ভূমিকা নিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কি সামাজিক ন্যায়ের নমুনা ? মারতে চাও মারো, তার আগে বিচার তো একবার করো, আসামী তরফের কথাটা তো একবার শোন, তাঁদের আত্মরক্ষার সুযোগ তো একবার দাও।

বিচারে যদি সাব্যস্ত হয় যে বিবেকানন্দ যে অপরাধ করেছেন তার যথাযোগ্য শাস্তি তাঁর মূর্তির মুখে আলকাতরা লেপন বা আশুতোষ যে অপরাধ করেছেন সে

অপরাধের উপযুক্ত সাজা তাঁর মুণ্ডপাত তা হলে আমরা আর তর্ক না করে ভাবীকালের উচ্চতর আদালতে আপীল দায়ের করে ক্ষান্ত হব। ভাবীকালের বিচারের উপর আমাদের আস্থা আছে। একালের বিচারের উপরেই বা থাকবে না কেন! মানুষ যদি নিতান্তই অবুঝ না হয় তো একালেই তাকে বোঝানো সম্ভব যে নির্বিচার হিংসার নাম সামাজিক ন্যায় নয়। সামাজিক ন্যায় যারা চায় তাদেরও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। আগে সম্যক বিচার, তারপর সম্যক দণ্ড।

আমাদের তরুণদের মধ্যে এ পরিমাণ অন্ধতা বা হিংসা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। এতে এদের নিজেদেরই মামলা দুর্বল হচ্ছে। ফলে মামলায় এদের হার হবে। ইতিহাস তো এখনই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। গোড়ার দিকে ফাউল করতে করতে যে জেতে আখেরে যে তারই জিত হয় তা নয়। তাই যদি হতো তবে হিটলারের ব্লিৎসক্রিগ ও তোজোর পার্ল হারবারই তাদের জয় পাকা করত।

আমরা বোমার বদলে বোমায় বিশ্বাস করিনে, কিন্তু তলোয়ারের বদলে কলমে বিশ্বাস করি। তলোয়ার যা পারবে না কলম তা পারবে। কলম হচ্ছে তলোয়ারের চেয়েও জোরদার। এই পরিস্থিতিতে লেখকদের কর্তব্য বিচারবিমুখদের বিচারে প্রবৃত্ত করা ও হিংসাব্রতীদের হিংসার থেকে নিবৃত্ত হতে বলা।

দ্বিধাদীর্ণ মানস

পাঁচ পুরুষ পূর্বে এদেশে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। তখন থেকেই আমাদের শিক্ষিত মহলের রাজনৈতিক চিন্তা দ্বিধাদীর্ণ। এক ভাগের আদর্শ ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসী ও তার ধাপে ধাপে বিবর্তন। আরেক ভাগের আদর্শ ফরাসী বিপ্লব ও তার রক্তাক্ত উন্মাদনা।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্তনের অল্পদিন পরে টমাস পেইনের 'যুক্তির যুগ' কলকাতার বন্দরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই এক টাকা দামের বই পাঁচ টাকায় বিকিয়ে হাওয়া হয়ে যায়। তখনকার পক্ষে ও বই ছিল দারুণ বৈপ্লবিক। এখনকার দিনে মাও ৎসে-তুং মহোদয়ের চিন্তার মতো। সমান জনপ্রিয় ছিল টমাস পেইনের 'মানুষের অধিকার'।

ডিরোজিওর ছাত্ররা এ সব বই পড়তেন। শুধু এ সব বই নয়, ভলতেয়ার, হিউম, লক ইত্যাদির লেখাও। এমনি করে পাশ্চাত্ত্য রাজনৈতিক চিন্তার দুটি ফসলই বাংলার মনের মাটিতে আবাদ হতে শুরু করে। বলা বাহুল্য বেশীর ভাগ চিন্তাশীলই ইংলণ্ডের মতো পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসীর ভক্ত।

এখানে বলে রাখতে চাই যে, ফরাসী বিপ্লবের গোড়ার দিকের নায়করাও ছিলেন ইংলণ্ডের মতো একটি সংবিধানের অনুরাগী। যে সংবিধান রাজাকেও রাখে মাথার উপরে। যাজক ও অভিজাতদেরও রাখে সাধারণের সঙ্গে। রাজার মাথা কাটা জমিদারদের জমি কেড়ে নেওয়া যাজকদের সঙ্ঘটাকেই অস্বীকার করা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। ঘটনাচক্র কিন্তু সেই দিকেই ঘূর্ণিত হয়। ঘটনার পিঠে সওয়ার হয়ে বসেন আরেক দল নায়ক, পরে আরো একদল। তখন দেখা গেল ফরাসীরা আর ইংরেজদের অনুগমন করছে না। করছে রুশো ভলতেয়ার দিদেরো প্রভৃতি ফরাসী ভাবুকদের। তখন সেটা বিপ্লবের মর্যাদা পায়।

বাংলাদেশের বিপ্লববাদী তরুণরা সরাসরি রুশো, ভলতেয়ার প্রমুখ ফরাসী চিন্তানায়কদের সঙ্গে আত্মীয়তা পাতায়। বিপ্লবী তত্ত্বটা উপলব্ধি করে। কিন্তু তার কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে না। অপর পক্ষে যারা ইংলণ্ডের রাজনৈতিক বিবর্তনের অনুরূপ কিছু চায় তারা আন্দোলন শুরু করে দেয়, যাতে আইনের শাসন, সিভিল লিবার্টি, মিউনিসিপ্যাল স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয় ও তারা অংশীদার হয়।

কর্মকাণ্ডের অভাবে বহুকাল পর্যন্ত বিপ্লবী চিন্তা নিষ্ক্রিয় থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের দিনও তার কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই। তবে সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্বে দুজন বাঙালী ছাত্র তাদের কলেজ ম্যাগাজিনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের

কল্পিত কাহিনী লিখেছিল। সেটা নিছক ইংরেজবিরোধী। সামাজিক পরিবর্তনের আভাস ছিল না তাতে।

ফরাসী বিপ্লবের মূল সুরটি হল সমাজে বিশেষ সুবিধাভোগী বলে পুরুষানুক্রমিক কোনো শ্রেণী থাকবে না। না ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয় না বৈশ্য। না অভিজাত, না বুর্জোয়া। ফরাসী বিপ্লব যখন হয় তখন বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব প্রতিপত্তি অভিজাত বা যাজকশ্রেণীর তুলনায় অল্প ছিল। শিল্পবিপ্লব বলে আর একটি বিপ্লব এসে বুর্জোয়াদের বিত্ত বৈভব প্রভাব প্রতিপত্তি সব কিছু বাড়িয়ে দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের এদেশে শিল্পবিপ্লবের নামগন্ধ না থাকায় আমাদের বিপ্লবী চিন্তা বুর্জোয়া-বিরোধী ছিল না। ছিল অভিজাত ও যাজক-বিরোধী।

ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মণ সভ্যরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপবীত বর্জন করেন। উপবীত বর্জন করে তাঁরা সন্ন্যাসী হন না। গৃহীই থাকেন। তাঁদের এই কর্মটি একপ্রকার বৈপ্লবিক কর্ম। মাঝখানে ফরাসী বিপ্লব না ঘটে থাকলেও সেই ভাব এদেশে পৌঁছে না থাকলে ও এদেশের চিত্তকে সরস না করে থাকলে ব্রাহ্মণ সন্তানরা উপবীত ত্যাগ করে শূদ্রের সঙ্গে বিবাহাদি করতেন না। এ শুধু অনুলোম বিবাহ নয়। প্রতিলোমও। কিন্তু দুই পক্ষই ব্রাহ্ম বলে অনুলোম প্রতিলোমের প্রশ্ন ওঠে না। বর্ণভেদই ওঁরা মানেন না। এরও উৎস ফরাসী বিপ্লব।

সমাজে শূদ্রের মহত্ত্ব বেড়ে যায়। ফরাসী দেশে চাকরকেও বলা হয় "আপনি"। এদেশে কেউ তত দূর না গেলেও "তুই" থেকে "তুমি" ক্রমশ চল হয়। বয়ঃকনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বয়োজ্যেষ্ঠ শূদ্রকে আশীর্বাদ করার অধিকারী ছিল, নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণও উৎকৃষ্ট শূদ্রের প্রণাম পাবার যোগ্য ছিল। এখনো সে মনোভাব সম্পূর্ণ দূর হয়নি। দূর হতো যদি ফরাসী বিপ্লব এদেশে ঘটে থাকত। পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে বৈপ্লবিক তত্ত্বের হাওয়া লেগে হয়েছে। কর্মকাণ্ডের আঁচ লেগে হয়নি।

ফরাসী বিপ্লবে রক্তপাত প্রচুর ঘটেছিল বলে হঠাৎ মনে হতে পারে রক্তপাতটি বিপ্লব। তা নয়। বিপ্লব হচ্ছে চাকা ঘুরে যাওয়া। চক্রের আবর্তন বা রেভলিউশন। যেখানে চক্রের আবর্তন ঘটল না, ঘটল শুধু রক্তপাত সেখানে সেটা বিপ্লব নয়, সেটা মানুষের আদিম রক্তপিপাসার নিবৃত্তি। মৃত্তিকাকে উর্বরা করার জন্যে নরবলির রেওয়াজ কোনো কোনো উপজাতির মধ্যে আছে। সভ্যজাতিও মাঝে মাঝে যুদ্ধের নামে নরবলি দেয়। বিপ্লবও তেমনি একটি আদিম ক্রিয়াকাণ্ড হতে পারে। চক্রাবর্তন নয়।

বিশ-ত্রিশ হাজার বা বিশ-ত্রিশ লক্ষ মানুষকে প্রাণে মারলেই অমনি কোটি কোটি মানুষের জীবনধারা বদলে যায় এটা একটা কুসংস্কার। বৈজ্ঞানিক চিন্তা নয়। ফরাসী বিপ্লবের ও এই কুসংস্কার রক্তপাতের নিরিখে প্রগতির হিসাব করেছিল।

ফরাসী বিপ্লবের নায়করা যা চেয়েছিলেন তার জন্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ও তার উপর কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল। রাষ্ট্রই ছিল তাঁদের কাছে সামাজিক পরিবর্তনের

অক্ষ। যেখানে রাষ্ট্র নেই বা তার উপর এক্তার নেই সেখানে সামাজিক পরিবর্তন হতে পারে না। কারণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উপবীত বর্জনের মতো সৎসাহস সকলের নেই, থাকলেও তার সীমা আছে। অপর পক্ষে রাষ্ট্র তার দণ্ডনীতির প্রয়োগে ঘোরতর ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আর সে পরিবর্তন বৈপ্লবিক হতে পারে।

রাষ্ট্র আমাদের হাতে ছিল না। কোনো দিন আসবে এটা ভাবতেও পারা যেত না। রাষ্ট্রকে ধর্তব্যের মধ্যে না এনে কত দূর যাওয়া যায় সেইটেই ছিল আমাদের চিন্তাশীলদের ধ্যান। ব্রাহ্মসমাজ রাষ্ট্রের জন্যে অপেক্ষা না করে বর্ণভেদ রহিত করার চেষ্টা করেছে, তার নিজের পরিসরের ভিতরে পেরেছেও। তেমনি নরনারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। ব্রাহ্মনারীদের মধ্যে একদল 'দেবী' ও একদল 'দাসী' ছিলেন না। ব্রাহ্মণবংশীয়া ব্রাহ্মিকাদের কেউ কেউ 'দেবী' ছিলেন তা ঠিক কিন্তু 'দাসী' একজনও না। তাঁরা পাশ্চাত্য প্রথায় স্বামীর বা পিতার পদবী ধারণ করেন। এটা পশ্চিমিয়ানা নয়। এটা সাম্যবাদের প্রয়োগ।

ওদিকে পার্লামেন্টারি ডেমক্রাসীর প্রবক্তাদের কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ইংরেজের হাতে থাকে থাকুক প্রজার অধিকার যেন ভারতীয়দের হাতে থাকে। তারা যেন আইনসভায় প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, তাঁরা যেন হন নির্বাচিত প্রতিনিধি, তাঁদের যেন সমালোচনার অধিকার থাকে, থাকে রদবদল করার অধিকার, পার্লামেন্টারি অপোজিশনের অধিকার থাকে। এইভাবে ধীরে ধীরে তাঁদের চিন্তাও রাষ্ট্রনির্ভর বা রাষ্ট্রকেন্দ্রিক হয়।

বলা যেতে পারে দুই চিন্তাস্রোতই রাষ্ট্রাভিমুখ। ব্রাহ্মসমাজের নেতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পার্লামেন্টারি ভাবধারার বাহক। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠামূলেও ছিল সেই ভাবধারার সিঞ্চন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে আসুক না আসুক পার্লামেন্টজাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান যদি প্রবর্তিত হয় আর সেখানে গিয়ে যদি আইন রদবদল করার অধিকার লাভ করা যায় তবে সেটাই বা কম কিসে ?

ওদিকে ফরাসী বিপ্লবের পর বৈপ্লবিক ভাবধারা নানা খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। সিণ্ডিকালিস্ট ও অ্যানার্কিস্টরা রাষ্ট্র নামক একটা সংস্থার প্রয়োজনই দেখতেন না। বিপ্লবের কাজ হবে রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করা নয়, ভেঙে খান খান করা। মার্কসবাদীরা কিন্তু রাষ্ট্রকে অত্যাবশ্যক মনে করতেন, অথচ বলতেন রাষ্ট্র ক্রমে শুকিয়ে যাবে।

রাষ্ট্র আদৌ থাকবে কি থাকবে না ? থাকলে তার উপর কোনো অঙ্কুশ থাকবে কি থাকবে না ? শাসকদের সংযত করার জন্যে কোন চেক বা ব্যালান্স থাকবে কি থাকবে না ? বিকল্প সরকার গঠন করার আশা নিয়ে কোনো অপোজিশন থাকবে কি থাকবে না ? এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখা গেল বিপ্লবীদের নিজেদের শিবিরই চৌচির। পশ্চিম ইউরোপের মার্কসবাদীরা তো রাষ্ট্র বলে একটি সংস্থাকে কায়েম রাখতে চাইলেনই, উপরন্তু পার্লামেন্টকেও মন্দের ভালো বলে মেনে নিলেন। ডিক্টেটরশিপের আওয়াজ তাঁদের প্রাণে পুলক সঞ্চার

করল না। যাদের ডিক্টেটরশিপ সেই শ্রমিকশ্রেণীও যে ডিক্টেটর বলে একজনকে বা একদল লোককে পছন্দ করল তাও নয়।

ইতিহাস যে ধারায় চলছিল যে ধারায় চলতে থাকলে কোনো কালেই মার্কসবাদী বিপ্লব ঘটত না। ঘটলে ঘটত ফরাসী বিপ্লবের মতো এক বিপ্লব। যাতে প্রাইভেট প্রপার্টি একেবারে রহিত হতো না, চাষী ও কারিগরশ্রেণীও ও জিনিস ছাড়ত না, কেউ তাদের ছাড়তে বাধ্যও করত না। গেলে যেত ধনীদের সম্পত্তি। সর্বশ্রেণীর নয়। আর লিবার্টির মূল্য অতি সাধারণ লোকও মনে প্রাণে বুঝত। সহজে ও জিনিস হাতছাড়া হতে দিত না। দিলেও ফিরে পেত। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী ডিক্টেটরশিপ পশ্চিম ইউরোপের জনমতের কাছে অকল্পনীয়। ভোট তাদের বিচারে তুচ্ছ একটা পদার্থ নয়। সেটা তাদের জন্মস্বত্ব।

কেউ ভাবতে পারেনি যে মার্কসের শিষ্য হবেন লেনিন ও বিপ্লবের দুয়ার খুলে যাবে ইউরোপের পূর্বপ্রান্তে। মার্কস সেরকম কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি। তাঁর মতে সেই দেশেই বিপ্লব ঘটবে যে দেশ শিল্পবিপ্লবে যথেষ্ট অগ্রসর, যেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে যথেষ্ট রাজনৈতিক চেতনা বিদ্যমান। অর্ধসভ্য রুশ দেশের অর্ধচেতন শ্রমিক-কৃষক হঠাৎ একদিন মার্কসবাদী বিপ্লব ঘটাবে এমনতর স্বপ্ন স্বয়ং মার্কস মুনিও দেখেন নি।

অথচ ফরাসী বিপ্লবের কল্যাণে রুশ দেশেও বিপ্লবচিন্তা উনবিংশ শতাব্দীর থেকেই প্রবাহিত হচ্ছিল। যাদের মধ্যে হচ্ছিল তারা শ্রমিক-কৃষক নয়। আর তাদের লক্ষ্য শ্রমিক-কৃষকের ডিক্টেটরশিপও নয়। ফরাসী বিপ্লবের জের টেনে নিয়ে যাওয়াই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। স্বৈরাচারী সম্রাট থাকবেন না, অথচ রাষ্ট্র থাকবে। রক্ষণশীল যাজককুল থাকবে না, অথচ চার্চ থাকবে। সুবিধাভোগী অভিজাতশ্রেণী থাকবে না, অথচ মধ্যবিত্তশ্রেণী থাকবে। প্রাইভেট প্রপার্টি একেবারে লোপ পাবে না ; জমি ভাগ করে দেওয়া হবে। সমাজে সার্ফ বলে কেউ থাকবে না, সার্ফদের মুক্তি দিতে হবে। দেশকে শিল্পায়িত করতে হবে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

উনবিংশ শতাব্দীর আদিপর্বের বিপ্লবীরা যা চেয়েছিলেন তা যদি বিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে পেতেন তা হলে আর কোনোদিন ওদেশে বিপ্লবের নাম শোনা যেত না। কিন্তু বার বার বিপ্লব-প্রয়াস করেও সম্রাটের কাছ থেকে সার্ফের মুক্তি ভিন্ন উল্লেখযোগ্য আর কোনো দান পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে বিপ্লবীদের মধ্যে এল নিহিলিস্ট চিন্তা, অ্যানারকিস্ট চিন্তা। কিছুই তাঁরা মানবেন না, কিছুই তাঁরা রাখবেন না। এমন কি পরিবারও না, পারিবারিক বন্ধনও না। এমন কি ঈশ্বরও না, পরলোকও না, পরকালের পরিত্রাতাও না। পশ্চিম ইউরোপকেও তাঁরা এদিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেলেন।

শুধু তত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়, কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও তাঁরা নতুন নতুন লাইন খুলে দিলেন। খুন, লুট, ধ্বংস। প্রধানত তরুণতরুণীরাই এ সব করে বেড়াত। নিহিলিস্ট

বা অ্যানারকিস্ট বলতে মানুষের মনে যে ছবি আঁকা হয়ে যায় তা এমন একজন বা একদল আদর্শবাদী, যার কাছে বা যাদের কাছে প্রাণের মূল্য নেই, সম্পত্তির মূল্য নেই। এমন কি অতীতেরও মূল্য নেই। ওরা দেশের অতীতটাকে মুছে ফেলবে আর মুছে ফেলা স্লেটের উপরে ভবিষ্যতের লিখন লিখবে।

বিপ্লবী চিন্তায় রুশ দেশের এই অধ্যায়টার ছাপ পড়ে একে আশ্চর্য এক মহিমা দেয়। এ যেন এক নতুন ধর্ম সংস্থাপনের উদ্যোগ। যার জন্যে পুরাতনকে নিশ্চিহ্ন করা দরকার। ফরাসী বিপ্লবেও অতীতকে বিদায় দিয়ে নতুন করে আরম্ভ করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সেটা যতটা ভাবাবেগের সঙ্গে ততটা ধর্মপ্রাণতার সঙ্গে নয়। রুশো ভলতেয়ার ধর্মপ্রাণ ছিলেন না খ্রীস্টান বা অখ্রীস্টান কোনো অর্থেই। ওটা ছিল যুক্তির যুগ। রুশো অবশ্য বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী ছিলেন না কিন্তু নতুন ধর্মপ্রবর্তকের মানসিকতাও তাঁর ছিল না। রুশ দেশই সেই দেশ, যেখানে বিপ্লব-প্রয়াসের ভিতর ছিল ধর্মপ্রবর্তনের উৎসাহ উদ্দীপনা।

এমনও হতে পারে যে, প্রটেস্টাণ্ট ক্যাথলিকের সাম্প্রদায়িক যুদ্ধবিগ্রহে শ্রান্ত ক্লান্ত পশ্চিম ইউরোপ আবার এক ধর্মের নামে নাচতে রাজী ছিল না। বলা বাহুল্য, রুশ বিপ্লবীরাও খ্রীস্টধর্মের মতো আর একটি ধর্ম চাননি। যা চেয়েছিলেন তা ধর্মের মতো জীবনের সমস্তটাকেই রূপান্তরিত করতে পারে। বিপ্লবই সেই প্রার্থনীয় সোনার কাঠি।

এতক্ষণ যাঁদের কথা বলা হলো তাঁরা লেনিনপূর্ব বিপ্লবী। লেনিন এসে বিপ্লবকে একটা বৈজ্ঞানিক মোড় দেন। তার সংযোগ ঘটান ইউরোপীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের সঙ্গে। বিশেষ করে মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে। কিন্তু তিনিও তো জন্মত রুশ। রুশ ঐতিহ্যই বা তিনি এড়াবেন কী করে? লেনিনের বিপ্লব রুশ দেশেই সম্ভব ছিল, অন্যত্র নয়। অথচ মার্কসবাদী শিক্ষা ব্যতীত কোথাও তেমন বিপ্লব ঘটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। লেনিনের মধ্যে এমন এক সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায় যা তাঁর পূর্ববর্তীদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর সাফল্যের কারণ তাঁর জীবনের দুটি মহৎ প্রভাবের মাঝখানে মেলবন্ধন।

লেনিনের সিদ্ধি সারা দেশের ও সারা যুগের বিপ্লবীসাধনার সিদ্ধি। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, সিদ্ধির ভিতরেই ব্যর্থতার বীজ নিহিত ছিল। রুশ দেশের পূর্বতন বিপ্লবীরা কেউ বা চেয়েছিলেন রাষ্ট্রহীন সমাজ, কেউ বা চেয়েছিলেন সর্বেসর্বাহীন রাষ্ট্র। তাদের প্রাণদান কি এইজন্যে যে রাষ্ট্র দিনকের দিন ফুলে ফেঁপে উঠবে, কোনদিন শুকিয়ে যাবার নাম করবে না, তার পিঠে সওয়ার হয়ে যে দলটি বসবে সে আর সবাইকে নির্মূল করবে, সে আর সকলের উপর অঙ্কুশ চালাবে, তার উপরে আর কেউ অঙ্কুশ চালাবে না, সরকার থাকবে, কিন্তু অপোজিশন থাকবে না, ভোট দিয়ে প্রত্যেকবারেই দেখা যাবে যে ওই একটিই দল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে জমিদারদের মতো ঘাড়ে চেপে বসে আছে?

সামাজিক পরিবর্তন নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু মানুষের কতকগুলো মৌল অধিকার

আছে. সেগুলো না থাকলে জীবন বিস্বাদ। মানুষ কেবল খেয়ে পরে বাঁচে না। তার চাই সর্বপ্রকার স্বাধীনতা। তার চাই সর্বতোমুখ চরিতার্থতা। ফরাসী বিপ্লবের সুরে বাঁধা বিপ্লব ছিল সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার সুরে বাঁধা। সেই ধরনের বিপ্লব যারা চেয়েছিল ও তার জন্যে মরেছিল তা শ্রেণীহীন ব্যবস্থার জন্যে আর সব কিছু বলি দিতে চায়নি। প্রাইভেট প্রপার্টি লোপ করতে গিয়ে আর সব কিছু বিসর্জন দিতে চায়নি।

এমনকি লেনিনের সহকর্মী যাঁরা ছিলেন তাঁরাও ততদূর যেতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই স্টালিনের সঙ্গে মতান্তর হয় ও তাঁদের জান যায়। স্টালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়া লেনিনের সঙ্গে আবার পা মিলিয়ে নিতেও চেষ্টা করছে। কতদূর পারবে বলা যায় না। তাকেও একদিন গণতান্ত্রিক মূল্যগুলোর অনুরাগী হতে হবে। নইলে তার সমাজতন্ত্র মানুষকে মানবিক উত্তরাধিকার থেকে বহু পরিমাণে বঞ্চিত করবে। ফরাসী বিপ্লব যেটা চায়নি।

রুশ বিপ্লবের বার্তা এদেশে পৌঁছবার আগে যারা বিপ্লবী চিন্তায় দীক্ষিত ছিলেন তাঁরা ওই ফরাসী বিপ্লবের ধারায় অভিষিক্ত ছিলেন। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক জায়গায় লিখেছেন, তাঁর প্রথম বয়সে বাংলার শিক্ষিত মহলে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ছিল। সেটা স্বদেশী যুগের পূর্ব[illegible]ন যুগ। ততদিনে ফরাসী বিপ্লব তার আদি রূপের থেকে বিবর্তিত হয়েছে। তার উপর কাজ করেছে তার পরবর্তীকালের শিল্প-বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন। নানা শাখা প্রশাখা উদ্‌গত হয়েছে। সোশিয়ালিজম, সিণ্ডিক্যালিজম, অ্যানারকিজম, নিহিলিজম। এক সোশিয়ালিজমেরই কতরকম প্রশাখা। তার মধ্যে মার্কসিজমও পড়ে। কিন্তু বাংলা দেশে অতরকম ডালপালা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখা যায়নি। অন্তত মার্কসবাদের নামগন্ধও পাওয়া যায়নি। রাশিয়ার সঙ্গে তুলনায় এদেশ অনেকটা পেছিয়ে রয়েছিল। অথচ রাশিয়ার হাওয়া এখানেও লেগেছিল। নিহিলিজম ও অ্যানারকিজম হাওয়ায় ভেসে এসে-ছিল। তার থেকেই আসে স্বদেশী যুগের সন্ত্রাসবাদ।

বাংলার সন্ত্রাসবাদের পেছনে বাংলার ধর্মসাধনাও ছিল, তাই এর তত্ত্বের দিকটা ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নায়করা কেউ 'আনন্দমঠ' বর্ণিত সমাজে ফিরে যেতে চায়নি, চেয়েছিল আধুনিক যুগের সমাজ। সে সমাজে সাম্য আছে, স্বাধীনতা আছে, জ্ঞানবিজ্ঞান আছে, নরনারীর রোমান্টিক প্রেম আছে, ঘরে ও বাইরে সাহচর্য আছে। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ঊনবিংশ শতাব্দীর আশা আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়।

আমাদের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা রুশ দেশের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অনুরূপ না হলেও বেশ কিছুটা কাছাকাছি ছিলেন। তাই একদিন দেখা গেল তাঁরা ন্যাশনালি-জম নামক একটি ধর্মমত ছেড়ে কমিউনিজম নামক আর একটি ধর্মমতে দীক্ষা নিয়েছেন। দীক্ষা নিলে ভেক বদলেও যায়। এঁদের বেলাও তাই হয়। বিপ্লব ঘটল না, অথচ শত শত যুবকযুবতীর জীবনের রূপান্তর ঘটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এঁরা

দ্বীপান্তর থেকেও ছাড়া পেলেন। কিংবা বন্দীনিবাস থেকে। এঁদের মুখে মার্কসবাদের নবতম বোলচাল শুনে ভ্রম হয় আমরাও হয়তো স্টালিনের রামরাজত্বে বাস করছি বা করতে যাচ্ছি। শুধু একটা বিপ্লবের অপেক্ষা।

তবে মনটা হালকা হয় এই ভেবে যে আর সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ হবে না, আর সাহেব খুন বাঙালী খুন হবে না। যেটা হবে সেটা অবিকল রাশিয়ার আদলে। সেটা তো গোড়ায় তেমন রক্তক্ষয়ী ছিল না। ওদিকে বিপ্লব কথাটার এমন মাহাত্ম্য যে মহাত্মার শিষ্যরাও অহিংস বিপ্লবের ধুয়ো ধরেছেন। জবাহরলালজী তো হাঁকছেন ইনকিলাব জিন্দাবাদ। তা শুনে আমরা সত্য সত্য বিশ্বাস করছি যে উনিই আমাদের লেনিন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমাদের ভারতীয় লেনিনের পলিসি দেখে বেশ টের পাওয়া গেল যে উনি হচ্ছেন ইংলণ্ডের ক্রিপস ইত্যাদির মতো ফেবিয়ান পার্লামেণ্টারি সোশিয়ালিস্ট, তফাতের মধ্যে সোভিয়েট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্বাসী। জবাহরের চেয়েও গান্ধীকে ইংরেজ কর্তারা ভয় করতেন। কারণ যুদ্ধকালে গান্ধীর পলিসি ছিল লেনিনের মতো। পরে তো লেনিনকেও তিনি ছাড়িয়ে যান যুদ্ধের মাঝখানে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে।

গান্ধীজী মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন যে যুদ্ধকালে ইংরেজ রাজকে বড়ো রকম একটা ধাক্কা দেবেন। তাতে যদি ওরা টলে টলবে। না টললে পরে আবার এক ধাক্কা। তার জন্যে তিনি চাইকি একশো বিশ বছর বেঁচে থাকবেন। ততদিন বাঁচবার দরকার হলো না। ইংরেজরাই মানে মানে চলে গেল। যাবার আগে হিন্দুর কান ধরিয়ে দিয়ে গেল মুসলমানের হাতে আর মুসলমানের কান হিন্দুর হাতে। এটাও একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। গান্ধীজীর আর বাঁচতে ইচ্ছা ছিল না। ঘাতকরা তাঁকে বাঁচতে দিলও না।

কিন্তু গান্ধীবাদ এমন একটা ধাক্কা খেল যে এখনো সামলে নিতে পারেনি। বিশেষ কেউ বিশ্বাস করে না যে এদেশে গান্ধীবাদী বিপ্লব একদিন ঘটবে। বিনোবাজী যে বিপ্লবের কথা বলছেন তা ফরাসী বিপ্লবের বা রুশ বিপ্লবের সঙ্গে মেলে না। ইউরোপীয় বিপ্লবচিন্তার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে বিপ্লব, সৈন্যদলকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র, মালিকানা বাদ দিয়ে জমির বণ্টন, দান খয়রাতের মাধ্যমে হস্তান্তর এসব লোকের মনে বসতে কে জানে কতকাল লাগবে। জনগণ ততদিন সবুর করলে হয়।

কাজেই বিপ্লবের কথা যারা বলে তারা হয় জবাহরলালের মতো ফেবিয়ান পার্লামেণ্টারি সোশিয়ালিস্ট, না হয় সরাসরি মার্কসিস্ট। ইতিমধ্যে মার্কসিস্টদের মধ্যেও বিভিন্ন মত। তাঁদের একদল তো কিছুতেই পার্লামেণ্টারি প্রথা অনুসরণ করবেন না। সেটা তাঁদের মতে বিপথ। অথচ তাঁরা ধৈর্য ধরে লেনিনের মতো অপেক্ষাও করবেন না। যতদিন না পরিস্থিতি বিপ্লবের অনুকূল হয়। তাঁরা কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবেন। জনগণ যদি তার জন্য তৈরি না থাকে তাঁরা ছাত্রগণকে

নিয়েই কাজ করবেন। আর ছাত্রদের হাতে যদি রাজ্যপাট জোর করে দখল করার মতো লোকবল বা অস্ত্রবল না থাকে তবে ছোরা ছুরি বোমা পটকা পেট্রোল কেরোসিন তো আছে। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং সমাজবিরোধী অপরাধপ্রবণ শ্রেণীকেও বিপ্লবের শিবিরভুক্ত করে নেওয়া হচ্ছে। মার্কসের বা লেনিনের কোথাও এর নজীর নেই। যতদূর জানি মহামান্য মাও ৎসে-তুং যতরকম উপায় অবলম্বন করেছেন তার মধ্যে এরকম কিছু নেই। থাকতে পারে দক্ষিণ আমেরিকার সন্ত্রাসবাদীদের কর্মপ্রকরণে।

পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে ত্বরিত সামাজিক পরিবর্তন আশা করা যায় না। পার্লামেণ্টে হাজার রকম তর্কবিতর্ক. আদালতে হাজারটা কূটপ্রশ্নের অবতারণা, আমলাতন্ত্রের অন্তহীন টালবাহনা ও গাফিলতি, পদে পদে টাকার শ্রাদ্ধ। তরুণ মন যদি হতাশায় ভরে যায় তাকে দোষ দেওয়া শক্ত। অপর পক্ষে জনগণ যদি বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত না থাকেন, সৈন্যরা যদি বিপ্লবীদের পক্ষে যেতে ইচ্ছুক না হয়, যুদ্ধবিগ্রহ এসে পরিস্থিতিকে যদি পাকিয়ে না তোলে তাহলে লেনিন বা মাও বা চে গেভারা কারো সাধ্য নেই বিপ্লব ঘটিয়ে দেশের পিঠে সওয়ার হয়ে বসার। বিপ্লব নৈর্ব্যক্তিক একটি শক্তি। ব্যক্তিবিশেষ যত বড়োই হোন সময়ের একদিন আগে বিপ্লব ঘটাতে পারেন না। যেমন সময়ের একদিন আগে ভূমিকম্প ঘটাতে পারেন না। লেনিনের ছিল অসাধারণ সময়জ্ঞান। তেমনি গান্ধীজীরও। যাঁদের যে রকম সময়জ্ঞান নেই তাঁরা থেকে থেকে ধর্মঘটের বা 'বন্‌ধ'এর ডাক দিয়ে লোকের সহানুভূতি খোয়াবেন।

'বাঘ' 'বাঘ' বলে ডাক দিলেই বাঘ এসে হাজির হয় না। সত্যি যখন আসে তখন কেউ তার জন্যে তৈরি থাকেন না। বাঘ একদিন আসতে পারে আমিও সেটা জানি। রুশ দেশের সঙ্গে চীন দেশের সঙ্গে ভারতের যতখানি মিল আছে ইংলণ্ড বা আমেরিকার সঙ্গে ততখানি নয়। অধিকাংশ লোক এত গরীব যে তাদের হারাবার কিছু নেই বিপ্লবে। হারাবার যদি কিছু থাকে তো সেটা তাদের শিকল। তবে পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের কল্যাণে শিকলও কি আর আগেকার মতো ?

স্বাধীন ভারত আর কিছু না পারুক পায়ের শিকল খুলে দিয়েছে। কিন্তু পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে পারেনি। এত বেশী ভিখারী বা কুষ্ঠরোগী আর কোন দেশে আছে ? আর এত বেশী বেকার ? এত বেশী অলস মানুষ ? আলস্যই আমাদের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ। জমি বণ্টন করার পর দেখা যাবে আলস্যের দরুন উৎপাদন বাড়ছে না। বিরাট এক অলস শ্রেণী হচ্ছে এদেশের ছাত্ররা। এদের কাজে লাগাতে না জানলে এরা অকাজই করবে। একে মারবে, ওর ঘর পোড়াবে, তার মূর্তি ভাঙবে। অকাজ হলেও তবু কাজের মতো দেখতে। এই নিয়ে তো বেশ ব্যাপৃত থাকা যায়।

আমি গোড়াতেই বলেছি যে গত শতাব্দীর নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে একদল ফরাসী বিপ্লবীদের চিন্তাপ্রবাহে অভিষিক্ত হন, একদল পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসীর বিবর্তনস্রোতে। সেই দুটো ধারা এখনো আমাদের শিক্ষিত মানসে সঞ্চারিত রয়েছে।

এর কোন শ্রেণীভেদ নেই। এমন নয় যে মধ্যবিত্ত বাবুরাই পার্লামেণ্টারী ডেমক্রাসী-মনস্ক আর মজদুর চাষীরাই বিপ্লবমনস্ক। প্রত্যেক শ্রেণীতেই দু'মত। প্রত্যেক পরিবারেই দু'মত। এমনকি প্রত্যেকটি ব্যক্তিই দ্বিধাদীর্ণ। ওদিকে হাইকোর্টে যাওয়া হচ্ছে, এদিকে খুনোখুনিও করা হচ্ছে। সবাই জানে যে কোর্ট না থাকলে কেউ বাঁচবে না, সমাজবিরোধীরা সবাইকে মেরে সাবাড় করবে। অথচ জজকেই খুন করে রাখবে।

অশিক্ষিতদের চেয়ে শিক্ষিতদের নিয়েই ভাবনা বেশী। এদের শিক্ষাই এদের কুশিক্ষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষা ভালো। অথচ কার সাধ্য এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে হাত দেয়! সেক্ষেত্রে কতরকম কায়েমী স্বার্থের সমাবেশ ঘটেছে। সত্যিকার বিপ্লবী আঙুলে গোনা যায়। লেনিন কিংবা মাও যদি এদেশে জন্মান এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় হাত দিতে পারবেন না। সেই জন্যই কি বিশেষ একটি দল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি ধ্বংস করার ব্রত নিয়েছে? তাতে কিন্তু সত্যিকারের বিদ্যানুরাগীদের সর্বনাশ হচ্ছে। পরের জেনারেশনে ইনটেলেক-চুয়াল বলতে একটিও থাকবে না মার্কস কি এই চেয়েছিলেন?

তবে মাও বোধ হয় এইরকমই চান। তিনি কায়িক পরিশ্রমে আরো বেশী বিশ্বাস করেন। পারলে লাঙলে জুতে চাষ করাবেন এইসব মধ্যবিত্ত সমাজের পড়ুয়াদের। তাতে স্পষ্টত কিছু উৎপাদন বাড়বে। অন্তত আপনার খোরাকটা এরা আপনি ফলিয়ে নেবে। চাষীদের দিয়ে ফলাতে হবে না। দেশে মাও রাজত্ব প্রবর্তন হলে মধ্যবিত্ত বংশধরদের হলধর হতে হবে, এটা একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয় তো কী? কিন্তু তাঁর জন্যে আপনার লোককে এরকম বেপোরোয়াভাবে খুন করার দরকারটা কী?

এদেশে দারিদ্র্য আছে, আলস্য আছে, কুশিক্ষা আছে, অশিক্ষা আছে, কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে যা আছে তা গত পাঁচ পুরুষের নব শিক্ষা, তিন পুরুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন, দু'পুরুষের গান্ধীবাদী সাধনা, এক পুরুষের পার্লামেণ্টারি অভিজ্ঞতা। রুশ বা চীনদেশের কি এর সঙ্গে তুলনীয় কিছু ছিল? কতকগুলি বিষয়ে আমরা রুশ চীনের সগোত্র হলেও আবার কতকগুলি বিষয়ে ওদের থেকে ভিন্ন। বিপ্লব এদেশে হতেও পারে, না হতেও পারে। যাদের ত্যাগের উপর নির্ভর করে আমাদের বিপ্লবীরা ভবিষ্যৎ গণনা করছেন তারা যদি যথেষ্ট ত্যাগ না করে, করতে অনিচ্ছুক বা অক্ষম হয়, তা হলে তো সে গণনা অভ্রান্ত নয়। গণনার মধ্যে প্রতিবিপ্লবীকেও ধরতে হবে।

এই সেদিন যে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল তাতে দেখা গেল পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার অধিকাংশ দখল করেছেন মার্কসবাদী দল। এঁরা যদি বিভক্ত না হয়ে একজোট হতেন তাহলে তো এঁরাই ক্ষমতার আসনে বসতেন। বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা করতে হত কেন? যেহেতু ওঁরা সংখ্যাধিক হয়েও একজোট হতে পারলেন না সেহেতু ওঁরা বিপ্লবের পরেও পারবেন না। প্রতিবিপ্লবীকেই পথ ছেড়ে দেবেন।

একমাত্র ভরসা সংখ্যালঘু হয়েও রাজত্বলাভ। সেটা হয়তো গায়ের জোরে সম্ভব, কিন্তু পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র বজায় থাকতে তার সম্ভাবনা কতটুকু? অবশ্য সে গণতন্ত্র যদি সমস্তক্ষণ কর্মতৎপর হয়। কথায় নয় কাজে জনগণের আস্থা অর্জন করে।

বাঙালীদের সব চেয়ে বেশী মিল রুশদের সঙ্গেও নয় চীনদের সঙ্গেও নয়, ইংরেজদের সঙ্গে তো নয়ই। ফরাসীদের সঙ্গে। সেই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকেই ফরাসীদের মানস দ্বিধাদীর্ণ। বিপ্লবের স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে, তার তুলনায় আর সবকিছু বিস্বাদ। অথচ বার বার বিপ্লবে নেমে দেখা গেছে প্রাণ দেওয়াই সার। বিপ্লব স্থায়ী হয়নি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ হয়নি। প্রতিবিপ্লব এসে তার ঘুরে যাওয়া চাকা আবার ঘুরিয়ে দিয়েছে। তা সত্ত্বেও কিছু কিছু লাভ সময়ের ধোপে টিকেছে। ফরাসীদের আধখানা মন তাই বিপ্লবের ভাবনায় ভরপুর।

বাকী আধখানা পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসী মেনে নিয়েছে। মেনে নিলে কী হবে? চালাতে জানা চাই। অসংখ্য দল। জোড়াতালি সরকার। গত এক শতাব্দীর মধ্যে পঁচাত্তর বছরই কেটে গেল বছর বছর জোড়াতালি সরকার বদল করে করে। মাসে মাসেও বদলেছে। এমনকি কয়েকদিন অন্তর অন্তর। ফরাসীরা অবশেষে এমন একজনকে নেতারূপে পায় যিনি শুধু পার্লামেণ্টের নেতা নন, সৈন্যদলের নেতা, সেই সঙ্গে জাতির নেতা। কিন্তু দ্য গল তো চিরন্তন নন। তেমনটি কি পাঁচ দশ বছর অন্তর অন্তর পাওয়া যায়? তাই ফরাসীদের সমস্যার এখনো কোন স্থায়ী সমাধান মেলেনি।

তা সত্ত্বেও ওদের ঘোরতর অসুবিধা হচ্ছে না ও হবে না। কারণ ওদের সিভিল সার্ভিস আর সৈন্যদল দুটোই খুব মজবুত। আর ওদের সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত সজাগ। আর ওদের ইনটেলেকচুয়ালদের সম্মান ইংলণ্ডের অভিজাতদের সঙ্গে তুলনীয়। ফরাসী বিপ্লব ইংলণ্ডের অভিজাততন্ত্রকে বরাবরের মতো নির্জীব করেছে। তার স্থান নিয়েছে জ্ঞানীগুণীতন্ত্র। ফরাসী আকাদেমির চল্লিশ জন অমরের মর্যাদা চল্লিশ জন ডিউক বা মারকুইসের চেয়ে উচ্চতর। ফরাসী বিপ্লব যেমন এক হাতে অভিজাততন্ত্রকে ধ্বংস করেছে তেমনি আর এক হাতে নতুন এক অভিজাততন্ত্র সৃষ্টি করেছে। রাশিয়া কি তা পেরেছে? আর চীন?

নিছক ভাঙনের নেশায় যাদের পেয়ে বসেছে তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে যে বাংলার বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা সশরীরে উচ্ছেদ হলে সে শূন্যতা পূরণ করবার জন্যে আর কোনো শ্রেণীই থাকবে না? লাইব্রেরী যদি পোড়ানো হয়, বইয়ের দোকানে যদি আগুন ধরানো হয়, মিউজিয়াম যদি বিধ্বস্ত হয় স্টুডিও যদি ভগ্নস্তূপ হয় তবে একটা দেশের যত ক্ষতি হয় আর একটা মহাযুদ্ধে তত ক্ষতি হয় না। মহাযুদ্ধের সময় ফরাসীরা তাদের মহামূল্য শিল্পসামগ্রীগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিয়ে সযত্নে রক্ষা করতে পেরেছিল। কিন্তু আমাদের কি দূরে সরিয়ে দিয়ে নিরাপদে রাখার উপায় আছে? সংস্কৃতির উপরে জাতক্রোধ যারা তারা ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনের উপরেও শনির দৃষ্টি দিয়েছে।

শ্রেণীশূন্য সমাজ বলতে কি এই কথা বোঝায় যে পরশুরামের মতো কুঠার হাতে নিয়ে সমাজকে নিঃক্ষত্রিয় করতে হবে ? নির্বুর্জোয়া করতে হবে ? দেখে শুনে মনে হয় একালের পরশুরামদের মনোগত অভিপ্রায় বুর্জোয়া বলে পরিচিত শ্রেণীটিকে কেবল জমিজমা কলকারখানা আপিস আদালত দোকান বাজার থেকে নয় ইহলোক থেকে অপসারিত করা। বিপ্লব মানে নিঃক্ষত্রিয়করণ। বার বার একুশ বার হলেও আশ্চর্য হবার কিছু থাকবে না। মাও মহোদয় যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটালেন সেটাও তো দ্বিতীয় দফা নিঃক্ষত্রিয়করণ। এর পরে হয়তো তৃতীয় দফা আসবে।

অমন দফাওয়ারি নিঃক্ষত্রিয়করণ সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটেনি। ওরা বরং নিঃশূদ্রীকরণ করেছে। কুলাকদের যদি শূদ্র বলে ধরি। বেচারিরা সংস্কৃতির ধারও ধারত না। তবু ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেল। নিঃশূদ্রীকরণের পর্ব তার চেয়ে বেশীদূর যায়নি। তবে ওদেশের পরশুরামদের অনেকের নিষ্পরশুরামীকরণ হয়েছে। স্টালিন তাঁর কমরেডদের অধিকাংশকেই সাবাড় করেছেন।

কাজেই পরশুরামদেরও একটু খেয়াল রাখা দরকার যে ক্ষত্রিয়দের নির্মূল করার পর নির্মূলকারীদের পালা আসবে। তাদেরই কুঠার দিয়ে নিকাশ করা হবে। ফরাসী বিপ্লবীদের উদ্ভাবিত গিলোটিনে যেমন বিপ্লবীদেরই পাইকারী হারে বিনাশ করা হয়। এই যে নিয়তি এর থেকে পরিত্রাণ নেই।

পার্লামেণ্টারি ডেমক্রাসী মানুষকে স্বর্গ এনে দিতে পারে না, কিন্তু হত্যাবিভীষিকার হাত থেকে বাঁচায়। একটি প্রাণকে এত মূল্যবান মনে করে যে তাকে ফাঁসীতে ঝোলানোর আগে বাঁচাবার জন্যে একশো রকম সুযোগ দেয়। সেইজন্যে হাজার-জন খুনীর মধ্যে একজনেরও ফাঁসী হয় কি না সন্দেহ। ফাঁসীর হুকুম হলেও হাইকোর্ট রদ করে দেয় বা সরকার ক্ষমা করে লঘুদণ্ড দেন। ডেমক্রাসীর মতো বিচার বিবেচনা কার! দয়ামায়াই বা কার!

টলস্টয় : সার্ধশতবার্ষিকী

টলস্টয়ের জন্মের দেড়শো বছর অতীত হয়েছে। তাঁর জীবনকালেই তিনি দেশের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর সময় দেখা গেল, স্বদেশে পূজ্যাতে 'জার', টলস্টয় সর্বত্র পূজ্যাতে। তাঁর জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে সারা দুনিয়ার লোক উৎকণ্ঠিত। কেন এত শ্রদ্ধা, এত প্রীতি, এত মমতা ? 'সমর ও শান্তি', 'আনা কারেনিনা' ও 'রেসারেকশন' এই তিনটি মহান উপন্যাসের জন্যেই কি ? না তাঁর মানবদরদী জীবনদর্শনের জন্যে, জনদরদী জীবনযাপনের জন্যে ? যুদ্ধবিরতি ও শোষণবিরতির জন্যে তাঁর অবিশ্রান্ত লেখনীচালনার জন্যে ?

টলস্টয়ের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ষোল বছর বয়সে, যখন আমি স্কুলের ছাত্র। তাঁর কাহিনীগুচ্ছ পুরস্কার পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে তর্জমা করি গোটা দুই। একটি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে। সেই যে সম্পর্ক স্থাপিত হলো সে সম্পর্ক সারা জীবনেও ছিন্ন হলো না। জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে আমি তাঁর অনুচরদের সঙ্গেই রয়েছি। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব কাটিয়ে উঠেছি। আর্টকে তিনি পঞ্চাশোত্তর বয়সে ধর্মপ্রচার বা নীতিপ্রচারের বাহন করেছিলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার মৌল মতভেদ। আমার মতে এতে আর্টের স্বাধীনতা খর্ব হয়। অমিতাচারী আর্টকে সংযত হতে বলা এক জিনিস, শৃঙ্খলার খাতিরে শৃঙ্খল পরিয়ে দেওয়া আরেক। শিবের জন্যে সৌন্দর্যকে লাঘব করা যায় না। সত্যের জন্যেও না, তবে দ্বন্দ্বের দিন আমি দ্বিধান্বিত। ঠিক এই কারণেই আমি রবীন্দ্রনাথের আরো কাছাকাছি। পরবর্তী বয়সে আমি কবির প্রভাবও কাটিয়ে উঠেছি।

এ সংসারে ধনহীনরা ধনবান হতে চায়, বলহীনরা বলবান হতে চায়, অশিক্ষিতরা শিক্ষিত হতে চায়, নিম্নস্থানীয়রা উচ্চস্থানীয় হতে চায়। কিন্তু এর বিপরীত অভিলাষ কেউ কোথাও পোষণ করে কি ? যদি কেউ করে সে সরাসরি সন্ন্যাসী হয়ে যায়, মঠে যোগ দেয় কিংবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে। টলস্টয় দীনহীনদের একজন হয়ে তাদেরি মতো শ্রমলব্ধ অন্নে প্রাণধারণ করতে চেয়েছিলেন, পশুবলে তাঁর আস্থা ছিল না, বুদ্ধিজীবীদের উপর তাঁর অবজ্ঞা জন্মেছিল, সভ্যতার উপরে তিনি বীতরাগ। অথচ সন্ন্যাসীও হননি, মঠেও যোগ দেননি, আশ্রমও প্রতিষ্ঠা করেননি। গান্ধীজী তবু তাঁর সহধর্মিণীকে আশ্রমিকা করতে পেরেছিলেন, টলস্টয়ের সহধর্মিণী শেষ পর্যন্ত অভিজাত ঘরণী। ঘর ছাড়তে যাওয়া মানেই ঘরণীকে ছাড়তে যাওয়া। সেই কাজটি যেদিন করতে সমর্থ হন সেদিন তিনি হন অভিজাত জীবনধারা থেকে মুক্ত পুরুষ। কিন্তু ততদিনে তাঁর বয়স হয়েছে বিরাশি, শরীর ভেঙে গেছে,

দিনকয়েকের মধ্যেই তিনি পথের ধারে এক রেলস্টেশনে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বেঁচে থাকলে আবার তাঁকে তাঁর ঘরসংসারেই ফিরে যেতে হতো। সেটা হতো তাঁর পক্ষে পরাজয়। যদি না তাঁর সহধর্মিণীর ঘটত একপ্রকার অন্তঃপরিবর্তন। যদি না সমস্ত গৃহস্থালীটাই বনে যেত ঋষি ও ঋষিপত্নী তথা ঋষিসন্ততিদের আশ্রম। একটি কি দুটি কন্যা ভিন্ন আর কোনো পুত্রকন্যার উপরে তাঁর জীবনদর্শনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়েনি। তাঁরা তাঁদের দেশের ও তাঁদের যুগের আর দশজন উচ্চবংশীয়ের মতো। তাঁদের তিনি মানাতে পারেননি যে স্বেচ্ছায় ধনসম্পদ ও অলস জীবনধারা ত্যাগ না করলে বিপ্লবের দিন বাধ্য হয়েই সর্বস্ব হারাতে হবে। তখন বিদেশে গিয়ে পিতার গ্রন্থস্বত্বের দৌলতে ভদ্রতা রক্ষা করতে হবে।

ঋষি যেখানে নিজের ঘরের লোককেই সঙ্গে নিতে পারলেন না সেখানে সারা দেশের লোককেই বা সঙ্গে নিতে পারবেন কেমন করে? সে কাজের ভার পড়ল লেনিনের উপরে, ভার দিল ইতিহাস। লেনিনেরও নিঃস্বার্থ জীবন, সাধারণের মতো জীবনযাত্রা। কিন্তু জনগণকে সঙ্গে নেবার জন্যে কী পরিমাণ রক্তপাত করতে হলো তাঁকে! পরে তাঁর পট্টশিষ্য স্টালিনকে। রক্তের স্রোতে ভেসে গেল 'সমর ও শান্তি' তথা 'আনা কারেনিনা' তথা 'রেজারেকশনে'র বুদ্ধিদীপ্ত বলদৃপ্ত ধনসম্পদশালী অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু তাতে তাদেরই বা লাভ কী হলো যাদের মধ্যে টলস্টয় ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন ছোট ছোট জোত? যেখানে যারা শোষণও করবে না, শোষিতও হবে না। স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে চাষ করবে, যা ফলাবে তা খাবে, যা খাবে তা ফলাবে। শিল্পের মতো কৃষিও চলে গেছে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। খেত খামার কারো নিজের নয়। রাষ্ট্রের কিংবা সমষ্টির। টলস্টয় দেখলে কষ্ট পেতেন। কিছুতেই তাঁকে বোঝানো যেত না যে এরই নাম সামাজিক ন্যায়। পশ্চিমের লোক যাকে গণতন্ত্র বলে তাতে তো তিনি বিশ্বাসই করতেন না, সুতরাং সে জিনিস গড়ে ওঠেনি দেখে তিনি কাকেই বা দোষ দিতেন? এক ডিকটেটরশিপের বদলে আরেক ডিকটেটরশিপ। অভিজাতদের না হয়ে শ্রমিকদের। সমাজের এক মেরুর না হয়ে অপর মেরুর। টলস্টয়প্রচারিত অহিংসার নামগন্ধ নেই। সত্যেরও আছে কি না সন্দেহ। কাউকে তো কিছু প্রাণ খুলে লিখতেই বা বলতেই দেওয়া হয় না। কড়া সেনসরশিপ।

টলস্টয়ের অহিংস মতবাদ কেবল যে যুদ্ধবিরোধী ছিল তাই নয়, বিপ্লববিরোধীও ছিল। বিপ্লব যে অহিংস হতে পারে এ বিশ্বাস তাঁর কিংবা কারো ছিল না। রাশিয়াতে কেবল যে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলেছিল তা নয় বিপ্লবের প্রস্তুতিও চলেছিল। যেন একটা অন্যটার উল্টো পিঠ। যুদ্ধবাজরা টলস্টয়কে মনে করতেন দেশের শত্রু। আর বিপ্লববাদীরা মনে করতেন শ্রেণীর শত্রু। খ্রীস্টীয় ধর্মসঙ্ঘও তাঁর বাইবেলের ভাষ্যকে ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ মনে করে তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল। জনগণ যদি তাঁরই ভাষ্য মেনে নেয় তবে প্রচলিত ধর্মের সংশোধন করতে হয়। কেবল ধর্মের

বেলা নয় জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগের বেলা টলস্টয়ের চিন্তা ছিল আমূল সংশোধন বা সংস্কারের পক্ষে। কিন্তু ন্যূনতম পরিবর্তনকেও রাষ্ট্রের বা চার্চের বা ধনতন্ত্রের বা গণতন্ত্রের কর্তারা বিপ্লব বলে পরিহার করতেন। বিপ্লব যখন এল তখন রাষ্ট্রকেও নিঃক্ষত্রিয় করল। চার্চকেও নিরব্রাহ্মণ বা নিঃসন্ন্যাসী করল। সমাজকেও নির্বৈশ্য করল। শূদ্র হলো নিষ্কণ্টক। কিন্তু অস্ত্র হাতে সেও গড়ে তুলল রেড আর্মি। তার জয়লাভ মানে হিংসার জয়লাভ।

অথচ রাজাপ্রজা সকলেই স্বীকার করতেন যে টলস্টয় তাঁর দেশের এক নম্বর নাগরিক। ইউরোপবাসীরা বলতেন তিনি ইউরোপের বিবেক। ওদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় কর্মরত গান্ধীও তাঁকে কর্মগুরু পদে বরণ করেছিলেন। একলব্যের যেমন দ্রোণ। টলস্টয়ের মহাপ্রয়াণে কে না ব্যথিত হয়েছিলেন ? প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন টমাস মান বলেছিলেন টলস্টয় বেঁচে থাকলে কি তিনি এ যুদ্ধ বাধতে দিতেন ? সমস্ত শক্তি দিয়ে রোধ করতেন। টলস্টয়ের সম্মান কেবল সাহিত্যিক হিসাবে নয়। মানবহিতৈষী হিসাবেও তিনি অগ্রগণ্য। তাঁর সাহিত্যিক কীর্তি এখনো অদ্বিতীয়। তবে পরবর্তীকালের বিচারে ডস্টয়েভস্কির উচ্চতা বাড়তে বাড়তে তাঁর সমান হয়েছে। আর মানবনিয়তি সম্বন্ধে তাঁর যে ভাবনা তার কর্মময় অভিব্যক্তি প্রধানত গান্ধীজীর জীবনেই। তিনিও স্বাধীন ভারতে কার্যত পরিত্যক্ত।

টলস্টয়ের মহাপ্রয়াণে কারো চেয়ে কম অভিভূত হন না ভিন্ন শ্রেণীর ও ভিন্ন মার্গের সাহিত্যিক ম্যাকসিম গর্কি। গর্কির টলস্টয়স্মৃতি আরো অনেকের মতো আমাকেও অভিভূত করে। আমার তো মনে হয় না যে গর্কি টলস্টয়ের প্রতি সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে কোনোরূপ অবিচার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর সেই প্রবন্ধ পড়ে ক্ষুণ্ণ হন। বলেন, "ম্যাক্‌সিম গোর্কি টলস্টয়ের একটি জীবনচরিত লিখেছেন। বর্তমানকালের প্রখরবুদ্ধি পাঠকেরা বাহবা দিয়ে বলেছেন, এ লেখাটা আর্টিস্টের যোগ্য লেখা বটে। অর্থাৎ টলস্টয় দোষেগুণে যেমনটি সেই ছবিতে তীক্ষ্ণরেখায় তেমনটি আঁকা হয়েছে, এর মধ্যে দয়ামায়া ভক্তিশ্রদ্ধার কোন কুয়াশা নেই। পড়লে মনে হয়, টলস্টয় যে সর্বসাধারণের চেয়ে বিশেষ কিছু বড়ো তা নয়, এমনকি, অনেক বিষয়ে হেয়। ...টলস্টয়ের কিছুই মন্দ ছিল না এ কথা বলাই চলে না, খুঁটিনাটি বিচার করলে তিনি যে নানা বিষয়ে সাধারণ মানুষের মতোই এবং অনেক বিষয়ে তাদের চেয়েও দুর্বল, একথা স্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু, যে সত্যের গুণে টলস্টয় বহুলোকের ও বহুকালের, তাঁর ক্ষণিকমূর্তি যদি সেই সত্যকে আমাদের কাছ থেকে আচ্ছন্ন করে থাকে তা হলে এই আর্টিস্টের আশ্চর্য ছবি নিয়ে আমার লাভ হবে কী ? ...ক্ষণকালের মাথার দ্বারা চিরকালের স্বরূপকে প্রচ্ছন্ন করে দেখাই আর্টিস্টের দেখা, একথা মানতে পারিনে। তা ছাড়া, গোর্কির আর্টিস্ট চিত্ত বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়, তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা যে সত্য তা কেমন করে বলব ? গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয় ? বহুকালের ও বহুলোকের

চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত। তার মধ্যে অনেক ভোলবার সামগ্রী ভুলে যাওয়া হত, আর, তবেই না যা না ভোলবার তা বড়ো হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে দেখা হত।" —(পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি।)

রবীন্দ্রনাথের লেখায় টলস্টয় প্রসঙ্গ ওর বেশী যা আছে তা কোথাও এক লাইন, কোথাও দু'লাইন। একটি প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি টলস্টয়কে ইউরোপের বিবেক বলে অভিহিত করেছেন। ইন্দিরা দেবীকে একখানি চিঠিতে লিখেছেন, "Anna Karenina পড়তে গেলুম, এমনি বিশ্রী লাগল যে পড়তে পারলুম না— এ রকম সব sickly বই পড়ে কী সুখ বুঝতে পারিনে। আমি চাই বেশ সরল সুন্দর উদার লেখা— কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।"

গর্কি নিশ্চয়ই এর চেয়ে কঠোর কিছু বলেননি। আমার মনে হয় গর্কির জীবনস্মৃতিকে টলস্টয়ের জীবনচরিত বলে ভ্রম থেকেই রবীন্দ্রনাথের ওই ধারণা। সাক্ষাৎকারের সময় গর্কি যা শুনেছেন ও যা দেখেছেন তাই লিখেছেন, কিছুই বানাননি। সত্যকামের মতো টলস্টয়ও 'সত্যকুলজাত'।

রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। এবার গর্কির লেখা থেকে দিই। ইংরেজীতে।

"Leo Tolstoy is dead··· The news hit my heart. I groaned from anguish and resentment and now, in a kind of half-madness, I imagine him the way I knew him and the way he used to look, and am racked by the desire to talk about him···I recall his piercing eyes— they saw through everything— and his fingers, which seemed perpetually to be modelling something in the air, his talk, his jokes, his favourite muzhik words and his indefinable voice. I see how much life he had embraced and how superhumanly clever he was, and awesome. ···Words are powerless to convey what I felt then, felt both delighted and fearsome and it all merged in one happy thought. 'I'm not an orphan on this earth as long as this man is alive'. ···And now I feel an orphan, and I cry as I am writing. I have never wept so disconsolately and so bitterly. I don't know whether I loved him-- and what does it matter whether I loved him or hated him? The sensations and emotions he aroused in me were always immense and fantastic; even the things around him that I found unpleasant and inimical somehow did not oppress me but exploded my soul, as it were, to enlarge it and make it more sensitive."

এ লেখা একজন ভক্তের লেখা, কিন্তু অন্ধ ভক্তের নয়। ভক্তির সঙ্গে ছিল সূক্ষ্ম

যুক্তি। যা দিয়ে তিনি টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ করেছিলেন। সোনার সঙ্গে খাদ থাকলে যা হয় টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বেও ছিল তাই। নয়তো তিনি একজন সাধুসন্ত হতেন, একজন মুনিঋষি বা প্রোফেট। তেমন মানুষের হাতে 'সমর ও শান্তি' বা 'আনা কারেনিনা' হতো না। রবীন্দ্রনাথ যাই মনে করুন। কোন্ ধাতুতে তিনি তৈরি জানতে হলে গর্কির সাক্ষ্য আমাদের সাহায্য করে। আবার তুলে দিচ্ছি। ইংরেজী থেকে। পথের ধারে হঠাৎ দেখা দুই তীর্থযাত্রী ও যাত্রিণীর বীভৎস মিলনের বর্ণনা দিয়ে টলস্টয় বলেছেন,

"You see what sometimes happens. Nature— which the Bogomils believe to have been created by the devil— torments man in a particularly cruel and mocking way : it takes away the strength but leaves the desire. This is the lot of all living souls. Only man is exposed to the shame and horror of the torment which is part of his flesh. We carry it within ourselves as an inevitable punishment, but for what sin of ours ? As he spoke his eyes were changing strangely— they were now plaintive like a child's, and now shining dryly and severely. His lips twitched and his moustache bristled. When he finished his story he took a handkerchief out of his blouse pocket and wiped his face hard, although it was dry Then he spread his bread with the hooked fingers of his strong peasant hand and repeated quietly, 'For what sin ?"

গর্কি যে ছবিখানি এঁকেছেন সে ছবি যে জীবন্ত হয়েছে এই দুটি উদ্ধৃতিই তার যথেষ্ট প্রমাণ। অসাধারণ পুরুষের সাধারণ দোষও থাকে। কথায় বার্তায় তা ফুটে বেরোয়। কিন্তু যেটা আরো পরিস্ফুট সেটা টলস্টয়ের আপসহীন সত্যনিষ্ঠা। সত্যকে জানবার জন্যে, জানাবার জন্যে তাঁর অপরিসীম প্রয়াস। শুধু শিল্পীদের বিরুদ্ধে নয়, শিল্পের বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযোগ সে সত্য কথা বলে না।

"We're all given to telling tales. Me too. I write, and suddenly feel sorry for someone and add a good trait to a character, and take away from another, so as not to make the other characters too black by comparison... That's why I say that artistry is lying, deceitful and arbitrary, and is harmful for people. You write not about life as it is but what you think of life. Who can profit from knowing how I see this tower or the sea, or a Tatar— what is the point of it and who needs it ?"

একথা যিনি বলতে পারেন তাঁর হয় নতুন কিছু সৃষ্টি করবার নেই, নয় নতুন কিছু সৃষ্টি করবার থাকলেও তিনি তাতে তৃপ্তি পাচ্ছেন না। তিনি চান এমন

কিছু লিখতে যা যীশু খ্রীস্টের কথামৃতের মতো সর্বজনহিতকর হবে, নিম্নতম অধিকারীর কাছে সরল, সহজ ও শিক্ষাপ্রদ। তাঁর লেখা আর্ট হলো কি না তা নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই, তিনি চান দীন দুঃখী শোষিত পীড়িতদের সেবা করতে। সংসারে মন্দ আছে, অশুভ আছে। কিন্তু খ্রীস্টের বাণীই তাঁর বাণী। অশুভের প্রতিরোধ কোরো না। হিংসা দিয়ে হিংসার প্রতিরোধ অশুভ।

গর্কি তাঁকে যা বলেন ও তার উত্তরে তিনি যা বলেন তা ইংরেজীতে এইরকম। "I said that all writers probably made up things a little, portraying people they would like to see them ; I also said that I liked active people who opposed evil by all means, including violence. 'But violence is the main evil, he exclaimed taking me by the arm.'"

সত্য চিরদিনই তাঁর স্বভাবে ছিল, অহিংসা এল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর এই অহিংস মতবাদ ইউরোপ গ্রহণ করে না। কিন্তু গান্ধীজী গ্রহণ করেন ও তাঁর কর্ম-পদ্ধতির সূত্রে ভারতের জনগণ গ্রহণ করে। এখানে বলে রাখা দরকার যে অপ্রতিরোধ বলতে যীশু যা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা নিষ্ক্রিয়তা নয়, কাপুরুষতা নয়। সেটাও একপ্রকার প্রতিরোধ, কিন্তু নৈতিক প্রতিরোধ। প্যাসিভ বলে চিহ্নিত হলেও তা হৃদয়ের উপর অ্যাকটিভ। নয়তো যীশুর বিচারই বা হতো কেন, প্রাণদণ্ডই বা হতো কেন? টলস্টয় যে শিক্ষা যীশুর কথামৃত থেকে পান সেই শিক্ষাই দিয়ে যান তাঁর শেষবয়সের বাণীতে। সে শিক্ষা গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করে। কর্মপদ্ধতি গান্ধীজীর।

টলস্টয়ের উত্তরাধিকার একদিকে যেমন গান্ধীজীতে বর্তায় তেমনি আরেকদিকে রম্যা রলাঁয়। টলস্টয়ের পরে রলাঁকেই বলা হয় ইউরোপের বিবেক। প্রথম মহাযুদ্ধে রলাঁ ছিলেন যুদ্ধবিরোধী। ফলে স্বদেশ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসিত। কিন্তু মুসোলিনি ও হিটলারের অভ্যুদয়ের পর তাঁদের হিংসাত্মক মতবাদ ও কার্যকলাপ রলাঁকে এক পা এক পা করে টলস্টয়পন্থা থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। রলাঁ যে কেবল টলস্টয়েরই উত্তরাধিকারী ছিলেন তাই নয়; ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের নায়কদেরও উত্তরাধিকারী। তাই রুশবিপ্লবের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মার সাযুজ্য। রুশবিপ্লব ফরাশীবিপ্লবের সন্তান। তাকে নাৎসীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হলে সশস্ত্র প্রতিরোধই ফলপ্রদ। অহিংস প্রতিরোধ নিষ্ফল। ইউরোপের বিবেক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে দেশরক্ষার তথা বিপ্লবরক্ষার যুগ্ম প্রয়োজনে অসিধারণ ব্যতীত অন্য পন্থা দেখতে পায় না। নীতিগতভাবে টলস্টয়পন্থা পরিত্যক্ত হয়। টলস্টয়ের শিক্ষা ছিল, কোনো অবস্থাতেই হিংসা নয়। চার্চের শিক্ষা, রাষ্ট্রের শিক্ষা আক্রমণের মুখে হিংসা। রলাঁর শিক্ষাও শেষপর্যন্ত তাই।

মৃত্যুর পূর্বে রলাঁ সুইটজারল্যাণ্ড থেকে ফ্রান্সে ফিরে যান ও নাৎসীদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলে স্বগ্রামে ও স্বগৃহে বাস করেন। তখন তিনি মগ্ন হন সঙ্গীতসাধনায়। বিশেষত বেঠোভেনের সঙ্গীতে। বেঠোভেন, গ্যেটে ও টলস্টয় এই তিনজনই ছিলেন

তাঁর আত্মার আত্মীয়। এঁদের মধ্যে বেঠোভেনই তাঁর কাছে অগ্রগণ্য। টলস্টয়ের প্রভাব যদিও তাঁর শিল্পকর্মের উপর পড়েছিল তবু তার সামনে ছিল বেঠোভেনের আদর্শ আদি থেকে অন্তকাল অবধি। বেঠোভেনও আপসহীন। কী জীবনে কী শিল্পে। রলাঁর জাঁ-ক্রিস্তফ বেঠোভেনের আদলে আঁকা। রলাঁ টলস্টয়ের দিকে তাকাতেন চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত। 'জা-ক্রিস্তফ' লিখতে লিখতে সাহিত্যে টলস্টয়ের প্রভাব কাটিয়ে ওঠেন।

কোন্‌টা রাশিয়ার পক্ষে ভালো, কোন্‌টা জনগণের পক্ষে ভালো, কোন্‌টা নীতির দিক থেকে ভালো, কোন্‌টা শিল্পের দিক থেকে ভালো, এ নিয়ে টলস্টয়ের সঙ্গে মতভেদের অবকাশ টলস্টয়ের জীবদ্দশাতেও ছিল, পরে তো রয়েছেই। তাঁর নিজের দেশেই তিনি এখন কুলুঙ্গীতে তোলা এক ঠাকুর। সকলেই তাঁর বন্দনা করে, কিন্তু কেউ তাঁর অনুসরণ করে না। রবিঠাকুর তাঁরই মতো একজন ঠাকুর হলেও এখনো আমরা কয়েকজন আছি যাঁরা তাঁর উত্তরপুরুষ বলে পরিচিত হই। ওদিকে কিন্তু রলাঁর অনুসরণ আর কেউ করেন না। তাঁর স্বদেশে তিনি কুলুঙ্গীতে তোলা ঠাকুরও নন। কেবল তাঁর একার নয়, তাঁর সমসাময়িক প্রায় সব আদর্শবাদী সাহিত্যিকদের একই দশা। আদর্শবাদের উপরেই পাঠক-সাধারণের বিরাগ। কিসে তাদের ভালো সাহিত্যিকরা সেটা নির্দেশ করতে যাবেন কেন? তারা কি শিশু? না সাহিত্যিকরা গুরুমশায়? আর ভালোরই কি কোনো সংজ্ঞা বা মাপকাঠি আছে? পাঠকের রুচি অরুচিকে উপেক্ষা করে লেখক যদি তাঁর রুচি অরুচিকেই ভালো বলে পরিবেশন করেন তবে পাঠকও সে উপাদেয় ব্যঞ্জন উপেক্ষা করতে পারে।

ভালো নয় বলে টলস্টয় তাঁর নিজের যেসব কীর্তিকে খারিজ করেছিলেন এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর সেইসব কাহিনীই তাঁকে অমর করে রেখেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকরাও পরম সমাদরে পাঠ করে 'আনা কারেনিনা'। টলস্টয়ের মতে খারাপ বই। রবীন্দ্রনাথের মতে বিশ্রী। কিন্তু সাহিত্যরসিকদের অধিকাংশের মতে বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কারো কারো মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের বিচার টলস্টয় বা রলাঁ বা রবীন্দ্রনাথের উপর ছেড়ে দেওয়া ভুল। তাঁরা স্রষ্টা, সৃষ্টিকর্মনিপুণ। বিচার করবেন সাহিত্যের যাঁরা জহুরী। আর সাহিত্যের যাঁরা তন্নিষ্ঠ পাঠক। সাহিত্যকে সাহিত্য বলেই ভালোবাসে। যে বই বার বার শতবার পড়েও তৃপ্তি হয় না, আবার পড়তে ইচ্ছে করে, সেই বইই ভালো বই। তেমন ভালো বইয়ের তালিকায় টলস্টয়ের 'সমর ও শান্তি' শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে স্বদেশে বিদেশে সব দেশে। অবশ্য কথাসাহিত্যে। নাটকে নয়। সেখানে শেক্সপীয়ারের স্থান টলস্টয় পূরণ করতে পারেননি। তেমনি কাব্যেও গ্যেটের স্থান। আধুনিক সাহিত্যের কথাই বলছি। সাহিত্যের বিচারে দেশ বা জনগণ বা নীতির চেয়ে রসের ও রূপের গণনাই প্রধান। রসস্রষ্টা ও রূপস্রষ্টা টলস্টয় দেশে দেশে যুগে যুগে আদরণীয় ও বরণীয়।

সমর ও শান্তি

দুটি কথায় জীবন হচ্ছে সংগ্রাম ও বিশ্রাম।

ভারতীয়রাও এমনিতর একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ। কিন্তু ইউরোপীয়রা বলতে পারেন জীবনের প্রতি অবস্থায় তো দুঃখ সুখ জড়িয়ে রয়েছে, ওদের পারম্পর্য কোথায়? পরম্পরা যদি থাকে তবে তা সংগ্রামের ও বিশ্রামের। সংগ্রামে যে কেবলই দুঃখ তা নয়, আর বিশ্রাম যে অবিমিশ্র সুখের তা-ও নয়। সুখদুঃখ-নিরপেক্ষভাবে সংগ্রাম হচ্ছে সংগ্রাম এবং বিশ্রাম হচ্ছে বিশ্রাম। এবং দুই মিলিয়ে জীবন যদি হয় পদ্য তবে 'সংগ্রাম' ও 'বিশ্রাম' বোধ হয় 'দুঃখ' ও 'সুখ' অপেক্ষা গাঢ়তর মিল।

ইউরোপের ইতিহাস— ইউরোপ-নির্দিষ্ট অর্থে মানবের ইতিহাস— মাত্র দুটি শব্দের উলটপালট খেলা। সমর ও শান্তি। কখনো রাজাতে রাজাতে, কখনো রাজাতে প্রজাতে, কখনো বা নেশনে নেশনে সমর যেন একটার পর একটা ঢেউয়ের ভেঙে পড়া। আর শান্তি যেন সেই ঢেউয়ের পা টিপে টিপে ফিরে যাওয়া। এ খেলা ফুরোয় না, ফুরোবার নয়।

টলস্টয় প্রণীত 'সমর ও শান্তি' নেপোলিয়নীয় যুগের ইতিহাস। ইতিহাসের আক্ষরিক অর্থে নয়। তাই উপন্যাসপর্যায়ভুক্ত। অথচ সাধারণ উপন্যাসের মতো এক জোড়া নায়কনায়িকার বৃত্তান্ত নয়। এর নায়ক বল নায়িকা বল সে হচ্ছে স্বয়ং রাশিয়া, রাশিয়ার প্রাণ মন সম্মান। অথবা দেশ কালের সীমার মধ্যে স্থিত অসীম মানববংশ। ইতিহাসের সত্যকার বিষয় যদি হয় মানবভাগ্য তবে এই উপন্যাস হচ্ছে ইতিহাসের ভগ্নাংশ এবং বিষয় এর দেশকাল-রঞ্জিত মানবভাগ্য। এর অসংখ্য পাত্রপাত্রী হচ্ছে মানব-করতলরেখা।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে রুশ সৈন্যরা অস্ট্রীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় আউস্টারলিৎসের রণক্ষেত্রে। হেরে যায়, "হেরে গেছি" এই ভ্রান্তিবশত। প্রকৃতপক্ষে তাদের হারবার কথা ছিল না। ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশ সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সাক্ষাৎকার ঘটে, বন্ধুতা হয়। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে সেই মৈত্রী পর্যবসিত হলো শত্রুতায়। নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন কিন্তু রুশ সেনাপতি কুটুজো দেখেন যে প্রতিরোধ করলে নিশ্চিত পরাভব। নেপোলিয়নের সৈন্যরা অবাধে মস্কো প্রবেশ করল, কিন্তু মস্কো জনশূন্য। একটিও রাশিয়ান তাদের সহযোগিতা করতে চাইল না। কেউ জানে না কে লাগিয়ে দিল শহরে আগুন। এরা বলে ওরা লাগিয়েছে। ওরা বলে এরা লাগিয়েছে। লুটপাট

করে ফরাসীরা স্থির করল ফেরা যাক। কিন্তু যে বাঘ খাঁচায় ঢুকে পেট ভরিয়েছে ছাগ মাংসে তারই মতো দশা হলো তাদের। যতটা পথ এসেছিল ঠিক ততটা পথ ফেরার মুখে বহুগুণ বোধ হলো। কুটুজো ইচ্ছা করলে রাস্তায় হানা দিয়ে তাদের নির্বংশ করতেন। কিন্তু অনাবশ্যক রক্তপাতে তাঁর প্রবৃত্তি হলো না, তারা যখন স্বেচ্ছায় রাশিয়া ত্যাগই করছে। তাঁর কোনো কোনো সৈনিক কসাকদের দলপতি হয়ে চোরের উপর বাটপাড়ি করল। এইসব গেরিলা যুদ্ধে ও শীতে বরফে খাদ্যের অভাবে নেপোলিয়নের গ্রাঁদ আর্মে কাহিল হয়ে পড়ল, সৈন্যদের অল্পই বাঁচল। তাও হলো পথি বিবর্জিত। নেপোলিয়ন চুপি চুপি দিলেন মস্ত এক লম্ফ!

এই হলো কাঠামো। সাধারণ ঔপন্যাসিক হলে তাঁর পাত্রপাত্রীদের দিয়ে বড়ো বড়ো কাজ করাতেন। নতুবা যারা বড়ো বড়ো কাজ করেছে বলে ইতিহাসে লেখে তাদেরকেই করতেন পাত্রপাত্রী। জাতীয় গৌরবের রঙে সমস্তটা হতো অতিরঞ্জিত। সাধারণ ঐতিহাসিক হলে ঘটনার পশ্চাতে দেখতেন মানুষের ইচ্ছা, মানুষের পরিকল্পনা, মানুষের দূরদৃষ্টি। সেনাপতিদের চাল দেওয়া, সৈনিকদের বোড়ের মতো চলা, অধিককৌশলীর জয়লাভ। পরাভূত পক্ষের ঐতিহাসিক ধরতেন উঠোনের দোষ— নেপোলিয়নের সর্দিকে করতেন দুর্ঘটনার জন্য দায়ী। ঘটনাচক্রে কুটুজো মস্কো রক্ষা না-করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে সাব্যস্ত করলেন তাঁর পরামর্শ পরিষদের সম্পূর্ণ অমতে। আর রোস্টোপশিনের শত চেষ্টা সত্ত্বেও শহরের লোক যেদিকে পারে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল, নেপোলিয়ন থাকতে সেখানে ফিরল না। জাতীয় ঐতিহাসিক হলে টলস্টয় বলতেন, এ কি আমরা না-ভেবেচিন্তে করেছি? আমরা অনেকদিন থেকে মাথা খাটিয়ে ঠিক করেছিলুম যে নেপোলিয়নকে বাধা না দিয়ে দেশের ভিতরের দিকে টেনে আনব ও মস্কো খালি করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখব।

টলস্টয় ঋষি। তিনি তাঁর দিব্যদৃষ্টিযোগে প্রত্যক্ষ করলেন ঘটনা কেমন করে ঘটল। কেমন করে ঘটে থাকা সম্ভব। যারা খেলা করে তারা জানে কার কত দূর দৌড়। কিন্তু যুদ্ধে অপর পক্ষের সামর্থ্য পরিমাপ করবার কোনো ধ্রুব মান নেই। যারা লড়াই করে তাদের ঐটেই একমাত্র ভাবনা নয়, তারা সবাই বীরও নয়। তাদের নিজেদের ছোট ছোট ঈর্ষাদ্বেষ, তাদের কারুর মনে পড়ছে ঘরসংসার, কেউ গণনা করছে কবে মাইনে পাওয়া যাবে। সেনাপতিদের এক-একজনের এক-এক মত, তাদের সবাইকে এক মনে কাজ করানো প্রধান সেনাপতির নিত্য সমস্যা। পদাতিকদের অনুপ্রেরণা জয়গৌরব ততটা নয় যতটা লুটতরাজ। মরণের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েও বীরপুরুষেরা লুটের মাল আঁকড়ে থাকে। যুদ্ধ জিনিসটা একজনের হুকুমে হয় এর মতো ভ্রান্তি আর নেই। যুদ্ধ হয় একবার কোনো মতে শুরু করে দিলে আপনা-আপনি। থামে হয়তো একটা উড়ো কথায়। কেউ একজন চেঁচিয়ে উঠল, "আমরা হেরে গেছি।" অমনি সবাই ভঙ্গ দিল।

কেন যে যুদ্ধ হয়, কেন যে মানুষ মারে ও মরে, কী যে তার অন্তিম ফল টলস্টয়

তার সম্বন্ধে অজ্ঞেয়বাদী। নেপোলিয়ন হুকুম করলেন, "যুদ্ধ হোক", আর অমনি যুদ্ধ হলো এই সুলভ ব্যাখ্যায় তিনি সন্দিহান। নেপোলিয়ন নিয়তির বাহন, তাও একটা ঐরাবত কি উচ্চৈঃশ্রবা নন, প্রতিভা তাঁর নেই। মস্কোতে তিনি আগাগোড়া নির্বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। সেই শহরে খাদ্য মজুত ছিল ছয় মাসের। কিন্তু নেপোলিয়ন তার হিসাব রাখলেন না। সৈন্যরা লুটপাট করে তছনছ করল। মস্কোর ধনসম্ভার তাদের লোভ জাগিয়ে তাদেরকে এত দূর দেশে এনেছিল, সেই লোভের তাণ্ডব নাচ চলল। নেপোলিয়ন মোরগের মতো নিশ্চিত জানতেন যে নাগরিকরা তাঁর লম্বা চওড়া ইস্তাহার পড়ে ফিরবে, আবার দোকানপাট বসাবে। গ্রামিকরা আসবে মাছ, তরকারি বেচতে। তাদেরকে তিনি ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন যে, যুদ্ধে যেমন তিনি অপরাজেয় শান্তিকালেও যেমনি তিনি প্রজারঞ্জক।

রাশিয়ার জনগণকেই টলস্টয় দিয়েছেন সাধুবাদ। তারা কোনো ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা চালিত হয়নি। তারা পরস্পরের পরামর্শ নেয়নি। তারা অন্তরে উপলব্ধি করল নিয়তির অভিপ্রায়। তাই মূঢ় রোস্টোপশিনের অনুজ্ঞায় কর্ণপাত না করে শহর ছেড়ে দিল। শহরে আগুন দিল কে তা কিন্তু বলা যায় না। হয়তো রাশিয়ানরা, হয়তো ফরাসীরা। যে-ই দিক সে নিয়তির ইঙ্গিতে দিয়েছে। বোঝেনি কিসের ফল কী দাঁড়াবে!

শত্রুর সঙ্গে অসহযোগ করব, ফিরব না মস্কোতে এই যে তাদের অপ্রতিরোধের সংকল্প এ-ও কারুর নির্দেশে বা শিক্ষায় নয়। এ-ও তারা একজোট হয়ে পরস্পরের পরামর্শ নিয়ে করেনি। এ তাদের প্রত্যেকের অন্তরের আদেশ। এমন যদি না হতো তবে সম্রাট বা সেনাপতিদের ইচ্ছা নেপোলিয়নের ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রলয় বাধাত, প্রলয়ঙ্করের করতালি তো এক হাতে বাজে না।

শেষজীবনে টলস্টয় যে জনগণের স্বভাববিজ্ঞতায় আস্থাবান হবেন, অপ্রতিরোধতত্ত্বের গোস্বামী হবেন, তার পূর্বাভাষ তাঁর যৌবনের এই গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়। নামহীন পরিচয়হীন মহাজনতায় আপনাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁর সাধনা। পারেননি, এমনি উগ্র তাঁর ব্যক্তিত্ব। বদ্ধমূল আভিজাত্য উন্মূল হলো না। তবু তাঁর দানবিক প্রয়াস একেবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশান্তরে রূপান্তর পরিগ্রহ করেছে ভারতের সত্যাগ্রহে, গান্ধীজীর জীবনাদর্শে। টলস্টয়কে দ্বিখণ্ডিত করে কেউ নিয়েছে তাঁর যৌবনের অনবদ্য শিল্পিত্ব। কেউ নিয়েছে তাঁর পরিণত বয়সের অপ্রতিরোধতত্ত্ব।

কিন্তু এই যে তাঁর জনগণের সহজ বিচারের প্রতি আস্থা এই তাঁর উভয় বয়সের, উভয় প্রতিকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য নির্ণয়ের সংকেত। শিল্পী-ঋষি ও সাধু-ঋষি মূলত ঋষি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের কোন রহস্য ধরা পড়েছে? ধরা পড়েছে এই যে, যাবতীয় ঘটনার যথার্থ পাত্রপাত্রী ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নন। নামপরিচয়হীন নির্বিশেষ জনতা যা করে তাই হয়। এবং যা করে তা নিয়তির চালনায়। নিয়তি অন্ধ নয়, খেয়ালী নয়, তার ব্যবহারে আছে নিয়ম। যেমন পৃথিবীর ঘূর্ণন আমাদের অনুভূতির অতীত বলে আমরা একদা তাকে স্থাণু মনে করেছিলুম তেমনি নিয়তির

ইচ্ছায় কাজ করতে থেকেও আমরা তার সম্বন্ধে অচেতন, আমরা ঠাওরাচ্ছি আমরা ইচ্ছাময়।

সমর থেকে ওঠে নিয়তির কথা। তেমনি শান্তি থেকে ওঠে প্রকৃতির। বিচিত্র সংসারের ধারাবাহিকতায় কত রস, কত রূপ। যুদ্ধ চলেছে নেপথ্যে নেপথ্যে। কিন্তু অলক্ষ্যে বালিকা হয়ে উঠেছে বালা, বালা হয়ে উঠেছে নবযুবতী। অন্তরালে শীতের সূর্য সুধাবর্ষণ করে যাচ্ছে, আকাশ ঘন নীল। কে বলবে যে এই সুন্দরী ধরণী একদিন হবে রণক্ষেত্র, বারুদের ধূমে ও গন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ পশুপক্ষীর হবে শ্বাসরোধ, পাতা ও ফুল যাবে বিবর্ণ হয়ে? টলস্টয়ের এই গুণকে কেউ কেউ আখ্যা দিয়েছেন আইডিল, সুখসরলতার ছবি। এক হিসাবে তা সত্য। সহজ, প্রসন্ন জীবন। বিশেষ অভাব অভিযোগ নেই। নেই তেমন কোনো দ্বন্দ্ব। কারুর অতি বড়ো সর্বনাশ ঘটে না, জীবনদেবতা সকলেরই শেষ নাগাদ একটা সদ্ব্যবস্থা করেন। কাউকে দেন সুমধুর মৃত্যু, মুখে হাসিটি লেগে থাকে। কাউকে রাখেন চিরকুমারী করে, নিজের নিষ্ফলতায় সন্তুষ্ট। কেউ আরম্ভ করেছিল বিশ্বের ভাবনা ভেবে। মরতে মরতে বেঁচে গেল। তারপর বিয়ে করল, সুখে থাকল।

আধুনিক পাঠকের এতটা শান্তি বিশ্বাস হবে না। তবে এটুকু পরিতোষ হবে যে পাপের পরাজয়, পুণ্যের জয় প্রতিপন্ন করবার অভিপ্রায় ছিল না ঋষির। আর এও না মেনে উপায় নেই যে প্রত্যেকটি কাল্পনিক চরিত্র ঐতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্রের মতো উৎরেছে। তার মানে ওরা আস্ত মানুষ, কবি ওদের দেখেছেন সকলের মাঝে, দেখিয়েছেন যথাযথরূপে। ওরা থাকলেও থাকতে পারত ইতিহাসের পাতায়। ইতিহাসে থাকলে বিশ্বাস করতুম ওদের জীবনযাত্রার শান্তি।

কথা হচ্ছে সমরের মতো শান্তিকালেও টলস্টয় পড়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ। সমরের যেমন নিয়তি, শান্তির তেমনি সহজ বিকাশ, বিশুদ্ধ অস্তিত্ব। দ্বন্দ্বের স্থান রণাঙ্গনে। গৃহে বড়ো জোর একটু মান অভিমান, সহজ কলহ। একটু ব্যঙ্গ, একটু রঙ্গ। রাগ হলে, বা রাগ হওয়া উচিত বলে মনে করলে, একটা ডুয়েল। তাতে মরেও না শেষ পর্যন্ত কোনো পক্ষ।

শান্তিও যে আজ আমাদের দিনে সমরের নামান্তর, প্রকারান্তর, বলে গণ্য হবে তা তো ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে সূচিত হয়নি। বিশেষত রাশিয়ায়, এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের গণ্ডী কালচিহ্নিত। যেমন খাপ তেমনি তরবারি। তথাপি সেকালের চিন্তায় জমিদার ও চাষার সম্বন্ধ কেমন হবে সে জিজ্ঞাসা ছিল।

দুই

সমসাময়িক সমস্যার চেয়ে টলস্টয়কে ঢের বেশী আকুল করেছিল সনাতন জীবনরহস্য। কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, বাঁচার মতো বাঁচা কাকে বলে? এর এক-একটি প্রশ্নের উত্তর তিনি এক-এক জনের চরিত্রে দিয়েছেন। মেয়েদের

মধ্যে নাম করা যায় নাটাশার, মারিয়ার, সোনিয়ার, হেলেনের। পুরুষদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় অ্যাণ্ড্রুকে, পিটারকে, নিকোলাসকে। যাদের অগ্রাহ্য করলুম তারা কেউ উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তাদের সংখ্যা শতাবধি। এত রকম এত ব্যক্তি অন্য কোন্ গ্রন্থে আছে? ডস্টয়েভ্স্কিও টলস্টয়ের পিছনে পড়ে যান।

নাটাশাকে আমরা প্রথম যখন দেখি তখন তার শৈশব সারা হয়ে গেছে অথচ কৈশোর উত্তীর্ণ হয়নি। সে দেখতে তত সুশ্রী নয়, বরং শ্রীহীন বলা যেতে পারে। কিন্তু রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে উচ্ছলিত প্রাণ। তখনো তার পুতুল খেলার অভ্যাস ভাঙেনি। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ে। তার সে হাসি সংক্রামক। এই মেয়ে বছর চারেক পরে হয়েছে ষোড়শী, ভাবাকুলা, সুদর্শনা। কিন্তু রয়েছে তেমনি প্রাণবতী। সামাজিক নৃত্যে সে এমন আনন্দ পায় যে তার নিষ্পাপ চিত্ত সকলের আনন্দ কামনা করে। তার উল্লাস যেন কোনো অপ্সরার, তা দিকে দিকে সৃষ্টি করে উল্লাস। তার অখলতা, তার অকৃত্রিমতা, তার সরল মাধুরী তার প্রতি আকৃষ্ট করল অ্যাণ্ড্রুকে। অ্যাণ্ড্রু উচ্চপদস্থ, উচ্চবংশীয়, উচ্চমনা। বয়সেও বড়ো। দেশের মঙ্গলের নানা পরিকল্পনা ছিল তাঁর ধ্যান। কিন্তু তাঁর প্রথম বিবাহের স্ত্রী তাঁর উপযুক্ত সঙ্গিনী ছিলেন না। সামাজিকতার অশেষ তুচ্ছতায় তাঁর প্রতিভার অফুরন্ত খুচরো খরচ হয়েছিল, বাজে খরচ। বিরক্ত হয়ে তিনি যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের স্বরূপ দর্শন করে তাঁর তাতেও অরুচি ধরল। যাকে আদর্শস্থানীয় বলে বিশ্বাস করেছিলেন সেই নেপোলিয়নকে নিকট থেকে দেখে বীতশ্রদ্ধ হলেন। প্রশান্ত নীল আকাশের নিচে আহত হয়ে পড়ে থাকার সময় তাঁর মনে হলো তাঁর বুদ্ধিগম্য যাবতীয় বিষয় অসার, সার কেবল ঐ অসীম বিশ্বরহস্য। এমন যে অ্যাণ্ড্রু তাঁরও নতুন করে বাঁচতে ইচ্ছা করল নাটাশার স্বতঃস্ফূর্ত, প্রাণপ্রবাহে ভেসে। তার নেই লেশমাত্র মলিনতা, সে ঝরনা। এক বছরের জন্যে অ্যাণ্ড্রু দেশের বাইরে গেলেন, ফিরে এসে নাটাশাকে বিয়ে করবেন। এই এক বছরে নাটাশা তাঁর প্রতীক্ষায় অধৈর্য হয়ে উঠল। এল তার কুগ্রহ আনাতোল। ক্ষণিক উন্মাদনায় সে প্রতারকের কবলে আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিল, বাধা পেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল। বেঁচে গেল। কিন্তু বদলে গেল। অ্যাণ্ড্রু দেশে ফিরে যা শুনলেন তাতে তাঁর জীবনের স্পৃহা লোপ পেল, নারীর কাছে তিনি কোনো রূপ মহত্ত্ব প্রত্যাশা করলেন না, এত দুর্বল তারা। তিনি আবার গেলেন যুদ্ধে, এইবার মৃত্যু কামনা করে। আহত হয়ে আনীত হলেন, ঘটনাচক্রে নাটাশাদের আশ্রয়ে। মরণকালে তাঁর চিত্ত উদ্ভাসিত হলো দিব্য ভাবে। তিনি ক্ষমা করলেন, তিনি ভালোবাসলেন, প্রাণীমাত্রকে, সংসারকে। তাঁর মনে ব্যর্থতার নিত্য খেদ রইল না। অনুতপ্তা সেবিকা প্রিয়াকে আশীর্বাদ করলেন।

নাটাশাকে তার শৈশব থেকে ভালোবাসত পিটার। লোকটা কেবল যে লাজুক, ভালোমানুষ, কিম্ভূতকিমাকার, মাথাপাগলা তাই নয়, নামগোত্রহীন সত্যকাম। তাই কাউকে কোনোদিন জানায়নি ভালোবাসার কথা। হঠাৎ মারা গেলেন কাউন্ট বেসুকো, উত্তরাধিকারী হলো পিটার, বিরাট ভূসম্পত্তির তথা

পদবীর। তখন তাকে লুফে নিল নাটাশাদের চেয়ে উদ্যোগসম্পন্ন প্রতিপত্তিমান কুরাগিন বংশ। তার বিয়ে হলো যার সঙ্গে সে অসামান্য রূপবতী, সোসাইটির উজ্জ্বলতম নক্ষত্র, হেলেন। কোনো পক্ষে প্রেম নেই। বিভবের সঙ্গে সৌন্দর্যের বিবাহ। দুজনেই পরম অসুখী হলো। হেলেন খুঁজল অমন অবস্থায় ওরূপ সমাজের রানীমক্ষিকারা যা খোঁজে। আর বেচারা পিটার হলো ফ্রীমেসন। চরিত্রকে দিন দিন উন্নত করতে চেষ্টা করল, বিশ্বকল্যাণ-ব্রত-রত। দোষের মধ্যে মদটা খায় অপরিমিত। তার সেই ভালোবাসা তার অন্তরে রুদ্ধ থাকে। নাটাশার সঙ্গে তার সহজ বন্ধুতা। নাটাশা তাকে সরল জন্তুটি বলে সখীর মতো বিশ্বাস করে। নেপোলিয়ন যখন রাশিয়া আক্রমণ করলেন পিটারের ধারণা জন্মাল যে, বাইবেলে যে রাক্ষসের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী আছে নেপোলিয়নই সেই রাক্ষস এবং তাকে হত্যা করবে যে সে আর কেউ নয়, সে আমাদের পিটার, যে একটা বন্দুকও ছুঁড়তে জানে না। পিটারের প্রয়াসের শেষ ফল হলো এই যে পিটার অন্যান্যদের সঙ্গে ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়াল। তার চোখের সুমুখে মানুষ মরল ঘাতকের গুলিতে। তারও উপর গুলি চলবে এমন সময় তার প্রাণদণ্ড মকুব হলো, সে চলল বন্দী হয়ে ফিরন্ত ফরাসীদের সঙ্গে। কসাকদের সাহায্যে অন্যান্য বন্দীদের সহিত তাকেও উদ্ধার করল ডেনিসো ডোলোগো প্রভৃতি গেরিলা যুদ্ধের নায়ক। মৃত্যুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বহু লাঞ্ছনা সয়ে যে দুঃখ আমাদের পাওনা নয় সেই দুঃখকেও কেমন ভক্তির সহিত গ্রহণ করতে হয় তার দৃষ্টান্ত কারাটাইয়েভ নামক একটি পরম দুঃখী ঈশ্বর-বিশ্বাসীর জীবনে প্রত্যক্ষ করে পিটারের গভীর অন্তঃপরিবর্তন ঘটেছিল। শৌখীন মানবহিত আর তাকে উদ্‌ভ্রান্ত করছিল না। সে পথ পেয়েছিল। বিষাদিনী নাটাশাকে বিয়ে করে— ততদিনে হেলেন মরেছিল— সে দস্তুরমতো সংসারী হলো। নাটাশা আবার সেই আনন্দময়ী। প্রকৃতি নিজে তাকে সহজ আনন্দ জোগায়, উদ্ভিদকে যেমন রস। সে কালক্রমে ফলভারাবনত পূর্ণবিকশিত পাদপের মতো প্রসারিত, সমৃদ্ধ হলো। কে তাকে দেখে চিনবে যে এ ছিল একদিন তন্বী আলোক-লতা! তবু তাই তার প্রাকৃতিক পরিণতি। তা নইলে যা হতো সেটা তার বিকৃতি। নাটাশা টলস্টয়ের মানসী নারী। সে ভালো। কিন্তু সজ্ঞানে ও সাধনার দ্বারা নয়। শিক্ষার দ্বারা নয়। নীতির চুল চেরা তর্ক তার মনে ওঠে না। তার প্রাণ যা চায় সে তা-ই চায়। তার প্রাণ যা চায় তার ফলে অনর্থ ঘটলে সে তা ভোগে। নালিশ করতে চায় না।

অ্যাণ্ড্রুর বোন মারিয়া হচ্ছে কতক তার রূপহীনতার প্রতিক্রিয়ায়, কতক তার কঠোরস্বভাব জনকের তাড়নায় তপস্বিনী। তার সমবয়সিনীরা যখন খেলা করছে, লীলা করছে, শিকার করছে দুই অর্থে, মারিয়া তখন জ্যামিতির পড়া তৈরি করছে আর করছে লুকিয়ে অধ্যাত্মচর্চা। যা অমন দুঃখিনী হলে নারীমাত্রেই করে থাকেন আপনাকে ভাগবত জীবনের যোগ্য করছে নিষ্ঠার সহিত, বিবাহের তো প্রত্যাশা নেই। তা বলে আশা কি মরেও মরে! কতবার নিরাশ হলো। অবশেষে নাটাশার

ভাই নিকোলাস তার পৈত্রিক সম্পত্তির খাতিরে তাকে বিয়ে করল, অবশ্য বিয়ের আগে তাকে বিদ্রোহী প্রজাদের হাত থেকে উদ্ধার করে তার হৃদয় জিনে। তাদের বিয়ে বেশ সুখেরই হলো। মারিয়ার দীর্ঘাচরিত সংযম ও সাধুতা তাকে শুদ্ধ সুবর্ণের আভা দিয়েছিল। তার রূপহীনতাকে ঢেকেছিল সেই আভা।

নিকোলাস নাটাশারই মতো প্রাণময়, তবে সহাস্য নয়, সুগম্ভীর। তার সব কাজে হাত লাগানো চাই, উৎসাহ তার অদম্য, ব্যগ্রতা তার মজ্জাগত। ঘোড়ায় চড়া, ঘোড়া খরিদ, তরুণ সৈনিকের ভাবনাশূন্য জীবনের হাজার ভাবনা, শিকার, জুয়া এইসব তার বাহির্মুখিত্বের নানা দিক। তাকে ভালোবাসে তাদের পরিবারের আশ্রিতা একটি মেয়ে, সোনিয়া। নিকোলাস তাকে ভালোবাসে, সে ভালোবাসা তার অন্যান্য কাজের মতো ছেলেমানুষী। কথা দিয়েছিল বিয়ে করবে, কিন্তু সোনিয়ার অপরাধ সে নির্ধন। তাকে বিয়ে করলে নিকোলাসদের নষ্ট সম্পত্তি ফিরবে না। তার বাবা যে জুয়ায় সব হারিয়ে বসে রয়েছেন। নিকোলাসের মায়ের পীড়াপীড়িতে সোনিয়া তাকে তার প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সুখ বিসর্জন দিল। নিকোলাস বর্তে গেল, সে তো কিছুতেই তার পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট করতে পারত না, অথচ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবার মতো বেইমান সে নয়। সোনিয়া এই কাব্যের উপেক্ষিতা।

ডোলোগো নিকোলাসের বন্ধু। কিন্তু দিব্যি বন্ধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল জুয়াতে ভীষণ হারিয়ে। লোকটা অসাধারণ সাহসী, অথচ অবাধ্য। তার মনে একট বড়ো দুঃখ সে গরিব। তাতে তাকে নির্দয় করেছিল। তার আর একটা বৃহৎ ক্ষোভ সে একটিও নারী দেখলো না যাকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে, পূজা করতে পারে। তার ধারণা রানী থেকে দাসী পর্যন্ত প্রত্যেক রমণীকে কেনা যায়। সে যে বেঁচে আছে তা শুধু তার মানসীকে হয়তো একদিন দেখতে পাবে এই অসম্ভব আশায়। ততদিন সে শয়তানী করবে। করবে গুণ্ডামী। তার বিধবা মা আর কুব্জা বোন আর গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া সবাইকে সে বেখাতির করবে।

টলস্টয়ের বর্ণনাকুশলতা এমন যে পদে পদে মনে হতে থাকে টলস্টয় স্বয়ং এসব দেখেছেন, এসব জায়গায় উপস্থিত থেকেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে, মন্ত্রণাসভায়, দরবারে, অভিজাত মহলে, ফ্রীমেসনদের আড্ডায়, গ্রামের বাড়িতে, শিকারের পশ্চাতে, নাচের মজলিসে, চাষাদের সঙ্গে, বন্দীদের সাথে, গেরিলা দলে— সর্বঘটে তিনি আছেন। কল্পনার এই পরিব্যাপ্তি, সহানুভূতির এই প্রসার বিশ্বসাহিত্যে বিরল। অবশ্য সমাজের নিম্নতর স্তরগুলিতে তাঁর চিত্তের প্রবেশ ছিল বলে মনে হয় না। থাকলে তিনি হয়তো শেষ বয়সে তাদেরই দিকে সম্পূর্ণ হেলতেন না। তারপর এত খুঁটিনাটি ভালোবাসতেন বলে তার প্রতিক্রিয়াবশত শেষের দিকে একেবারে ও-জিনিস বর্জন করলেন। এক চরমপন্থা থেকে অপর চরমপন্থায় চললেন। টলস্টয়ের জীবনের তথা আর্টের ট্র্যাজেডি এই।

আলোচ্যগ্রন্থে তিনি যাকে জয়যুক্ত করেছেন সে পিটার, নাটাশাযুক্ত পিটার। কারাটাইয়েভ মরণের পূর্বে তাকে যে মন্ত্র দিয়েছিল তার প্রতিধ্বনি তার কানে

বাজতে থাকে। জীবনই সমস্ত। জীবনই ভগবান। সর্বভূতের আছে গতি। সেই গতিই ভগবান। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ আছে ভগবানের অস্তিত্বকে জানবার আনন্দ। জীবনকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা হয়। জীবনে সবার চেয়ে কঠিন অথচ সবচেয়ে গুণের কাজ হচ্ছে জীবনের যাবতীয় অহেতুক জ্বালা সত্ত্বেও জীবনকে ভালোবাসা।

(১৯৩৪)

ফাউস্ট

ব্যক্তির জীবনে দেখি এক বয়সের একটি আইডিয়া দিন দিন পরিণত হতে হতে পরবর্তী বয়সে যেই সম্পূর্ণ হয় অমনি সমাপ্ত হয়। তখন আর মনের ভিতর তার খোঁজ পাওয়া যায় না, তার আশ্রয়স্থল তখন স্মৃতি।

জাতির জীবনেও সেইরূপ। তবে জাতির জীবন হচ্ছে বড়ো স্কেলের ব্যাপার। যেমন তার আকার তেমনি তার আয়ু। তার সামান্য দুই দশ শতাব্দীর ইতিহাসে কত ঘটনা. কত অঘটন, কত রাজ্য ভাঙাগড়া কত পতন অভ্যুদয়। এত কিছুর মধ্যেও এক একটি আইডিয়া জাতির মানসে স্পষ্টতা লাভ করছে। পরিশেষে একটি অনুষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানে, একটি আন্দোলনে বা বিপ্লবে, একখানি কাব্যে বা কীর্তিতে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে।

ইউরোপের মধ্যযুগে এমনি একটি আইডিয়া ছিল শয়তানের সঙ্গে চুক্তি। শয়তানকে লোকে ঘৃণা করত, গাল পাড়ত, ভয় করত অথচ শয়তানের আকর্ষণও তলে তলে অনুভব করত। ফাউস্ট নামে সত্যিকার এক পণ্ডিত নাকি শয়তানের কাছে পরকাল বিক্রয় করে ইহকালে শয়তানের শক্তি কিনেছিল। অত বড়ো জাদুকর নাকি আর ছিল না। মুখে ফাউস্টের মুণ্ডপাত করলেও মনে তার সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল সকলের। তার বিষয়ে রচিত হয়েছিল অনেক গ্রন্থ, চলিত হয়েছিল অনেক কাহিনী, অভিনীত হয়েছিল অনেক পালা। সেগুলিতে তার শোচনীয় পরিণাম— তার অপমৃত্যু ও শয়তানের অধিকারে তার আত্মার দুর্গতি— আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছিল বটে, কিন্তু যাবজ্জীবন লোকটা যে সুখের জীবন, শখের জীবন, যখন-যা খুশির জীবন কাটিয়ে গেল তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছিল সাড়ম্বরে।

ফাউস্ট হতভাগাটা যে অমন একটা চুক্তি করে, নিতান্তই ঠকে গেল মধ্যযুগের শেষভাগের মানুষ অন্তরে তা স্বীকার করতে পারছিল না। পরকালের ভয় যতই কমে আসছিল ইহকালের সম্ভাবনা ততই বৃহৎ মনে হচ্ছিল। বিজ্ঞান এল, প্রকৃতির বস্ত্রহরণ হতে থাকল, শয়তানী যন্ত্রপাতির সাহায্যে এঞ্জিনিয়ার একে একে বহু অসাধ্যসাধন করল। তখন জাদুকর ফাউস্টের উপর শ্রদ্ধা জাত হলো। শয়তানের খুর, লাঙ্গুল ও শিং খসে গেল। শয়তান বলা হলো বিশ্বসংসারের অন্তর্নিহিত সেই পরশ্রীকাতরতাকে যা অহরহ ছিদ্রান্বেষণ করে বেড়ায়, সাজানো বাগান শুকিয়ে দেয়, যজ্ঞ পণ্ড করে, ভালোকে দিয়ে ভালোর সর্বনাশ ঘটায়। এমন যে শয়তান সে মানবসংসারে ভদ্রবেশী।

কালক্রমে ফাউস্ট ও শয়তান উভয়ের বিবর্তন হয়েছিল জনগণের কল্পনায়।

গ্যেটে যখন উভয়ের চুক্তির আইডিয়াটিকে পূর্ণতা দিয়ে চুকিয়ে দেবার সংকল্প করলেন ততদিনে ফাউস্টের পরিণামসম্বন্ধে লোকের রুচি বদলেছে। লেসিং বললেন, ফাউস্টের তো স্বর্গে যাবার কথা। মৃত্যুর পরে তার আত্মা শয়তানের খপ্‌পরে পড়বে এ যে অসহ্য।

অথচ যে মানুষ সাক্ষাৎ শয়তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে মর্ত্যকেই পরম বলে গণ্য করল, স্বর্গের চিন্তা মনে আনল না, তাকে স্বর্গে নিয়ে গেলে পাপপুণ্যের পরিণাম-ভেদ থাকে না। আর শয়তানকেও তার শিকার থেকে বঞ্চিত করলে অন্যায় হয়। গ্যেটে এই সমস্ত কারণে চুক্তির মধ্যে একটি ফ্যাকড়া রাখলেন। ফাউস্ট বলল শয়তানকে, "তুমি আমাকে যা দেখাবে যা দেবে যেখানে নিয়ে যে অবস্থায় রাখবে তাতে যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্তোষ হয়, তাতে যদি আমি আসক্ত হই তবেই আমার আত্মা তোমার হবে।" শয়তান জানত মানুষের বাচ্চার দৌড় কত দূর। বলল, "বহুৎ আচ্ছা।" শেষ পর্যন্ত শয়তান ফাউস্টের সঙ্গে পারল না। ফাউস্ট বলে, "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনোখানে।" কিছুতেই তার তৃপ্তি নেই। "নেতি, নেতি।" এক শো বছর বয়স হলো, তবু সে নিরলস, নিত্য উদ্যত। একটু আরাম কি বিশ্রাম তাকে এক মুহূর্তের জন্য স্থাণু করল না। তার অন্তহীন চলার মাঝখানে এল মৃত্যু। এমন মানুষের আত্মার উপর কি শয়তানের কর্তৃত্ব সম্ভব না সংগত?

তবু সে স্বর্গে যেতে পারে না। স্বর্গে যাবার পক্ষে তার যোগ্যতা যথেষ্ট নয়। সে পাপে আটকে থাকেনি বটে, কিন্তু পাপের জন্যে সে অনুতপ্ত নয়। পুণ্যের প্রতি সে একদিন আকৃষ্ট হয়েছিল, পুণ্যবতীতে অনুরক্ত হয়েছিল. শয়তানের প্রেরণায় সে পুণ্যশীলাকে ভ্রষ্টা করে পলায়ন করেছিল। তার সেই প্রিয়া তার হয়ে প্রার্থনা করল কুমারী-জননীর সকাশে, কুমারী-জননীর করুণাকে তার প্রতি উন্মুখ করল, ভাগবত করুণায় হলো ফাউস্টের স্বর্গলাভ।

এইখানে গ্যেটের 'ফাউস্টে'র বিশিষ্টতা। ফাউস্টের আখ্যানের মধ্যে গ্রেচেনকে —কল্যাণীকে, সতীকে— প্রক্ষিপ্ত করলেন তিনিই। বিবর্তনের মধ্যে এই তাঁর প্রবর্তন। এর দ্বারা বিবর্তনের সমাপ্তি ঘটল, ফাউস্টের পরিণাম হলো চিরকালের সর্ব মানবের অভিলষিত।

এ ছাড়া তিনি আখ্যানটিকে যথেচ্ছ পল্লবিত করলেন। অর্ধ শতাব্দীকাল তাঁর দ্বারা পল্লবিত হতে হতে আখ্যানটি হয়ে উঠল উপলক্ষ মাত্র। মানবাত্মার মহানিয়তিকে সূত্র করে গ্রথিত হলো রাজনীতি, অর্থনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব, করুণাতত্ত্ব, সৃষ্টিবাদ, বিবর্তনবাদ, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মানবশিশু নির্মাণ, সমুদ্রশোষণ করে ভূখণ্ড বিস্তার ইত্যাদি প্রাচীন ও আধুনিক ভাবনা। গ্যেটের 'ফাউস্ট' যেন একখানি মহাভারতসার।

লোকসাহিত্যকে সাহিত্যে— প্রাকৃতকে সংস্কৃতে— উন্নীত করবার উদাহরণ এই প্রথম নয়। কালিদাসের 'শকুন্তলা', শেক্‌স্‌পীয়ারের 'হ্যাম্‌লেট্', প্রাচীন গ্রীক ট্র্যাজেডিসকল মূলত লোকমনের কল্পনা। প্রতিভাশালীরা লোক-কল্পনার অসম্পূর্ণ আলেখ্যের উপর তুলিকা স্পর্শ করে তাকে চিরকালের মতো সম্পূর্ণ করে

দেন। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা লোক-সত্যেরও মর্যাদা রক্ষা হয়, প্রতিভাশালীকেও কালের বিচার সম্বন্ধে সন্দিহান হতে হয় না। আমার একার জিনিস সকলের হাতে দিলে আমাকে ঝুঁকি নিতে হয়, কে জানে হয়তো ওরা আমার অসাক্ষাতে ওর তত্ত্ব নেবে না। সকলের ঘরের জিনিস আমার হাত দিয়ে ছুঁইয়ে ফিরিয়ে দিলে সকলের হয়ে থাকবে— উপরন্তু আমার হয়ে থাকবে। কালিদাস বা শেক্‌স্‌পীয়ার বা গ্যেটে যদি গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিজের হাতে বানাতেন তবে সেটা হতো একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট, যার কাজ শাড়ির পাড়ে ফুল তোলা তার পক্ষে শাড়ি বোনার মতো। অনাবশ্যক শক্তিক্ষয় তো হতোই, তার পর সে এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট কখনো নিপুণ হস্তের নির্মিতি হতো না। প্রতিভাশালীদেরও অধিকারের সীমা আছে। সীমার বাইরে গিয়ে শক্তিক্ষয় করতে তাঁরা স্বভাবত পরাঙ্‌মুখ। অবশ্য সীমার অর্থ কৃত্রিম গণ্ডী নয়। সীমা হচ্ছে স্বধর্মের সীমা।

বহু জনের পায়ে চলার পথ বহু দিনের পরীক্ষিত। নিজের জন্যে স্বতন্ত্র করে নতুন একটা পথ না কেটে সেই পথে চলতে প্রতিভাশালীদের দ্বিধা নেই। তাঁরা জানেন যে তাঁদের ব্যবহারের দরুন প্রাচীন পথ চিরনবীন বলে মনে হবে। তাঁদের স্বীকৃতির দরুন গ্রাম্য পথ রাজপথ বলে গণ্য হবে।

গ্যেটের 'ফাউস্ট' কাব্য কিংবা উপন্যাস না হয়ে নাটক হলো কেন? কাব্যের প্রাণ বেদনা, উপন্যাসের প্রাণ বিবরণ, চিত্রের প্রাণ বর্ণনা, নাটকের প্রাণ সংঘটন। লোকচিত্তের ফাউস্টে বেদনার সূচনা করলেন গ্যেটে স্বয়ং— গ্রেচেনের প্রেমে, বিষাদে, উন্মাদে। কিন্তু কাব্যের পক্ষে সেই যথেষ্ট নয়, বিষয়ের মর্ম নয় সে। আর উপন্যাসের পক্ষে যা প্রাণস্বরূপ তা ক্রিয়া নয়, ক্রিয়ার বিবরণ। লোকচিত্তের ফাউস্ট ক্রিয়ারত। তাই ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোজনা নিয়ে গ্যেটের 'ফাউস্ট' হলো নাটক। তার সবগুলি বাইরের ঘটনা নয়। বাইরের যেগুলি সেগুলি যথাযথ নয়। কোথায় ঘটছে, কবে ঘটছে— এ সমস্ত গৌণ। ঘটছে – এইটে মুখ্য। ফাউস্ট তো মধ্যযুগের মানুষ। সে ধরে রাখল প্রাগৈতিহাসিক হেলেনাকে। তাদের যে সন্তান হলো সে দেখতে দেখতে বড়ো হয়ে উঠল, উড়তে গিয়ে মারা গেল। যেন বাস্তব নয়, ইন্দ্রজাল। যাঁরা সাধারণ নাটকের মতো করে 'ফাউস্ট' পড়বেন তাঁরা বাস্তব ও ইন্দ্রজাল এর একটার থেকে অপরটাকে পৃথক না করতে পেরে উদ্‌ভ্রান্ত হবেন। ইন্দ্রজালের গুণ তা অসম্ভবকে সম্ভব বোধ করায়। দেশকালের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। রূপকথা ও ইন্দ্রজাল, এদের জাত এক। লোকচিত্তের ফাউস্ট তো ঐন্দ্রজালিক, তার কাহিনী রূপকথা। শয়তান যে ভদ্রলোক সেজে এল এ যদি বিশ্বাস হয় তবে হেলেনা ও ফাউস্ট যে মিলিত হলো ও সেই মিলন যে সদ্যফলপ্রদ হলো এতে অবিশ্বাস অরসিকত্ব।

বহির্বিশ্বে ও অন্তর্বিশ্বে যে দুটি— ও দুই জড়িয়ে একটি— ঘটনা-পরম্পরা রয়েছে সেই ঘটনা-পরম্পরা সম্বন্ধে বিশেষ বোধ না থাকলে 'ফাউস্ট' কিংবা কোনো বিশুদ্ধ নাটক বোঝা যায় না। সাধারণত অভিনয় আমরা দেখি উপন্যাসের। পড়ি

আমরা কথাবার্তার ভিতর দিয়ে গল্প। তার সঙ্গে থাকে ছবি মেশানো। ইদানীং ছবির ভাগ বেড়েছে। সাজ আসবাব আলো ইত্যাদির উপর থাকে চোখ আর কথা-বার্তার দিকে যায় কান। এর মধ্যে নাট্যবোধ কোথায়? স্টেশনে পৌঁছোতে একটি মিনিট দেরি হয়ে গেছে, সামনে দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে, কিছুই করতে পারছিনে, অনড় হয়ে অনিমেষ নয়নে চেয়ে আছি, নিজের এই অসহায়তা মন্দও লাগলো না, বুক যেন ট্রেনের চলার সংগীতে তাল দিচ্ছে— এই তো নাট্যবোধ।

পুত্তলিকার অভিনয় গ্যেটের আশৈশব প্রিয় ছিল। এক অদৃশ্য হস্ত ঝুলন্ত পুত্তলীদের চালন করছে, তাদের মুখের কথা অপরে বলে যাচ্ছে, তাদের অঙ্গভঙ্গি কৌতুককর অথচ মুখভাব অবিকৃত। চরিত্রের বিকাশ নেই, কিন্তু ঘটনার লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্যাভিমুখিত্ব নাটকের ধর্ম। গল্পেরও এটা একটা গুণ, কিন্তু গল্পের ধর্ম তার বিস্তার, তার অপ্রাসঙ্গিকতা। পাকা কথকরা কি কিছুতেই গল্প শেষ করতে চান? কিংবা গল্পের শেষটা ফাঁস করে দিতে? নাটকের শেষ কিন্তু আন্দাজ করা যায়। তা জেনে নিয়েও আমরা নাটক দেখতে কম আগ্রহী হইনে। এর প্রকৃত কারণ আমরা নিজেকে ছেড়ে দিয়ে অসহায় ভাবে ভেসে যেতে ভালোবাসি, বাঁচি আর মরি। ভয়ানক ভিড়ের মধ্যে পড়ে পিছনের চাপে আপনা-আপনি এগিয়ে যাবার রোমাঞ্চ আমাদের অস্থির করে। তাই ভিড় দেখলেই ভিড়ে যাই। বিশুদ্ধ ঘটনার টান যেন সমুদ্রের অন্তঃস্রোতের গ্রাস। রক্ষা নেই জেনেও নিজেকে সামলাতে পারিনে।

'ফাউস্টে' অনেক রকম অনেক ভিড়। নাগরিকদের উৎসব, ডাকিনীদের শিবরাত্রি (Walpurgis Night), পরীরাজ্যের স্বপ্ন, মহারাজসভা, পারিষদগণের ছদ্মবেশবিলাস, পৌরাণিক গ্রীসের শিবরাত্রি, হেলেনার কোরাস রাজশিবির, কুমারী-জননীর আশ্রম— প্রত্যেকটিতে অগণিত ব্যক্তির আবর্তন, গতিচাঞ্চল্য, কলগুঞ্জন। এদের বিচিত্র সত্তাও ঘটনার শামিল। ফাউস্ট এদের মধ্যে পড়ে যেন আপনা-আপনি এগিয়ে চলেছে। সাথী মেফিস্টোফেলিস— শয়তান। তার কাজ হলো কথায় কথায় ব্যঙ্গ, উপহাস, অবজ্ঞা, কুৎসিত, সমালোচনা।

'ফাউস্টে'র দুই প্রকার ব্যাখ্যা হতে পারে— একটি তৎকালীন, অন্যটি নিত্য কালীন। তৎকালীন ব্যাখ্যাটি এই। মধ্যযুগের মানব থিওলজির তত্ত্বকেই সত্য বলে বিশ্বাস করত। সেই বিশ্বাস তাকে একান্ত আশ্বাস দিত। যাহা নাই বাইবেলে তাহা নাই ধরাতলে। এমন সময় রেনেসাঁস এসে তার মনে জাগিয়ে দিল সৌন্দর্যের ধ্যান, জ্বালিয়ে দিল অনির্বাণ সংশয়। সে যে কত পুঁথি পড়ল তার সুমারি হয় না। এত পড়েও যার দিশা পেল না তার জন্যে ভানুমতী শিখল, যে পন্থা দুর্গম তাকে আরব্য উপন্যাসের ভৌতিক আসনে বসে আশু অতিক্রম করবার চেষ্টা দেখল।

সংশয়ের নাম শয়তান। শয়তান হচ্ছে জিজ্ঞাসা, চ্যালেঞ্জ, বিদ্রোহ, ছিদ্রান্বেষ, অভিমান। শয়তানকে গোলাম করে গুরু করে মধ্যযুগের মানব আধুনিক হয়ে উঠল। হলো বৈজ্ঞানিক, হলো যন্ত্ররাজ, ছেঁচল সাগর, কাটল (সুয়েজ পানামা) খাল, আশা রাখল আকাশে ওড়বার, অভিপ্রায় করল মানবশিশু নির্মাণের। সম্ভাবনার

অবধি নেই, আধুনিক মানব কোনখানে থামবে ? কত দূরে গিয়ে বলবে, এই আমার সামর্থ্যের সীমানা, এই পর্যন্ত জয় করে আমি নিশানা রেখে দাঁড়ি টানলুম ? আধুনিক মানব জীবনকর্মে ক্ষান্তি না দিতেই আসে মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি সে অনুতাপে দগ্ধ হবে ? গ্লানি বোধ করবে, লজ্জিত হবে ? না। যদিও যে স্বর্গকামনা করেনি, ভগবানকে ডাকেনি, তবু সেও ভাগবত করুণা থেকে বঞ্চিত নয়। সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উন্নতমনা, নিরলস, নিরাসক্ত। সে তো ঊর্ধ্বাভিমুখে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কেউ কি তার হাত ধরে তাকে তুলে নেবে না ? নেবে।

মানুষ আপন চেষ্টায় ত্রাণ পেতে পারে না. তাকে ত্রাণ করবার জন্য স্বর্গ থেকে করুণা নেমে আসে। এমনিতে কোনো ব্যক্তি করুণার যোগ্য নয়, শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরাও নন। করুণা কেউ দাবি করতে পারে না। সেটা প্রভুর খুশির খয়রাৎ। এল খ্রীস্টীয় করুণাতত্ত্ব, grace-এর কথা। এই তত্ত্বের সঙ্গে গ্যেটে একরকম সন্ধি করলেন। যদিও প্রকৃতপক্ষে করুণা হলো ভগবানের অহেতুক দান, তার পাত্রাপাত্র নেই, তবু সচেষ্ট ব্যক্তি তার আশা রাখতে পারে। ফাউস্টের মতো কর্মী তার দ্বারা অবশেষে ত্রাণ লাভ করে থাকে। "কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।" ফাউস্ট তাই করতে করতে ঠিক এক শো বছর বেঁচেছিল। তার একটা গতি না করলে খ্রীস্টীয় ভগবান আধুনিকদের নিকট মুখ দেখাবেন কী করে ?

ক্রিশ্চয়ানিটির সঙ্গে তো এই মর্মে সন্ধি হলো। কিন্তু মধ্যযুগের মানবের ছিল তে-টানা। টানছিল তাকে অযুত সম্ভাবনাবিশিষ্ট ভবিষ্যৎ— প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব, যন্ত্রকৌশল, বিজ্ঞানদৃষ্টি, পার্থিব হিত। টানছিল তাকে মৃত্যুর পরপারে অতিমর্ত্য পুণ্য, জাগ্রত করুণা, চিরনবীন কলেবর, অক্ষয় স্বর্গ। আবার উদ্বেগভাবনাশূন্য স্বাস্থ্যসুষমাসামঞ্জস্যের প্রতি, নীতিহীন দ্বিধাহীন কৃত্রিমতাহীন যৌবনের প্রতি, মানবজাতির স্বর্ণাভ অতীতের প্রতিও তার টান ছিল। ফাউস্টের তিনদিকে তিন আকর্ষণ— শয়তান, গ্রেচেন, হেলেনা। তিনজনকেই স্বীকার করে তিনজনের সঙ্গে তিনরকম বোঝাপড়া করা দরকার ছিল।

শয়তান যদি হয় সংশয়ের প্রতিরূপক, গ্রেচেন যদি হয় ক্রিশ্চয়ানিটির, তবে হেলেনা হচ্ছে মানবসৌন্দর্যের। আজও ইউরোপের ধ্যানে হেলেনার রূপই চিরন্তনী সুন্দরীর রূপ। ভারতবর্ষে তার তুলনীয় নেই। আমাদের রূপের আদর্শ অপ্সরাতে বা দেবীতে নিবদ্ধ রয়েছে, মানবীতে রক্তমাংস পরিগ্রহ করেনি। হেলেনার কথায় একমাত্র শ্রীরাধার কথাই মনে আসে, কিন্তু শ্রীরাধাতে প্রমূর্ত হয়েছে আমাদের প্রেমের আদর্শ - যার তুলনীয় ইউরোপে নেই।

মধ্যযুগের মানব হেলেনাকে উপেক্ষা করে জীবনকে সর্বাঙ্গীণ করতে পারত না। যারা হেলেনার আহ্বান শুনত তাদের ইহকাল-পরকাল যেত, আর যারা শুনত না তারা ছিল অবিদগ্ধ, অনাগরিক। ফাউস্ট হেলেনার সঙ্গে মিলিত হলো অথচ সেই মিলনে ভ্রমরের মতো পদ্মসমাধি পেল না। হেলেনাকে অতিক্রম করে গেল। সৌন্দর্য ও সন্ধিৎসা সংগত হয়ে যার জন্ম দিল সে কথা শোনে না, শূন্যে লাফ দিতে

দিতে ছুটে চলে, সে চায় সংগ্রাম, সে চায় যশ। প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগীয় ইউরোপের সন্তান দুরন্ত আধুনিকতা। তার কপালে আছে অপঘাত। কিন্তু কী বিমোহন তার তারুণ্য!

'ফাউস্টে'র নিত্যকালীন ব্যাখ্যা তাকে জাতিনির্বিশেষে সর্বমানবের করেছে। সে আমাদেরও।

মানুষের মধ্যে যে বহির্মুখিনতা আছে তাকে কেউ বলেছে শয়তান, কেউ বলেছে মার, কেউ বলেছে রিপু। তার সঙ্গে মানুষের যেন দ্বন্দ্বের সম্পর্ক। তাকে দমন করা, তার উপর জয়ী হওয়া, এই যেন মানুষের সাধনা। এই সাধনার মধ্যে সত্য যতটুকু থাকুক, একে অবলম্বন করলে ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে একাসনে বসে রইতে হয়, প্রকৃতির রূপ গন্ধ গান হয় নিষ্ফল নিরর্থক। এ সাধনায় সিদ্ধি যদি-বা আসে তবে সে যেন pyrrhic victory, তাতে প্রাপ্তির ভাগ ক্ষুদ্র।

এ ছাড়া অন্য এক সাধনা যে সম্ভব তা আমাদের জানা ছিল না। এতে পাপেরও স্থান আছে প্রলোভনেরও মূল্য আছে, শয়তানকে এ সাধনা শত্রু বলে না। কারুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব নেই, করুর উপর ভয় নেই, সকলে সহায়। সৌন্দর্যকে সম্ভোগ করতে হয়, বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ নিতে হয়, প্রবৃত্ত হতে হয় নব-নব অসাধ্যসাধনে। এই সাধনার মন্ত্র— এক-এক করে ছাড়িয়ে চলো, আটকে থেকো না। মানবাত্মার আসক্তি সাজে না, বিশ্রাম নেই, আরাম ভয়াবহ। ভোগ কর কিন্তু ভোগের পরক্ষণে ত্যাগ কর। ত্যাগের বেদনাকে এড়াতে চেয়ো না। ভালোও যথেষ্ট ভালো নয়। ভালোও আজ বাদে কাল ভালো নয়। ভালো মন্দ দুইই নিতে হবে, ছাড়তে হবে। পাপ করলেও পাপে জড়িয়ে যেয়ো না। প্রলোভনের অনুবর্তন কর, কিন্তু অধীন হয়ো না। এইভাবে চরিত্র পাক পূর্ণতা, চরিত্রবলের দ্বারা অক্ষত থাক। জীবন বৈচিত্র্যে ভরে উঠুক, উপলব্ধিতে আসুক সমৃদ্ধি, সত্যের সঙ্গে পরিচয় হোক সত্যতর।

মানুষ যদি কোনোখানে বাঁধা না পড়ে, ক্ষান্তি না দেয়, তবে প্রকৃতির নিয়মে তার মৃত্যু হলেও মৃত্যুতে তার বিরতি নেই। তার চলা এবার মর্ত্যে নয়, অতিমর্ত্য লোকে। এবার তার সাথী শয়তান নয়, শাশ্বতী। এই বিশ্বের অন্তর্লোকবাসিনী যে নারী মর্ত্যলোকে মানবসঙ্গিনী হতে পারল না, মর্ত্যে যার পরিসর সংকীর্ণ বলে অসীমের অভিসারক যাকে পরিত্যাগ করল, স্বর্গে সেই নারী ভাগবত করুণাবাহিনী, তারই নিত্য প্রার্থনা ভাগবত করুণাকে আবাহন করে আনল, গঙ্গোদকের মতো মানবের শীর্ষে ছিটিয়ে দিল, মানব ধরল দিব্য কলেবর। একটি কেন্দ্রে স্থিত হয়ে সে করেছে আপনাকে নিস্পৃহ, সে রেখেছে মুহূর্তের প্রেমকে চিরন্তন করে, তার তপস্যা তার প্রিয়তমকে ঘিরে। সেই কল্যাণরূপিণী যদি প্রদর্শক না হয় তবে মানব যে মানব-অভিজ্ঞতার চরমে গিয়ে— মৃত্যুতে উপনীত হয়ে— অমৃতের দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকবে, পায়চারি করতে থাকবে, প্রবেশ পাবে না। নারী তাকে ছাড়পত্র এনে দেয়, ভিতরে নিয়ে যায়, ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বতর লোকে ক্রমাগত নিয়ে চলে। সেই নিরুদ্দেশ ঊর্ধ্বযাত্রাই নিরন্তর স্বর্গভোগ। সে ভোগ নারীসমন্বিত।

পরমসঙ্গিনীর প্রশস্তিতে গেটের 'ফাউস্ট' সমাপ্ত হলো। স্থান বৈকুণ্ঠ, কাল চিরকাল। প্রশস্তিকারকরা স্বর্গীয় চারণ।

"All things corruptible
Are but reflection.
Earth's insufficiency
Here finds perfection.
Here the ineffable
Wrought is with love,
The Eternal-Womanly
Draws us above."

(১৯৩৩-৩৪)

সংস্কৃতির সংকট

ভারতবর্ষের মানচিত্র সাঁইত্রিশ বছর আগে যেরকম ছিল এখন সেরকম নয়। এখন দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান কার্যত মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ। আরব, ইরানের সঙ্গেই তার যোগাযোগ বেশি, স্বাধীন ভারতের সঙ্গে কম। যুগের বিচারে সে মধ্যযুগে অবস্থিত ; ইসলামী রাষ্ট্র হওয়াই তার লক্ষ্য। ইসলামের আদিযুগের অনুবর্তনে।

ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাসে মানচিত্রের পরিবর্তন বহুবার ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিবর্তন। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনও তার সঙ্গে তাল রেখেছে। সামাজিক পরিবর্তনও। ধর্মীয় পরিবর্তনও। এমনও দেখা গেছে যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ইরান, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গেই নিকটতর সম্বন্ধ, উত্তর ভারতের সঙ্গে দূরতর, উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে একেবারেই না। দক্ষিণ ভারতের তো কথাই নেই। তেমনি, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের তিব্বত, চীন ও বর্মার সঙ্গে নিকটতর সম্বন্ধ, উত্তর ভারতের সঙ্গে দূরতর, উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে একেবারেই না। দক্ষিণ ভারতের তো কথাই নেই। মহাদেশতুল্য এই বিশাল ভূখণ্ডকে একই সম্রাটের অধীনে আনতে প্রথমে চেষ্টা করেছিলেন মৌর্যরা, তাঁদের পরে গুপ্তরা, আরও পরে মোগলরা, সর্বশেষে ইংরেজরা। কিন্তু কেউ বরাবরের জন্যে নয়। ইংরেজ ছাড়া আর কেউ পুরোপুরিও নয়।

আর্য বলে যাঁদের চিহ্নিত করা হয় তাঁরা একটি ভাষাগোষ্ঠী, জাতিগোষ্ঠী নন। সুবিধার খাতিরে আমরা আর্যভাষাকে সংক্ষেপে বলি আর্য। এঁরা যে একই শতাব্দীতে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন তাও নয়। এঁদের মধ্যে একতাও ছিল কিনা সন্দেহ। তবে একটা বিষয়ে এঁরা এক ছিলেন। কালা আদমীকে মেরে কেটে বনবাসে পাঠাতে হবে। কিংবা দাস বানাতে হবে। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় তেমনি এখানেও কালক্রমে মিশ্র বর্ণেরও উদ্ভব হয়। তারাই হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের ভাষা হয়তো আর্যভাষা বা তদ্ভব বা তৎসম, কিন্তু বহু পরিমাণে দ্রাবিড় মিশাল, কিরাত মিশাল, নিষাদ মিশাল। অপরপক্ষের সঙ্গেও আর্য মিশাল হয়। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিও হয় আর্য অনার্য মিশাল, সমাজও হয় তাই, ধর্মও হয় তাই।

ধর্ম বলতে কেবল বৈদিক ধর্ম নয়, বেদবিরোধী যজ্ঞবিরোধী ব্রাহ্মণবিরোধী বৌদ্ধধর্মও বোঝায়, জৈন ধর্মও বোঝায়। বৈদিক ধর্মের সঙ্গে আবেস্তার ধর্মের যথেষ্ট মিল আছে। ইরানীরাও নিজেদের আর্য বলে দাবি করে। গ্রীকরাও যে ভাষায় কথা বলে সেটাও আর্য ভাষা। আবার এটাও লক্ষণীয় যে বৈদিক না হলেও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরাও আর্যভাষী। জৈন ধর্মাবলম্বীরাও তাই। ধর্মগত বিভেদ চর্মগত নয়,

ভাষাগত নয়। সমাজ মোটের উপর একটাই ছিল। সামাজিক আদানপ্রদানে বাধা ছিল না।

আর্যমিশ্র ভারতই পরে হিন্দুস্থান বলে চিহ্নিত হয়। অধিবাসীরা বৈদিক বৌদ্ধ জৈন নির্বিশেষে হিন্দু। বাইরে থেকে যেসব শক হুন গ্রীক আসে, তারা কালক্রমে হিন্দু সমাজের ভিতরেই এক একটা জাত বা কাস্ট বনে যায়, পরে আদান প্রদান সূত্রে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বর্ণভুক্ত হয়। গোড়ায় ছিল যবন বা বিদেশী। পরে আর যবন নয়, শকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বা রাজপুত। গোড়ায় অনাচারী বলে ম্লেচ্ছ, পরে সদাচারী হলে ম্লেচ্ছ নয়। হিন্দুরাও অবাধে সমুদ্রযাত্রা করত, ধর্মপ্রচার করত, বৌদ্ধমন্দির বা শিবমন্দির বা বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করত। সেই সূত্রে ইন্দোনেশিয়ার লোক হিন্দু সংস্কৃতি গ্রহণ করে। বোরো বুদর নির্মিত হয়। তারা কাম্বোডিয়া ও থাইল্যাণ্ডেও যায়। সেই সূত্রে আংকোর বট নির্মিত হয়। অবাধে পর্বত অতিক্রম করে তিব্বতে তথা মধ্য এশিয়ায়ও যায়। প্রধানত বাণিজ্যসূত্রে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচার সূত্রে। সেখান থেকে যায় মঙ্গোলিয়ায়, কোরিয়ায়, চীনে ও জাপানে। জাপানে এখনও বৌদ্ধদের প্রভাব।

ইতিহাস আলোচনা করে আমরা পাচ্ছি ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বিভিন্ন অংশের যত না যোগাযোগ বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ তার চেয়ে কম নয়। দুটি স্রোতই চার হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়েছে। একটি বহির্মুখী, অপরটি অভ্যন্তরমুখী। আমরা সবাই ভারতীয় বা হিন্দু এই বোধটা জন্মাতে অন্তত দু-হাজার বছর লেগেছে। একে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছে সংস্কৃত ভাষা। দক্ষিণের ভাষাগুলি যদিও উত্তরের ভাষাগোষ্ঠীর সামিল নয়, তবু সংস্কৃতকেই যোগাযোগের ভাষা করেছে। উত্তর ভারতের রাজারা অস্ত্রবলে দক্ষিণের রাজাদের পরাস্ত করতে পারেন নি, কিন্তু ব্রাহ্মণরা শাস্ত্র বলে তাঁদের বশীভূত করেছেন। যেখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা ব্যর্থ সেখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বা জৈন মুনিরা সফল। বৃহত্তর অর্থে হিন্দু তাঁদের প্রজারাও হয়। রামায়ণ মহাভারত উত্তর দক্ষিণের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। পরবর্তীকালে দক্ষিণ থেকেই উত্তর বিজয় আরম্ভ হয়। বিজেতারা শঙ্করাচার্য ও রামানুজ।

ভারতীয় সংস্কৃতির সংহতি মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এমন সময় দুটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। বাইরে থেকে তুর্ক বা আফগান এসে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করে, কিন্তু শক হুনদের মতো হিন্দু বনে যায় না। তাদের ধর্ম ইসলাম, নামকরণ আরবী, সংস্কৃতি পারসিক, নিবিড় সম্পর্ক মধ্য এশিয়ার সঙ্গে। মোগলরা যখন আসে তখনও তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মঙ্গোলিয়ার সঙ্গে। তাদের প্রথম তিন সম্রাটের ইতিহাস মঙ্গোলিয়ার ইতিহাসের সামিল। এটা আমি শুনেছি এক রুশ পণ্ডিতের মুখে। তুর্ক ও মোগলের বংশধরদের মিলিত নাম হয় মুসলমান। ধর্মান্তরিত হিন্দুরাও সেই নামে পরিচয় দেয়। মুসলমান বলে যে সমাজ সৃষ্টি হয় সে সমাজ ভারতবর্ষের ইতিহাসে নিজের অতীতকে খুঁজে পায় না, পায় ইসলামের ইতিহাসে। যার শুরু খ্রীস্টোত্তর ষষ্ঠ শতাব্দীতে। ইরানের ইতিহাস তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। ভারতের ইতিহাসও তেমনি। ইরানীরা এক ধার থেকে মুসলমান হয়ে গিয়ে সংঘর্ষ

এড়ায়। ব্যতিক্রম জরথুস্ত্র পন্থীরা। তারা পালিয়ে আসে ভারতে। কিন্তু হিন্দু হয় না। ভারতের লোক যদি একধার থেকে মুসলমান হত তাহলে এদেশেও সংঘর্ষ হত না। কিন্তু সাতশো বছর পরেও দেখা গেল অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেনি, মধ্যপ্রাচ্যের ভাষা বা সংস্কৃতির আমলে আসেনি। কিন্তু প্রশাসনিক ব্যাপারে ফার্সীকে মেনে নিয়েছে ও সেইসূত্রে কতক পরিমাণে পারসিক ভাবাপন্ন হয়েছে। অভিজাতকুল তুর্ক মোগল এলাকার বাইরেও পারসিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। হিন্দু ও শিখ রাজাদের পোশাক আসাক রাজভাষা ইত্যাদি বাদশাহ্ ও সুলতানদের মতো। সে পোশাক তো স্বাধীনতার পরেও বিশিষ্ট ভারতীয়দের অঙ্গে। দৃষ্টান্ত জওহরলাল নেহরু। যে ভাষায় তিনি কথা বলতেন সে ভাষাও উর্দূ। মোগলাই খানা তো আমাদের ঘরে ঘরে। ভাষার মধ্যেও আরবী ফার্সীর অংশ বড় কম নয়। বিশেষত জমিজমা সংক্রান্ত ভাষার। মামলা মোকদ্দমা তো আইন আদালত ছাড়া হয় না। উকিল মোক্তার বিনা।

দ্বিতীয় পরিবর্তনটি ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের বিদায়। কিন্তু অন্যান্য দেশ থেকে নয়। এক হাজার বছর আগে থেকেই সে ধর্ম এশিয়ার অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে শিকড় গজিয়েছে। পরবর্তী হাজার বছরে সে দৃঢ়মূল হয়েছে। এখনও সে জীবন্ত। ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বৃহৎ তার অধিকৃত ভূভাগ। বুদ্ধের যে কী মহিমা তা আমি জাপানে প্রত্যক্ষ করে এসেছি। বৌদ্ধধর্ম আদৌ একটি পতনোন্মুখ ধর্ম নয়। তার পতন যদি তার জন্মভূমিতে ঘটে থাকে তবে সেটা বুদ্ধের বা ধর্মের দোষে নয়, সঙ্ঘের দোষে। জাপানের ইতিহাসে দেখা যায় বৌদ্ধদের সঙ্ঘ রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে রাজশক্তির শরিক হয়েছে। শিন্তোরা এটা সহ্য করবে কেন? ক্ষমতা যখন মেইজি সম্রাটের নিজ হস্তে আসে তিনি বৌদ্ধদের হটিয়ে শিন্তোদের রাজ অনুগ্রহ বিতরণ করেন। শিন্তো ধর্মই হয় রাজধর্ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর শিন্তোদেরও হটানো হয়. কিন্তু বৌদ্ধদের তাদের জায়গায় বসান হয় না। জাপান এখন ধর্মনিরপেক্ষ। খ্রীস্টানদেরও সেখানে যথেষ্ট প্রভাব। একটি বৌদ্ধ পরিবারে আমি নৈশ ভোজনের নিমন্ত্রণ পাই। কিন্তু পরিবার বলতে যদি গৃহিণী বোঝায় তবে তা খ্রীস্টানই বা নয় কেন? ভদ্রমহিলা জাপানী ভিন্ন অন্য কোনও ভাষা জানেন না। খ্রীস্ট ধর্মের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। বাইবেল দেখতে চাইলে জাপানী বাইবেল নিয়ে আসেন। তাঁর পিতাও ছিলেন খ্রীস্টান। বোধহয় সেনাপতি বা সেইরকম কিছু। জাপান একদা ক্যাথলিক মিশনারিদের বহিষ্কার করেছিল, অত্যাচারও করেছিল দীক্ষিত খ্রীস্টানদের উপরে। তাঁরা নাকি তাঁদের সম্প্রদায়ের লোকদের রাজদ্রোহী হতে ও রাজ্য অধিকার করতে শেখাতেন। যেমন ফিলিপিনসে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজ্যের চেয়ে বাণিজ্যই হয় প্রধান অভীষ্ট। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিদেশীরা জাপানের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন না। যুদ্ধ যখন বাধে তখন সেটা ধর্মযুদ্ধ নয়।

ভারতেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। অশোকের আমল

থেকেই তাঁদের রাজানুগ্রহ লাভ। কনিষ্কও বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারণের জন্যে অশোকের পর কনিষ্কই সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ছিলেন। হর্ষবর্ধনও ছিলেন বৌদ্ধ, ধর্মপালও ছিলেন বৌদ্ধ। কিন্তু পালবংশের পতনের পর রাজশক্তির সঙ্গে বৌদ্ধ সংঘের বিচ্ছেদ ঘটে। রাজশক্তি চলে যায় বহুস্থলে বৈদিক হিন্দুদের হাতে, বহুস্থলে মুসলিম তুর্কদের হাতে। বৌদ্ধ রাজ্য বলতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তা সিকিমে, ভুটানে, পার্বত্য চট্টগ্রামে। সম্প্রদায়ও ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়। উল্লেখ করা আবশ্যক যে বৌদ্ধধর্মের আদি রূপও ক্রমে ক্রমে বদলে যায়। তথাকথিত হীনযানের পর মহাযানের উদ্ভব। তারপরে বজ্রযান প্রভৃতি আরও কয়েকটি যানের। এদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের অন্তহীন দলাদলি। প্রত্যেকেরই নিজস্ব এক সংঘ। সংঘের সকলেই সন্ন্যাসী। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। হাজার হাজার সন্ন্যাসীকে যারা খোরাক যোগাবে তারা হয় গরীব গৃহস্থ, নয় বড়লোক বণিক বা ভূম্যধিকারী, নয় রাষ্ট্র। এঁদের সাধ্য অপরিমিত নয়। কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল মঠবাড়ি নির্মাণ করে তার সম্পত্তি থেকে আয়ের উপর নির্ভরশীলতা। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্তদের মধ্যেও একই প্রবণতা। একবার মঠবাড়িতে ঢুকতে পারলে সারা জীবনের অন্নসংস্থান। সেখানে থাকে না কেবল নারীসঙ্গ। সেটাও নানাসূত্রে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবী, ভৈরবী, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর সংখ্যাও তো কম নয়।

সম্পত্তির লোভে মানুষ কী না করে। মঠবাড়ি গ্রাস করলে যদি অঢেল সম্পত্তি আত্মসাৎ করা যায় যারা বৌদ্ধ নয় তারা এ কর্ম করবে না কেন? এর জন্য ইসলামের আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে যাবে কেন? বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার অজাতশত্রুর এই ঘোষণা বৌদ্ধদের উচ্ছেদ করবারও ঘোষণা। তখনকারদিনে বাংলাদেশ ছিল আর্যাবর্তের বাইরে। দক্ষিণও ছিল তাই। বৌদ্ধরা এইসব বেদবর্জিত ভূখণ্ডে আশ্রয় নেয়। আর পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে। সেসব অঞ্চল থেকে আর্যভাষীরা অপসারণ করেছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাবিত বাংলাদেশ মুসলিম প্রভাবিত হতে হতে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয়। বৌদ্ধ প্রভাবিত উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত মুসলিম প্রভাবিত হতে হতে পশ্চিম পাকিস্তানে বিবর্তিত হয়। তবে দক্ষিণটা মুসলিম বিজেতারা পুরোপুরি জয় করতে পারেন না, তাই বৌদ্ধ প্রভাবের শূন্যতা পূরণ করে যাকে এককথায় বলা হয় নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এ ধর্মে বৈদিক আর্যদের যাগযজ্ঞ অশ্বমেধ গোমেধ ছিল না। গোমাতা এদের প্রত্যক্ষ দেবতা। বিষ্ণু, শিব, চামুণ্ডা প্রভৃতির সাকার পূজার প্রচলন হয়। ইন্দ্র, অগ্নি, সবিতা প্রভৃতির নিরাকার উপাসনার। নেতৃত্ব করেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা। তাঁদের প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ পিতামাতার সন্তান। স্ববর্ণপোষণ তাঁদের পবিত্র কর্তব্য। তাঁদের গদীতে যাঁরা মোহন্ত হন তাঁরাও জাত ব্রাহ্মণ। আজ পর্যন্ত।

ইসলামের আগমনের পর এই নব ব্রাহ্মণ্যধর্মের অজাতশত্রুদেরও শত্রু জোটে। এঁদের মন্দিরগুলিরও বিপুল সম্পত্তি ছিল। দেবমূর্তির বাইরে ও ভিতরে বহুমূল্য মণিমুক্তা। গজনীর মাহমুদ প্রভৃতির দিগ্বিজয়ের লক্ষ্য ছিল মন্দিরের, মঠবাড়ির,

দেবমূর্তির সম্পত্তিগ্রাস, সম্পদগ্রাস। তবে তুর্ক ও মোগলরা যখন এই দেশেই থেকে যান তখন সম্পত্তি বা সম্পদ নিয়ে ফিরে যাবেন কোথায় ও কেন? ইসলাম এমন এক ধর্ম যাতে রাজাও নেই, পুরোহিতও নেই, সুতরাং রাজতন্ত্রও স্বীকৃত নয়, পুরোহিত-তন্ত্রও স্বীকৃত নয়। এসব পরবর্তীকালের বিচ্যুতি। এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই যে রাজপুত্রই রাজা হবেন, আর তাঁরও হওয়া চাই প্রথম জীবিত কুমার। একই কথা পুরোহিতকুলের বেলাও। ইসলামের ইতিহাসে রাজার উত্তরাধিকারী নিয়ে, ইমামের উত্তরাধিকারী নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদের নিষ্পত্তি হয় গায়ের জোরে। আওরঙ্গজেবের গায়ের জোর ছিল, দারা শিকোর ছিল না। থাকলে তিনিও গায়ের জোরেই বাদশাহ হতেন, Primogeniture নিয়ম মতে নয়। তাঁর পিতাও গায়ের জোরে সিংহাসন পেয়েছিলেন। প্রেমিক হিসাবে শাহজাহান অদ্বিতীয় কিন্তু তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা খসরুর নিধনও তাঁরই আদেশে হয়।

মুসলিম সুলতান ও বাদশাহরা পরস্পরকে বিশ্বাস করতে না পেরে হিন্দুদের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন। লুটপাটের চেয়ে খাজনা আদায়ই শ্রেয়। সেটা হিন্দুরাই ভাল পারে। শান্তিতে রাজত্ব করতে হলে যুদ্ধবিগ্রহও রোজ রোজ করা যায় না। মুসলিম শাসকদের অনেকেই হিন্দু প্রজাদের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। কার্যকুশল হিন্দুদের জায়গা জমি লাখেরাজ দিতেন। সংস্কৃতির দিক থেকেও সমঝোতা হয়। হিন্দুস্থানী সংগীত, উর্দু মুশায়েরা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ভালবাসে। উর্দু ভাষা হয় বহু হিন্দু পরিবারের মাতৃভাষা। উর্দু সাহিত্য হিন্দুদের দানে ভরপুর। সমঝোতা হয় ধর্মের সঙ্গে ধর্মেরও। নানক, কবীর, চৈতন্য প্রভৃতির শিষ্যদের মধ্যে উভয় সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। সুফী মতবাদ হিন্দুদেরও আকর্ষণ করে। পীরদের মুরিদ হন হিন্দুরাও। কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করেন না। করতে হয় না। সহঅবস্থানই হয়ে দাঁড়ায় সর্বস্বীকৃত নীতি। হিন্দু, মুসলিম, শিখ রাজারা এটা মেনে নেন।

ব্রিটিশ আমলের গোড়ার দিকটাও ছিল ইউরোপীয় ইতিহাসের অঙ্গ। সমসাময়িক ইউরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে না নিলে এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারা শক্ত। ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গেই এসে হাজির হয় আধুনিক যুগ। ভারতবর্ষ নতুন করে পরাধীন হয়, সেটা সত্য। কিন্তু এটাও সত্য যে ভারতবর্ষ একই কালে মধ্যযুগের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়। দেশের আলোকপ্রাপ্ত অংশ এই মুক্তির স্বাদ পেয়ে নবলব্ধ জ্ঞানের আলোয় সবকিছুকে পরীক্ষা করে। প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও সমাজ ও সংস্কৃতি কী পরিমাণে সনাতন, কী পরিমাণে পুরাতন, কী পরিমাণে সংস্কারযোগ্য, কী পরিমাণে বর্জনযোগ্য, কী পরিমাণে রক্ষণযোগ্য। ইংরেজরা চিন্তার স্বাধীনতায়, প্রকাশের স্বাধীনতায় অভ্যস্ত। তারা রাজদ্রোহের গন্ধ না পেলে বাধা দেয় না। বাধা যেটা আসে সেটা স্বদেশেরই অন্ধকার অংশ থেকে। শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ ক্রমে তৃতীয়ার চাঁদ হয় তৃতীয়ার চাঁদ ক্রমে চতুর্থীর চাঁদ হয়, এমন সময় ওঠে আর্তরব। গেল, গেল, হিন্দু ধর্ম গেল, হিন্দু সমাজ গেল, হিন্দু সংস্কৃতি গেল, ইসলাম ধর্ম গেল, মুসলিম সমাজ গেল, মুসলিম সংস্কৃতি গেল। আমাদের সবকিছুই তো সনাতন, অপরিবর্তনীয়,

অবর্জনীয়, অসংস্কারযোগ্য। এটাই হল সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমি। সিপাহী বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু তার থেকে আসে স্বদেশী মনোভাব, দেশ আর ধর্ম একাকার হয়ে যায়, ধর্ম আর সংস্কৃতি আগেও একাকার ছিল, এখন হয় আরও বেশি একাকার। তবে মুসলমানদের বেলা দেশ বলতে বোঝায় ভারতবর্ষ নয়, ইসলামী দুনিয়া, যার একাংশ ভারত। অতখানি প্যান-ইসলামিজম মোগল আমলেও ছিল না। বৌদ্ধরা যখন ছিল তখন অতখানি হিন্দুয়ানীও কি ছিল ? এটাও একপ্রকার প্যান-হিন্দুইজম, যার বক্তব্য 'বেদ, ব্রাহ্মণ, রাজা ছাড়া আর কিছু নাহি ভবে পূজা করিবার।' বলা বাহুল্য, তিনি হবেন হিন্দু রাজা। যেমন রঘুপতি রাঘব রাজা রাম। তার জন্যে যদি ত্রেতাযুগে প্রত্যাবর্তন করতে হয় সেই শ্রেয়। রিভাইভালিজম হিন্দুদের ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির প্রেরণা যোগায়। তা বলে সে মোগল শাসনে ফিরে যেতে চায় না। মুসলিম রিভাইভালিস্টরা কিন্তু মোগল শাসনেই ফিরে যেতে উদ্‌গ্রীব। সেখান থেকে উজিয়ে চার খলিফার শাসনে। চার খলিফার শাসনই ছিল চিরন্তন আদর্শ। তার থেকে বিচ্যুতি ঘটেছে বলেই না বিশ্ব মুসলিমদের নিঃস্ব দশা।

ইউরোপের ইতিহাসের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা মানে এশিয়ার ইতিহাসের সামিল হওয়া। আমরা জাপানের দিকে তাকাই। ওকাকুরা আসেন প্রাচ্য সংস্কৃতির আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিতে। কুমারস্বামী আসেন প্রাচীন ভারতের শিল্পসৌকর্য পুনরুদ্ধার করতে। আমাদের চিন্তানায়কদের মনে দারুণ দোটানা, এক হাত ধরে টানে প্রাচীন ভারত, আরেক হাত ধরে আধুনিক ইউরোপ। প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপকে মেলান যায় কী করে ? মেলাতে না পারলে কি প্রাচীনের মায়া কাটাতে হবে ? না আধুনিকের মোহ ? ইতিমধ্যেই পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের মতো একপ্রকার প্রাচ্য রেনেসাঁস ঘটেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙালীদের মনোজীবনে। সেটা পুরোপুরি ইটালী বা ফ্রান্স বা ব্রিটেনের মতো নয়। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে অভূত-পূর্ব। প্রকাশ্য স্বদেশিয়ানা ও প্রচ্ছন্ন হিন্দুয়ানার দাপটে তা গতিবেগ হারায়। আমাদের সাধনা যেন ইউনিভার্সাল হওয়ার নয়, ওরিয়েন্টাল হওয়ার।

পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের মূল কথাটা কী ? মানুষও ইচ্ছা করলে ও সাধনা করলে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান হতে পারে। বিশ্বামিত্রের মতো নতুন জগৎ সৃষ্টি করতে পারে। সর্বগুণের সম্ভাব্যতা তার ভিতরেই নিহিত রয়েছে। সে স্বর্গে যেতে চাইবেই বা কেন ? স্বর্গ তো সে এই মর্ত্যভূমিতেই গড়ে তুলতে পারে। এর জন্যে একজন স্বর্গনিবাসী ঈশ্বরেরই বা কী দরকার ? খ্রীস্টধর্ম এসে গ্রীক, রোমান, টিউটনিক দেবদেবীদের বিদায় দিয়েছে। তাতে মানুষের কী ক্ষতি হয়েছে ? তেমনি, ঈশ্বরকেও বিদায় দিলে ক্ষতি কী ? ঈশ্বরকে বাদ দিয়েও এ জগতের সর্বরহস্য ভেদ করা যায়। যা দিয়ে তা করা যায় তার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে তাল রেখে দর্শনও চলবে। সাহিত্যও চলবে। স্থাপত্যও চলবে। কারিগরি শিল্পও চলবে।

মুশকিল হচ্ছে, বিজ্ঞানের কল্যাণে আর একটা গথিক ক্যাথিড্রালও হয় না, আর একটা তাজমহলও হয় না, আর এক একটা কোণার্কের মন্দিরও হয় না। হয়

না অজন্তার গুহাচিত্র, মাইলো দ্বীপের ভীনাস, তানসেনের ধ্রুপদ সংগীত। হয় না ভরতনাট্যম, রুশ দেশের ব্যালে, প্রাচীন গ্রীসের নাটক। পাশ্চাত্ত্য রেনেসাঁসের মানবিকবাদ যদি কেবলমাত্র বিজ্ঞাননির্ভর হত তবে তা একপেশে হত। বিজ্ঞানের মতো আরও একটা পাশ হচ্ছে আর্ট। তার নিয়মকানুন অন্যরকম। আর্ট নিয়ে যাঁরা থাকেন তাঁদের চাই অন্তরের প্রেরণা। সেটা আসতে পারে ভগবৎ প্রেম থেকে, মানব প্রেম থেকে, নারীর প্রেম থেকে, দেশের প্রেম থেকে। প্রেমের সঙ্গে রয়েছে সৌন্দর্য-সৃষ্টি। অসুন্দরের মধ্যেও তাঁরা সুন্দরকে দেখেন। ধার্মিক না হলেও তাঁদের চলে। কিন্তু রসিক না হলে চলে না। তাঁরা রসে অনুমগ্ন থাকেন।

রেনেসাঁস একপেশে নয়। কারণ মানুষ একপেশে নয়। বিজ্ঞান চর্চা থেকে যেমন শিল্পবিপ্লব আসে তেমনি দর্শন চর্চা ও নীতি চর্চা থেকে ফরাসী বিপ্লব। আধুনিক মানুষ পারলৌকিক মুক্তির কথা ছেড়ে ইহলৌকিক মুক্তির কথা ভাবে। রাজতন্ত্রের অধীনতা থেকে মুক্তি, পুরোহিততন্ত্রের অধীনতা থেকে মুক্তি, সাম্রাজ্যবাদীর অধীনতা থেকে মুক্তি, ক্রীতদাসের মালিকদের অধীনতা থেকে মুক্তি, কলামাত্রের কৃত্রিম বিধি-নিষেধ থেকে মুক্তি। এককথায় সার্বিক মুক্তি। লিবার্টি। যাদের লিবার্টি যথেষ্ট নয়, তারা চায় ইকুয়ালিটি। সাম্য। শ্রেণী সাম্য, জাতি সাম্য, বর্ণ সাম্য, নরনারী সাম্য, দেশ বিদেশ সাম্য। এও যথেষ্ট নয়। চাই মৈত্রী। ফ্র্যাটার্নিটি। দুই শতাব্দী ধরে এই ট্রিনিটির আরাধনা চলেছে। কোথাও যুদ্ধ, কোথাও বিদ্রোহ, কোথাও বিপ্লব ঘটেছে। সাধারণত সহিংস, কিন্তু কোনও কোনও দেশে অহিংস। ভারতবর্ষও তেমনি এক দেশ। কিন্তু একমাত্র নয়। প্যাসিভ রেজিস্টান্সের দৃষ্টান্ত টলস্টয় তাঁর স্বদেশের জনগণের মধ্যে পেয়েছেন, বিশেষ করে দুখোবরদের মধ্যে। সেটা ইংল্যাণ্ডের কোয়েকারদেরও ঐতিহ্য। সেদেশের মহিলারা সেই উপায়ে ভোট দেবার অধিকার আদায় করেন। সাম্যবাদ চিন্তা থেকে এসেছে মার্কসবাদ, নৈরাজ্যবাদ, হরেক প্রকার সমাজতন্ত্রবাদ। মৈত্রী চিন্তা থেকে এসেছে শান্তিবাদ, লীগ অব নেশনস্, ইউনাইটেড নেশনস্। বিশ্বব্যাপী নিরস্ত্রীকরণের কল্পনা। পারমাণবিক মারণাস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করার জল্পনা। অভূতপূর্ব নারী জাগরণ ঘটেছে। আর অভূতপূর্ব শূদ্র জাগরণ। শ্রমিক জাগরণ। প্রোলিটারিয়ান জাগরণ। গণজাগরণ। যেখানে বাধা পেয়েছে সেখানে আতিশয্যও ঘটিয়েছে। হেরেও গেছে। মোটের উপর যা হয়েছে তার নাম এককথায় প্রগতি।

রেনেসাঁসের পূর্বে সংস্কৃতির প্রেরণার উৎস ছিল ধর্ম। পরে তার উৎস হয় মানবিকবাদ। ফরাসী বিপ্লবের পরে মানবিকবাদের বিচিত্র শাখা প্রশাখা দেখা দেয়। রোমান্টিসিজম, আইডিয়ালিজম, ন্যাচারালিজম, রিয়ালিজম, ইমপ্রেসনিজম, এক্সপ্রেসনিজম, সুররিয়ালিজম ইত্যাদি। পুরাতন ক্লাসিসিজমও নতুন রূপ নিয়ে ফিরে আসে। সমস্তই মানুষকে আর প্রকৃতিকে নিয়ে। ঈশ্বরকে বা পরলোককে নিয়ে নয়। বিবর্তনতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে মানুষ কল্পনা করে সে ক্রমাগত উন্নতি করতে করতে একদিন অতিমানব হবে। মহামানব তো অতীতেও জন্মেছেন। ভবিষ্যতে

জন্মাবে অতিমানব। জাতিকে জাতি। নেশনকে নেশন। সেই অতিমানবের অসাধ্য কিছু থাকবে না। গ্রীক রোমান হিন্দু দেবদেবীর মতো। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের কিন্তু গুরুতর গরমিল। জনসংখ্যা কয়েক বছর অন্তর অন্তর ডবল হয়ে যাচ্ছে। পার্টিশনের সময় অখণ্ড ভারতের জনসংখ্যা ছিল চল্লিশ কোটি। এখন খণ্ডিত ভারতেরই জনসংখ্যা আশি কোটির কাছাকাছি। পাকিস্তানের জনসংখ্যা — পার্টিশনের সময় ছিল প্রায় দশ কোটি। এখন তার পূর্বাংশের অর্থাৎ বাংলাদেশের জনসংখ্যাই প্রায় দশ কোটি। পৃথিবীর সর্বত্র এই জনস্ফীতি লক্ষিত হচ্ছে। তবে শিল্পসমৃদ্ধ দেশে এই হারে নয়। কিন্তু প্রায় সর্বত্র বনজঙ্গল কেটে বসত হচ্ছে, বনজঙ্গল ধ্বংস হলে বন্যপ্রাণীও ধ্বংস হবে। মৃত্তিকার উর্বরতা কমে যাবে। বন্যার আশঙ্কা বাড়বে। বৃষ্টির অভাব হবে। কলকারখানার ময়লায় পরিবেশ দূষণ তো শুরু হয়েছেই। নাগরিককরণের আতিশয্য থেকে জলাভাব ইত্যাদি অভাব।

তাছাড়া এটাও পরিষ্কার যে কয়লা, পেট্রল ইত্যাদি খনিজ ক্রমেই নিঃশেষ হয়ে আসছে। সৌরশক্তি যদি সহায় না হয় তবে শক্তির অভাব হবে। পারমাণবিক শক্তির সদব্যবহার না করলে পৃথিবী থেকে প্রাণীমাত্রের বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা বৃথা। মানুষ ভগবানের ক্ষমতা হাতে নিয়ে ভগবান হবে না, হবে ডাইনোসরের মতো নির্বংশ। যদি না মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে গ্রহান্তরে পালায়। সেটাই একমাত্র পথ।

প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে মানুষের মনে যে নিশ্চিতি ছিল যুদ্ধের পর তা সংশয়ে ছেয়ে যায়। কিন্তু রুশ বিপ্লবও বহু মানুষের মনে নতুন সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিশ্বাস জাগায়। বিশ্বাসে বলবান হয়ে তাঁরা ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে সংগ্রামে নামেন। কিন্তু যে অস্ত্র দিয়ে জয়ী হন তা পারমাণবিক অস্ত্র। তেমন জয় নিয়ে কোনদিন মহাকাব্য বা এপিক উপন্যাস লেখা হবে না। অশুভ উপায় অবলম্বন করে শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। প্রথম মহাযুদ্ধ নিয়েও কি এখনও তেমন কোনও মহান সৃষ্টি হল ? না, রুশ বিপ্লব নিয়েও না। হয়েছিল যেমন নেপোলিয়নীয় যুদ্ধ নিয়ে। ফরাসী বিপ্লব নিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প সাহিত্য, সংগীতের তুলনায় বিংশ শতাব্দী নিষ্প্রভ। রবীন্দ্রনাথ, বার্নার্ড শ, প্রুস্ত, জয়েস, রিলকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর সন্তান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তেমন কোনও বনস্পতির দর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। মহাত্মা গান্ধী ও আলবার্ট শোয়াইসারের সঙ্গে সঙ্গে নীতির ধ্রুবতারাদেরও অন্তর্ধান হয়েছে। সংস্কৃতির সহিত নীতিরও গভীর সম্বন্ধ। নতুন মহাভারত লেখা হলে গান্ধীজীকে কেন্দ্র করেই লেখা হবে। নীতির দিক থেকে আমরা এতদূর নেমে গেছি যে অ্যাটেনবরার ফিল্মেরও তাৎপর্য বুঝি নে। যাঁরা পারমাণবিক বিনষ্টির সম্মুখীন তাঁরা কিন্তু বোঝেন। একমাত্র প্রেমই জয় করতে পারে প্রলয়কে। যদি হিংসা প্রতিহিংসার ঊর্ধ্বে ওঠে।